সমুদ্রমানুষ

মানিক-স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
অরবিন্দ ভৌমিক
রূপরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

রূপরেখা
প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৬১

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

পরম কল্যাণীয়া খুকুমণি

ও

তার ছোট বাপি দেবাশীষকে

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

প্রেমে অপ্রেমে

রাজা যায় বনবাসে

গম্বুজে হাতেব স্পর্শ

নগ্ন ঈশ্বর

শেষ দৃশ্য

টুকুনের অসুখ

শিউলিফুলের মত শুভ্র জ্যোৎস্না। দক্ষিণ-মেরুর বিষণ্ণ বরফে ওর ছায়া থমকে আছে। বায়ুতরঙ্গে কেমন একটা শিষ-দেওয়া শঙ্খচিলের নিথর আওয়াজ। আওয়াজটা ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় কেমন আছড়ে-পিছড়ে পড়ছে।

জাহাজটাকে কেন্দ্র করে নীল-কাচ জলের ছোট-ছোট ঢেউগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চ ইছে জ্যোৎস্নার ছায়া ছায়া রূপটাকে।

দুটো ছায়া সংলগ্ন। ডেক থেকে দুটো ছায়া তেরছা হয়ে পড়েছে সমুদ্রবুকে। জাহাজটা চলার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াদুটোও ভাঙা ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলেছে।

—খুব ভাল লাগছে রূপটা, তাই না?

উত্তর এল না। একটা খণ্ড কাক-কালো ছায়া চাঁদটাকে তখন ঢেকে দিয়েছে। নিস্পন্দ অন্ধকার। রেডিয়ম-ডায়াল ঘড়িটার বুকে শুধু ঘূর্ণ্যমান সেকেণ্ডের টিক টিক শব্দ। দুটো চোখ স্থির—ঝুলছে সারাটাক্ষণ ডায়ালটার উপর।

—মেরুর বরফগুলো হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কি বলিস?

ব্রীজে তখন ঘণ্টির আওয়াজ। ওয়াচের বেল বাজল ব্রীজে। টিক টিক করে মিনিটের কাঁটাটা ষাটের ঘরে মিলিয়ে যায় নি। কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিতে নিতে বলল—তিন মিনিট স্লো।

—কি করছিস তুই ঝুঁকে ঝুঁকে?—দুটো কথার একটারও জবাব নেই!

—ঘড়িটা স্লো। মিলিয়ে নিলাম।

—পাগলা ঘড়ির সঙ্গে তুই পাগল হয়ে গেছিস? প্রত্যেকটা ওয়াচেই তোকে ঘড়ি মেলাতে হয়?

মোবারক হাসল—করে নিই—যদি ভুল করি।

—ভুল করি, ভুল করি! ভুল করলে তোর কোরান শরীফ অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মোবারক এবারও হাসল—আচ্ছা শেখর, সি-রোটগুলো তো একই থাকে?

—প্রায় তাই।

ঘড়িটা হাত থেকে খুলে নিল। কানের উপর রেখে পরখ করে দেখল একটানা টিক শব্দটার কোথাও মুহূর্ত যতি রেখা পড়ল কি-না।

—মানুষের রোগ অনেক হয় শুনেছি—কিন্তু ঘড়ি-রোগ তো শুনি নি!

—ঘড়ি-রোগ! আমার ঘড়ি-রোগ হয়েছে বলছিস? বল্। যা মুখে আসে তাই বল্।

আরো কিছু প্রকাশ করা মোবারকের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করে থাকল।

—হয়েছে বাবা থাক। ঘড়ি-রোগের কথা বললেই তোর রাগ হয়। আর বলব না। আমি কি একা বলি? জাহাজের সবাই বলছে মোবারকের ঘড়ি-রোগ হয়েছে।

—সবাই বলবে বলে তুইও বলবি?

—এই চার দিন ধরে যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমিও না-বলে আর থাকতে পারছি না।

মোবারক আলীর চেতনায় ছোট্ট একটা মূক ঝড় বয়ে গেল। ঘড়ি-সম্বন্ধে কত কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে—কত বলাব আছে শেখরকে, কিন্তু বলতে পারল কই! বলার শক্তিটা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবাদ জানান হল না মোবারকেব। ঘড়িব দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল শুধু। নির্বাক নিস্পন্দ ঘড়িটার বুকে আবার চাইতেও ভয় করছে। কারণ সবাই বলছে ওর ঘড়ি-রোগ হয়েছে।

হঠাৎ এক ঝলক ছোট ভাঙা-ঢেউয়ের মাথ -থেকে-ওঠা নরম ঠাণ্ডা হাওয়া দুজনের মুখেই মিষ্টি স্পর্শ বুলিয়ে গেল। শেখর দাঁড়িয়ে আছে। আয়ত চোখ বিস্তীর্ণ সাগরজলের উপর। মোবারক আলীর জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটার দীর্ঘ ছায়া আলতোভাবে সাগরজলে তেমনি বিলম্বিত। কিছুক্ষণ নির্বাক উভয়ে। কিন্তু নিস্পন্দ নয়। শুধু মেশিনের ঝম্ ঝম্ শব্দ ওদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতব দিয়ে উঠছে নামছে।

শেখর আরো কাছাকাছি হয়ে এল। ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। হাত রাখলো মোবারকের কাঁধে—রাগ করেছিস?

মোবারকের হাতদুটো ওভারকোটের পকেটে। জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটা নিথর। খোদাই-করা প্রস্তর মূর্তিটার ঠোঁটে শুধু শিশিরবিন্দুর মত একবিন্দু বিনীত পাণ্ডুর হাসি।

চার দিন আগে কিন্তু মোবারক ছিল অত্যন্ত খুশী। হাসি ছিল ওর সম্পদ। চার দিন আগে ওর মাউথ-অর্গানটা হাজারো জানালার কপাট খুলে দিয়েছিল। শঙ্খচূড় সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে সাউথ-ওয়াফের কাঠের কারখানার বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে, সাদা মানুষের ঠাঁই ধরাতে পারে নি। শঙ্খচূড় সাপের খেলা, মাউথ-অর্গানের বুকে ভারতীয় অপরূপ স্বর তাই একটি সমুদ্র-মানুষকে মেলবোর্নের সাদা মানুষের মনে চিরদিনের জন্যই খোদাই করে দিয়ে এসেছে। আর ঘড়িটা হাতে বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটা কি-না এতটা বিবর্ণ আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মোবারকের পাখির পালকের মত মিষ্টি ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলো—শেখর—আমার ঘড়ি-রোগ হয়েছে যারা বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু তুই করিস না।

শেখর উত্তর করল না। মোবারক আলীর বলিষ্ঠ হাতদুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল—চল শুয়ে পড়ি গে। ভোর তিনটেয় আবার 'টাণ্টু' হবে।

দুজনই ডেক পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামল। ফোকশালে ঢুকে শেখরই বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিল মোবারক আলীর। মোবারকের দৃষ্টি তখন শঙ্খচূড় সাপের ঝাঁপিতে। চামড়ার ঝাঁপিটা বাংকের একপাশে পড়ে আছে। ওরই দ্বিতীয় ভাঁজে মেঘবর্ণের শঙ্খমুখী সাপ।

—নে শুয়ে পড়।—শেখর নিজের বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল। জামা ছেড়ে মোবারক শুয়ে পড়লে, সে আলো নিভিয়ে দিল।

অধিক রাত্রে কিসের আওয়াজে শেখর জেগে দেখল পাশের বিছানা খালি। দেয়ালে টাঙানো রেডিয়ম-ডায়ালের ঘড়িটাও নেই। মোবারক ফোকশালে নেই! মনটা তাই ওর আঁতকে উঠল।

জাহাজটা তখন আছড়ে পড়ছে নোনা ঢেউয়ের মাথায়। বাইরে আকাশচেরা ঝড়। আলী কোথায় এ ঝড়ের রাতে? বাথরুমে! কিন্তু ঘড়িটা?

বাথরুম খোঁজা হল—নেই। মেসরুম শূন্য। শুধু ক'টা জলের টব আগুনে ফুটছে!

শেখর ডেকপথে এসে থামল। ডেকপথ অন্ধকার। দেওয়ানীর ঝাপটায় অনাবৃত ডেক একেবারে অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে হিবিং লাইনটা কোনরকমে ধরে ফেলল। হিবিং লাইন ধরে চারিদিকে চেয়ে দেখল কোন মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে কি-না। কিন্তু কোথা থেকেও এতটুকু আওয়াজ ভেসে আসছে না। মাস্টের আলোটা শুধু ওদিকে টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। সেই সময় কতকটা হিম ঠাণ্ডা ঢেউয়ের জল এসে সমস্ত শরীরটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল শেখরের। ভ্রূক্ষেপ নেই তবু তার। সে খুঁজছে।

মাঝে মাঝে প্রপেলারটা জল থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর সেই সময় জাহাজের আর্ত চিৎকার। এই বুঝি স্টিয়ারিংটা অচল হয়ে গেল। এই বুঝি আকাশচেরা ঝড় দুমড়ে দিল সমস্ত জাহাজটাকে। তবু এই আকাশচেরা ঝড়ের ভিতর দিয়েই আঁতি-পাঁতি করে সে অনুসন্ধান করল। শেষে কোনরকমে সিঁড়ির দুটো রড ধরে বোট-ডেকে উঠতেই দেখল তিন নম্বর বোটের রাডারের পাশে মোবারক দাঁড়িয়ে ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় দেওয়ানী দেখছে। রেডিয়ম-ডায়াল ঘড়িটা ঝুলছে হাতে।

ওয়াচের ঘণ্টা পড়ল—রাত বারোটা।

শেখর ডাকল সেই সময়—মোবারক নেমে আয়। ফোকশালে চল।

ভোরের আকাশ-জুড়ে মেঘের আবরণ এতটুকু নেই। শুধু দক্ষিণ-মেরুর দিকে ক'টা

বিচিত্র রঙের খণ্ড মেঘ দিগন্ত ঘিরে ভোরের ঘুমে অচেতন। মনে হয় মুঠি মুঠি ইন্দ্রধনুচূর্ণ কে যেন তন্বী মেয়ের শাড়ির নীলাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি সরে গেছে।

শেখর এঞ্জিন-রুম থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর দাঁড়াল। সে নূতন জাহাজী। এখনও তার মন অন্যান্য পুরোনো জাহাজীদের মত মরে যায় নি। তাই সে ডেক-পথে এসে একবারের জন্য থামল। আকাশের দিকে চোখ তুলে সমুদ্র আর আকাশের বিচিত্র রূপের ভিতর ডুবে থাকতে চাইল। কিন্তু কানে এসে মাউথ-অর্গানের মিষ্টি সুর বাজতেই সে ডেক-পথ দিয়ে আফটারপিকে উঠে এসে দেখল মোবারক নেচে নেচে মেসরুমের ভিতর বাঁশী বাজাচ্ছে। আরো ক'জন জাহাজী দাঁড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে।

চার দিন চার রাতের বিবর্ণ মোবারক ফিরে পেয়েছে ওর পুরোনো সম্পদ। হাসি আর আনন্দ। বাঁশীর সুর আর সাপের নাচ। অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে থাকা শেখর আবার দু-পা এগিয়ে ভাবল—সিডনী থেকে জাহাজ ছাডার পর চার রাত চার দিন ও এতটা বিবর্ণ আর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল কেন? তারপর কাল রাত বারোটার সময় বোট-ডেকের তিন নম্বর বোটের রাডারের পাশে দাঁড়িয়েই বা কি দেখছিল?

সুরটা তখন উঠছে নামছে। মিষ্টি সুর। অদ্ভুত বাজায় মোবারক। মরা ডেক আর এঞ্জিনের ভিতর গোটা সফর ধরে সে যেন আজও জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শেখর মেসরুমের ভিতর ঢুকতে মোবারক বলল—একটা নূতন সুর দিলাম। নিউ-প্লাইমাউথের পথে পথে এই সুরেই বাঁশী বাজাব।

—থাক হয়েছে। কখন তো এঞ্জিন-রুম থেকে এসে স্নান করে বসে আছিস। এখনও খানাটা নিতে পাবলি না? কেবল আমার আশায় বসে থাকিস। কখন আমি আসব, কখন আমি ভাত নেব। বাঁশী রেখে গ্লাসদুটো আর থালা নিয়ে আয় নীচ থেকে। ততক্ষণে আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি। আর শোন্, আমার লকারে কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো আছে। ওগুলো নিয়ে একসঙ্গে সব মেখে নে তো।

মোবারক বাঁশীটা জামার আস্তিনে মুছে নীচে চলে গেল।

বারো-তের নটের গতি যদি জাহাজের হয় তবে সিডনী থেকে নিউ-প্লাইমাউথের পথ সাত দিনের। কাজেই জাহাজ বন্দরে পৌছতে আরো তিন দিন প্রায় বাকী। আরো ছটা ওয়াচ মোবারককে প্রহরা দিতে হবে। সে প্রহরা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই ওকে বাঁশীতে সুর দিতে হয়। অভ্যাস রাখতে হয়। কারণ জাহাজ বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তো সে তার চর্লি চ্যাপলিন কায়দায় পোশাক পরে নেমে পড়বে বন্দর-পথে। যেমনটা সে প্রতি বন্দরেই করে আসছে। তারপর সেই বরফ-গলা বন্দর-পথের উপর দিয়ে

ধীর ছন্দোবদ্ধ বাঁশীর তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে উচ্ছল পাখির মত লাফিয়ে চলবে। পথের পাশে কাঠের রং-বেরঙের ঘরগুলির জানালা খুলে যাবে। দ্রোণফুলের মত সাদা মুখগুলি জানালার পাশে উঁকি দিয়ে দেখবে একজন ভারতীয় নাবিক বিচিত্র কায়দায় কাঠের বাড়িগুলোকে বাঁশীর সুরে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দক্ষিণ আর উত্তর দ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে নিউ-প্লাইমাউথ।

পাহাড়ী বন্দর। এগমণ্ট পর্বতের কোলে ধাপে ধাপে পাহাড়-সিঁড়ির ছায়ায় নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর গড়ে উঠেছে। সিডনী থেকে দক্ষিণ-পূবে জাহাজ চালিয়ে জাহাজ বাধা হয়েছে সেই বন্দরে।

জাহাজ-ঘাটার সামনের পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের বুক চিরে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উপরে উঠে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে কাঠের রং-বেরঙের অলিন্দে। দূরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষপাহাড়ের সোনালী বরফচূড়া। শীতের দেশে সোনাগলা রোদে মনে হল এগমণ্ট পর্বতে কে যেন আগুন ধরিয়েছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাই দেখল মোবারক। ঝলসে উঠল ওর আয়ত চোখদুটো। শেখর এসে ডাকতেই মোবারকের হুঁশ হল—কোকশাল হতে বেরিয়েছিস্ তো সেই কখন, কিন্তু এখনও কিনারায় নামলি না যে?

মোবারক লেদার-ব্যাগের প্রথম ভাঁজ থেকে বার করল বাঁশীটা (যার দ্বিতীয় ভাঁজে সাপটা তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে)। ঠোঁটের ভাঁজে গুঁজে দিল বাঁশীটা। শেষে হ্যাণ্ডশেক করল শেখরের সঙ্গে। একসময় শেখর বলল—আই উইশ ইউ গুড লাক্‌।

মোবারকের কিন্তু ঠোঁট নাড়ল না। শুধু চোখদুটো যেন একটু হাসল। সেই চোখদুটোই যেন হেসে জবাব দিয়েছে—তোমার শুভেচ্ছা আমার জীবনে অক্ষয় হোক।

গ্যাংওয়ে ধরে জেটিতে নেমে এল মোবারক। তারপর পথে। কালো পিচঢালা পথ। হিম-ঠাণ্ডা বরফগলা পথ—ক্রেন মেসিনের গা ঘেঁষে পাহাড়-সিঁড়ির বুকে 'দ'-এর মত উঠে গেছে। সেই পথ ধরে হাঁটছে সে। হাতে লেদার-ব্যাগ। ঠোঁটের ফাঁকে মাউথ-অর্গান। সুরে সুরে নিজের মনে নিজেই যেন সে ডুবে আছে। কখনও পাহাড় অলিন্দ ঘেঁষে, কখনও ট্রাম-লাইন ধরে বরাবর চড়াই-উৎরাইয়ে ওঠানামা করতে করতে চলেছে ভারতীয় নাবিকটি।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে মোবারক এই প্রথম এল।

মোবারকের বাঁশীর সুরে ডুবে-থাকা মন কখনও দেখল কখনও দেখল না জানালা-পথের উপর উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা সাদা মেয়েমানুষের দ্রোণফুলের মত মুখগুলি। পাহাড়ের উপর থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে ওকে।

ফিজ্‌রয়ে এসে থামল মোবারক। মুখ থেকে বাঁশীটা নামিয়ে আনল। ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে আছে ফিজ্‌রয়ের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মানুষ। সমস্ত শহরই যেন বিচিত্র ফুলের উৎসবে মেতে আছে। ফিজ্‌রয়ের ফুলের উৎসবে দাঁড়িয়ে ভাবল একবার—মেথডিস্ট চার্চের পাশ দিয়ে পিকাকোরা পার্কটা ঘুরে এলে হত। কিন্তু রাত যে বেশি হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহাজটা অনেক দিন এ বন্দরে থাকবে। আর-এক বিকেলে ঘুরে এলেই হবে।

ফিজ্‌রয় হতে ট্রামে চড়েই বন্দরের দিকে ফিরল মোবারক। একবগীব ট্রামে চড়ে এক কোণে বসে বাঁশীটা ক'বার বাজাল। আরোহীরা কান পেতে শুনল। নূতন একটা সুর। বিদেশী সুর। খুব শ্রুতিমধুর ঠেকছে। মেয়েরা যোয়ান দীর্ঘ চাটগাঁই চেহারাটা দেখে ফিস্‌ফিসিয়ে তাই বলল—ইণ্ডিয়ান, এ ম্যান অব্‌ মিষ্টিক ল্যাণ্ড।

ট্রাম বন্দরে এসে থামতেই মোবারক নেমে পড়ল। সামনেই সি-মেন্‌স্‌ মিশন: পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। শহরের বুকে জাহাজীদের এই এক আড্ডাখানা। দিনের পর দিন সমুদ্রের মরা ঢেউ গুণে এখানে এসে সব জাহাজীই একটু গান-বাজনায় ডুবে থাকতে চায়। আগামী সমুদ্রযাত্রার জন্য মনটাকে এখান থেকে একটু চাঙ্গা করে নেয়।

মোবারক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল একটা সাহেব বিলিয়াড টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। পাশে আরো দুজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। সেও একবার থামল টেবিলটার কাছে এসে। কিন্তু পৃথিবীটা ক'বার প্রদক্ষিণ করার পরও এ খেলাটাকে সমঝে উঠতে পারে নি। তাই যেখানে নাচ-গান হচ্ছে, যে হলটার ভিতর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে, সেদিকেই সে এগিয়ে গেল।

বিভিন্ন দেশের জাহাজীতে হলটা ভরে আছে। মঞ্চের উপর ক'জন মেয়ে সাদা পোশাক পরে পা তুলে তুলে নাচছে। নাচ দেখে মনে হয় এক পায়ের উপর ভর করে আর-একটা পা আকাশের দিকে কতদূর তুলে দেওয়া যায় তারই যেন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রথম প্রথম মোবারকের চোখে এ সব খুব খারাপ লাগত। কিন্তু সফরে সফরে এমন নাচ দেখে, আজকাল এ পা-তোলার প্রতিযোগিতাকে নাচ বলে, নৃত্যশিল্প বলে ভাবতে পারছে। শেষে একটা চেয়ার টেনে বসতেই দেখল পাশের চেয়ারে শেখর। হাঁটুর ভাঁজের ওপর টুপি।

ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল—শেখর।

ফিসফিস্‌ করে উত্তর এল—আমি তো ভাবলাম তুই সোজা জাহাজে চলে যাবি।

– কতক্ষণ হল নাচ আরম্ভ হয়েছে?

—তা অনেকক্ষণ। এদের সিস্টেম কিন্তু আলাদা। অন্যান্য বন্দরে সি-ম্যান মিশনে দেখে এসেছি ওদের ভিন্ন লোক থাকে গান-বাজনার জন্য। কিন্তু এখানে জাহাজীদের মধ্যে যদি কেউ কোন আর্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকেন, তাঁকে ডাকা হয়। তোব নাম আমি এবার প্রস্তাব করব।

মঞ্চের উপর তখন সেই পা-তোলা মেয়েটির নাচ প্রায় শেষ। কোল্ড ড্রিংকের ধবটা পার হয়ে কাকে কি যেন বলে এল শেখর।

মঞ্চের উপর যারা নাচছিল তাদের নাচ শেষ। শেষে তারা নুয়ে নুয়ে কেমন পিছিয়ে পিছিযে দু-পা ভাঁজ করে বিলিতী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে পর্দার আড়ালে হাবিয়ে গেল।

মোবারক শেখরের কলার টেনে বলল—আমি কিন্তু অমন ভাবে ঠ্যাং ভাঁজ করতে পারব না।

—তুই তোর মত করবি।

সেই সময় কালো পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক এলেন মঞ্চে। এসে তিনি মাইকেব সামনে মুখ রেখে বললেন—এবাবের প্রোগ্রাম লিলির—ভায়োলিন, তারপর সৈয়দ মোবারক আলীর মাউথ-অর্গান।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে লিলি এসে ঢুকল। মোবারক উঠে গিয়ে পর্দার পাশে দাঁড়াল। ভায়োলিন বাজাচ্ছে লিলি। কাঁধের উপর রেখে বাজাচ্ছে। খুব মিষ্টি হাত। গায়ে সাটিনের ব্লাউজ—ফারের কোট উইংসের পাশে রেখে গেছে, মোবারক কোটের লাগোয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফারের কোট থেকে উৎকট বিলিতী এসেন্সের গন্ধ উঠছে। মোবারক একটু সরে দাঁড়াল।

লিলির চোখ কালো, চুল কালো। সেই চোখ চুল দেখতে দেখতে কখন লিলি হাত নামিয়ে নিয়েছে বেহালা থেকে মোবারক খেয়াল করে উঠতে পারে নি। মেয়েটি বেরিয়ে আসতেই খেয়াল হল এবার ওকে মঞ্চের ভিতর ঢুকতে হবে। কিন্তু ঢুকতে যেতেই সামনের উঁচু কাঠটা ওর পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লিলির ভায়োলিনের উপর। একটা তার ছিঁড়ে গেছে। আর হাতটা একটু কেটে গেছে মোবারকের। রুমাল দিয়ে হাতের রক্তটা মুছে অপরাধীর মত বলল—আপনার ভায়োলিনের তারটা ছিঁড়ে গেল।

লিলি অত্যন্ত সহজভাবে বলল—আপনার হাতটা খুব কেটে গেছে, তাই না? দেখি তো হাতটা।

—না, তেমন কিছু হয় নি।—এতটুকু কাটায় কিছু আসে যায় না মোবারকের।

একটা তার ছিঁড়লে লিলি আর-একটা তার জড়িয়ে নেয়।

—আপনি যান। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মঞ্চের ভিতর ঢুকতে যাবে, আবার ডাকল লিলি—দাঁড়ান, হাতটা বেঁধে দি।—উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের রুমালটা জড়িয়ে দিল মোবারকের হাতে। সেই সময় দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সি-ম্যানের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছুটে এসেছিলেন।

মঞ্চে ঢোকার আগে আরেক বার চাইল মোবারক লিলির দিকে—সারা মুখে ছড়িয়ে আছে শিশিরভেজা গোলাপের রং, বাদশা-বেগম চেহারা। ভ্রূ-লতা বড সরু আর তীক্ষ্ণ।

মোবারক যখন হাসে, তখন ওব ঠোঁট হাসে না। চোখ হাসে। মোবারক হাসল। লিলিও হাসল।

তারপর মঞ্চের উপর মোবারকের মাউথ-অর্গান বাজানো এক সময়ে শেষ হল। মোবারক বেরিয়ে আসবে। জনতার হাততালি থেমে গেল। কিছু মুখ চেয়াব থেকে উঠে বলল—আবার হোক।

মোবারক ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—অনেক দিন থাকব এ বন্দরে।—তারপর মিঠে সেলাম ঠুকল সকলের উদ্দেশ্যে। উইংসের পাশ কাটিয়ে বাইরে আসতেই লিলি বলল —বেশ হয়েছে। সুন্দর বাজিয়েছেন তো। ভারতীয় স্বর এত মিষ্টি এই প্রথম জানলাম।—একটু থেমে আবার বলল—কালও নিশ্চয়ই মিশানে আসছেন?

—খুব সম্ভব।

—কখন?

—সেটা ঠিক বলতে পারলাম না।

লিলি আর মোবারক একসঙ্গেই মঞ্চের বাইরে চলে এল। পিয়ানো আর বিগ-ড্রামের আসর পার হয়ে শেখরের পাশে দাঁড়াল। খুব আস্তে পরিচয় করিয়ে দিল শেখরকে লিলির সঙ্গে। শেখর দাঁড়াল। হ্যাণ্ডশেক করল। কিছু বলতে হবে এবং কি বলা যায় এই ভাবতে গিয়েই অনুভব করল ওর মুখে এসে সমস্ত রক্তটা যেন চাপ দিতে চাইছে। মোবারক বুঝতে পেরে বলল,—আমার বন্ধুটি অত্যন্ত লাজুক। তাছাডা নূতন জাহাজী।

শেখরের মুখ কেমন আরো রক্ত-লাল হয়ে উঠতে থাকলে মোবারক আবার বলল—জাহাজে চল। বেশ রাত হয়েছে।

লিলি নিজের কালো চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে বলল—এত তাড়াতাড়ি।

শেখর অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিল—খুব ভোরে আমাদের উঠতে হয়।

প্রথম দিন সকাল সকালই ফিরল জাহাজে। লিলি এসেছিল দরজা পর্যন্ত। এসেছিল বিদায় দিতে।

সি-মেন্‌স্ মিশন থেকে কালো পথ নেমে গেছে জেটিতে। সেই পথ ধরেই ওরা নেমে আসছে। কার্নিভাল আর ক'টা স্টেশনারী দোকান পার হয়ে ওরা এসে থামল ক্রেন-মেসিনের নীচে। মোবারকের চিন্তাধারাটা ক্রেন-মেসিনের নীচে থামতেই কেমন চমক খেল। লিলির বিদায়বেলাকার গুডনাইট কথাটাতে কেমন একটা ছোট্ট সহজ ভাব ছিল। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে গ্যাংওয়েতে ঢুকতেই সেই মুখের সঙ্গে সারি সারি আরো ক'টা মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আজকার লিলির মতই চেহারা ওদের। তফাৎ শুধু চোখে আর চুলে। চোখ নীল, চুল সোনালী।

বুনো সাইরিসের স্প্যানিশ মেয়েটির কথা মনে হলে তার লজ্জা লাগে। সে বলত, আমি কবি, কবিতা লিখি। নিজামা পার্কে বসে সে গল্প করত, দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে মোবারকের পাণ্ডিত্য জানতে চেয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতি জানার শখও ছিল তার অত্যন্ত তীব্র। সে বলত, মোবারক থেকে যাও, তোমায় আমি সব দেব। মোবারক সে মেয়েটিকে সত্যি বার বার অনুকম্পা করেছে। খুব অসহায় যেন সে। নিজামা পার্কে বসে ওকে বার বার দেখে তাই মনে হয়েছিল, ফ্লোরিদা, করিয়েন্থুজে বার বার সে এক কথা বলত—সব হবে, সব পাবে, থেকে যাও।

মোবারকের মনে হয়েছে সে সময় জৈনবের দীর্ঘ-এলায়িত চুলকে—মনে হয়েছে ওর নাকের নথ—বাঁশপাতার মত ফুর ফুর করে কাঁপছে। আম্মাজানের কথা তখন সে শুনতে পেত—মোবারক ঘুমোস নি! তোর বাপজীর কথা যে এখনও শেষ হল না রে—।

সে বলত—আম্মা আর-একদিন, আজ থাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মনে পড়েছে মেলবোর্ন থেকে জিলঙ্গের পথ। ক্যাডিলাক ছুটেছে প্রাণপণে। উইলিয়ামের স্ত্রী গাড়ি চালাতে চালাতে একটি ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় গাড়ি ব্রেক কষে দিল। স্থানটি নির্জন। দূরে একদল ক্যাঙ্গারু লাফিয়ে দূর হতে দূরান্তরে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই ঘনসন্নিবেশিত ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় চন্দ্রালোকিত নির্জন মাঠে বলেছিল বউটি—এ-দিকে আসবে মোবারক?

দূরে গম-ক্ষেতগুলির প্রতি আঙুল তুলে বলেছিল—আজ যদি জিলঙ্গ আমরা না পৌঁছাই?

—উইলিয়াম নিশ্চয়ই তা হলে চিন্তা করবে।

—মোটেই না। বলব তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। ওর জন্যে তুমি এবার কতগুলি ভারতীয় টিকিট সংগ্রহ করে এনেছ?

—অনেক।

—দেখালে না তো ?

—বাড়ী পৌছে দেখাব।

—গাড়ি আর আমি চালাতে পারব না মোবারক। গত সফরেও চালিয়ে গেছি—এবারও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার কি অত দায় পড়েছে ?

—উইলিয়ামকে পাঠালেই পারতে তাহলে।

—তুমি বুঝি জানো না সে অত্যন্ত স্বার্থপর।

—কথাটা বলা যাবে ওকে।

—না, খবরদার। ওকে কিন্তু কিছু বলবে না।

—উইলিয়াম নিশ্চয়ই আমার জন্য এবার অনেক টিকিট জমিয়ে রেখেছে।

—জানি না।

উইলিয়ামের স্ত্রী ওর শরীব ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আগামী মাস থেকে ক্যাঙ্গারুরা বাচ্চা দিতে শুরু করবে। এ মাঠে অনেকবার খরগোস শিকার করতে এসেছি আমরা। তাই আমি জানি ক্যাঙ্গারু বাচ্চা দেয় কখন।

উইলিয়ামের স্ত্রীর ঠোঁটদুটো আর চোখদুটোতে উদগ্র কামনা জাগছে। শঙ্খচূড় সাপটার কথা মনে হয়েছিল তার সে সময়। সে দু-পা সবে দাঁড়িয়ে ক্যাডিলাকের ভিতর ঢুকে বলল—এস। উইলিয়াম সত্যি খুব স্বার্থপর।

মোবারক বাংকের উপরে পডে আরো কিছু ভাবছিল—কিন্তু শেখর এসে ডাকছে সে সময়—ওঠ্ ওঠ্ খাবি চ। খানা তোর লকারে তুলে রেখেছি। তোর খানা নিয়ে ভাণ্ডারী সারেংকে নালিশ জানিয়েছে।

সে শুনেও শুনল না যেন। অন্য কথা টেনে নিয়ে বললে—লিলিব্লুকে কেমন লাগে শেখর ?

—সে কথা পরে বলব। এখন যা-হয় দুটো খেয়ে নে। ঠাণ্ডা ভাতগুলো খাবি কি করে তাই ভাবছি।

—খাব, খেয়ে নেব ঠিক। কিন্তু লিলি বড় ভাল মেয়ে। অন্য বন্দরের মেয়েদের থেকে অনেক তফাৎ। আম্মাজানের মত সে আমায় আজ যত্ন করলে। কাটা হাত সে কত সুন্দর করে বেঁধে দিয়ে বলেছে—জল যেন হাতে না লাগে।

—দু দণ্ডেই লিলিব্লুর সঙ্গে তাহলে প্রেম হয়ে গেছে বলতে চাস।

—না প্রেম আমার হয় নি। আমার প্রেম দুটো জিনিসের সঙ্গে—এক সাপটা, দ্বিতীয় মাউথ-অর্গান। প্রেম আমার হতে পারে না আর।

শেখর ঠোঁটে বিদ্রূপ টেনে প্রশ্ন করলে—আর হাত-ঘড়িটা ?

মোবারক লাফ দিয়ে বাংকের উপর বসে পড়ল। ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে সে যেন কাঁপছে। গলা ওর কথা বলতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, বিবর্ণ আর শুকনো হয়ে গেছে ঠোঁটদুটো। তবু সে অত্যন্ত নিচুগলায় শেখরকে বললে—আল্লার কসম শেখর, এ কথা তুই আর তুলিস না।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরের প্রথম ভোর। মোবারক আর শেখরের প্রথম সকাল।

কুয়াশাচ্ছন্ন ডেক। উইন্‌চ্‌ ড্রাইভাররা ভোর রাত থেকে ফল্কায় কাজ করছে। ক্রেনের নীচে ট্রাকগুলোতে বোঝাই হচ্ছে ফস্‌ফেট্‌।

ট্রাক একটা-দুটা নয়, অনেকগুলো। ভিতরে দু-একজন সাহেব বসে আছে। নিষ্কর্মা মানুষের মত বসে সিগারেট টানছে। ওরা অপেক্ষা করছে ট্রাকগুলো কতক্ষণে বোঝাই হবে।

পাঁচটা ক্রেন একসঙ্গে পাঁচটা ফল্কায় কাজে ব্যস্ত। ক্রেন-ড্রাইভাররা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছে সূর্য উঠবে কি উঠবে না—সঙ্গে লক্ষ্য রাখছে ডেকের উপর কিনারার সাহেব কখন হাড়িয়া হাঁফিজের নির্দেশ দিচ্ছে। নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা-টা লিভারের উপর টিপে গিয়ার তুলে দেয়। তারপর দু-পাঁচ হন্দর মাল ক্রেনটা তুলে নিয়ে মোটরের উপর ঢেলে দিয়ে ফল্কায় আবার ফিরে আসে। ক্রেন-ড্রাইভাররা তখন হাতটানা দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেন। এক মুহূর্তের বিশ্রাম।

ক্রেন পার হয়ে আর-একটুকরো সমুদ্র। এখানে জেটি ব্রিজের মত সমুদ্রের উপর কতকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। দু-চারটা বয়া ভাসছে জলে। রাতে সেই বয়ায় হলুদ আলো কখনও জ্বলে কখনও নেবে। এই একটুকরো সমুদ্রের বেলাভূমি পাহাড় থেকে একেবারে খাড়া নেমে আসে নি। বেলাভূমি ক্রমশ ঢালু বলে এখানেই সপ্তাহে দুদিন কার্নিভ্যাল বসে। অন্যান্য দিন বিকালে সমুদ্রস্নান করতে শহর হতে নেমে আসে মেয়ে-পুরুষরা।

এঞ্জিন-সারেং-এর চলনে ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। আফটার-পিকে উঠে একবার গ্যালীতে উঁকি দিচ্ছে আবার ছোট ট্যাণ্ডেলকে ডেকে বলছে—যাওরে মিয়া কামে যাও। ঘন্টি পড়ব এখন।

সেই শব্দে শেখর আর মোবারক কেবিন থেকে উপরে উঠে এল। দাঁড়াল এসে দুটো বীটের সামনে—যেখানে লোহার মোটা তারগুলো প্যাঁচ খেয়ে রয়েছে। ডেক-ট্যাণ্ডেল কয়েকজন ডেক-জাহাজী নিয়ে ফানেলের ডগায় গিয়ে উঠেছে। ফানেলটা রং

হচ্ছে। হলুদ রং। ডেক-সারেং বয় কেবিনের সামনে বাটলারের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে নিভৃতে কিছু যেন শলা-পরামর্শ করছে। কিছু বিক্রীর ব্যবস্থা—কিছু পয়সা-সংগ্রহের ব্যবস্থা। ডেক-ভাণ্ডারী পাঁচ নম্বর ফল্কা পার হয়ে সারেং-এর পাশে চুপচাপ দাঁডাল। কারণ ক্রুদের রেশন বাঁচিয়ে তারও কিছু মশলা, চাল ডাল জমেছে—বেচে সেও কিছু পয়সা সংগ্রহ করতে চায়।

জাহাজ বন্দরে এলে ওয়াচ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তখন এঞ্জিন-রুমে নাবিকেরা সকলেই সাতটা-পাঁচটা কাজ করে। মোবারক আর শেখর তাই আজ একসঙ্গে এঞ্জিন্-রুমে নামার জন্য নীল রঙের ওয়ার্কিং ড্রেস পবে অপেক্ষা করছে এঞ্জিন্-রুম বড ট্যাণ্ডেলর জন্য। বড় ট্যাণ্ডেল আসে নি বলে, ওরা উঁকি দিয়ে দেখছে বন্দরের জল কতটা গভীর।

লুৎফল এবং আরো ক'জন নাবিক সাবেং-এর কাছে ছুটি নিযে কিনারায় গেছে। অনেকে নিজেদের জন্য কিছু সেলমন কি হেরীং মাছ আনার জন্য পয়সা দিয়েছে। সেই সময় শেখরও বলেছে—আমাদের জন্য যেন কিছু আনা হয়। কিছু হেরীং আর টমেটো। এই নীরস লোহার ডেকে একঘেয়ে খানার পর দুটো টমেটোর চাটনী, হেরীং-এর ঝোল অমৃতের মত খায় নাবিকেরা। তাই জাহাজ বন্দরে এলে প্রথম ভোরেই সারেং দু-একজনকে কিনাবায় পাঠিয়ে দেয় বাজার করতে। বলে দেয় কিছু শাক যেন নিয়ে আসে। শাকের পয়সা দিতে হয় না—অনেক বন্দর আছে যেখানে সমুদ্র-তীরে বিভিন্ন রকমের শাক আগাছার মত বাডতে থাকে। সেই শাক ভারতীয় নাবিকেরা যতদিন থাকে তত দিন ডেক বোঝাই করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বাডতি শাকগুলো বরফ-ঘরে বাটলারকে জমা দিয়ে দেয়।

গতরাতে ঘড়িটা নিয়ে মোবারক আব শেখরের ভিতর যে মন-কষাকষি হয়েছিল, নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ভোরের হাল্কা আমেজে সব যেন ফুৎকারে উবে গেছে। মোবারক আবার উচ্ছল হয়ে উঠেছে, শেখর চঞ্চল হয়েছে এঞ্জিন্-রুমে নামার জন্যে। এঞ্জিন্-রুমে ফিল্টার খুলতে হবে আজ। তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি সাহায্য করতে হবে একটু। শেখর ইঞ্জিনিয়ারের হেলপার হিসেবে কাজ করতে খুব ভালবাসে। ওর যত ভয় বয়লারগুলোকে। বয়লারে কয়লা ঠেলে দেওয়ার কথা মনে হলে ভয়ে ওর শরীরে কাঁটা দেয়।

সাড়ে বারোটায় খানার টিফিনে দুজনেই এঞ্জিন্-রুম থেকে পাশাপাশি উঠে এসেছিল ডেকে। ডেকের সামনে ফল্কা। ফল্কা দুটো পার হয়ে জাহাজের গলুই। গলুইয়ের বুকে এক ঝাঁক চিডিয়া খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছে।

মোবারক আর শেখর ষ্টারবোর্ড-সাইড ধরে গলুইতে উঠে এল। খানা মিল-ভু-থালায়, খানা খেল। খানার টেবিলে একবার লিলির কথা উঠেছিল—যেন রাজ-হাঁসের পালখে-মোড়া মেয়েটা। ঘন অন্ধকারের মত চোখ আর চুল। নাক ওর কচি ডালিমপাতার মত নরম আর সরু। ঠোঁটদুটো যতটা হাল্‌কা, ততটা ভিজে ভিজে। রক্ত-লাল রং সেই ঠোঁটের। চিবুকে রয়েছে বর্ষার প্রজাপতির ক্ষীণ ডানার ভাঁজ। ঘাড়ের উপর একগুচ্ছ বব্‌-করা চুল। শুধু বব্‌-করা এক ঘাড় চুলটা মোবারকের অপছন্দ। সে চুল কেন জৈনব খাতুনের মত এলায়িত আর দীর্ঘ হল না—সেজন্য হেরীং-এর মাথাটা চিবোবার সময় ক'বার আপশোস করেছে মোবারক।

মোবারক বলেছে—লিলি চুলটা আরো বড় করে রাখতে পারল না?

শেখর এঁটো-কাঁটা সব থালায় তুলে সামান্য হেসে বলল—মিশনে যখন দেখা হবে তখন বলবি, চুলগুলো বড় করে রাখতে পারলে না গো মেয়ে?

মোবারক শেখরকে চোখ টিপে বলল—চুপ কর হতভাগা।—অর্থাৎ বড় ট্যাণ্ডেল তখন মেস-রুমে ঢুকছে খানা খেতে। বগলে একটা মাদুর। খানা খেয়ে থালার উপর কুলকুচা করে একেবারে পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়ে নীচে নামবে। এমনটাই স্বভাব ওর।

শনিবার, আজ সাডে বারোটায় ছুটি। সুতরাং এই মাত্র কাজ থেকে খালাস হল শেখর আর মোবারক। ক্ষিদে অত্যন্ত বেশী পাওয়ায় স্নান না সেরেই খেয়ে নিয়েছে। তারপর হাতে কাজ আছে অনেক। সে কাজগুলো শেষ না করে স্নান করলে—কাজগুলো আজও পডে থাকবে। কাল রবিবার—ছুটির দিন। ছুটির দিনেও হাতে একগাদা কাজ থাকুক মোবারকের পছন্দ নয়।

ক্রেনের হাড়িয়া-হাঁফিজে ফস্‌ফেটের ধুলো সমস্ত বন্দর জুড়ে কুয়াসার সঙ্গে মিশে সাদা হয়ে উড়ছে। সেই ধুলোর ভিতর শেখর আর মোবারক কাজ করেছে। ফিণ্টারের কাজ শেষ হলে দুজনেই তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে উইন্‌চে দু-ঘণ্টার জন্য হরদম খেটেছে। এশ্‌ছাল্টি্‌ক স্ট্রেপার খুলতে যে কালী শেখরের গায়ে লেগেছিল মোবারক গরম জল আর সাবান দিয়ে সেই কালী রগড়ে তুলে দিচ্ছে এখন। চার টব গরম জলে স্নান করেছে ওরা।

তার আগে মোবারক ওয়ার্কিং ড্রেসগুলো কেচেছে। শেখরের ওয়ার্কিং ড্রেসও ধুয়ে দিয়েছে। শেখরের জামা কাপড়ও মোবারকই ধুয়ে রাখে। আর হরদম বিড় বিড় করে বকে। বলে—জাহাজে মরতে এলি কেন? সফর শেষ করে যদি একবার

কলকাতায় ফিরতে পারি তবে মাসীমাকে বলে দেব—জাহাজে যেন তোকে আর না পাঠায়। আমি না থাকলে তুই যে মরে যেতিস।

শেখর হেসে বলল—পিঠের কালীটা সব উঠল তো।

তারপর বাথরুম থেকে উঁকি দিয়ে বলল—মোবারক এদিকে চেয়ে দেখ না!

মোবারক উঁকি দিয়ে বলল—কি!

—দেখছিস না ক্রেনের নীচে দুটো মেয়ে সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

—দেখলাম তো।

—আমি ওদের সঙ্গে এখন গিয়ে মাছ ধরব। একটা ছিপ ওদের থেকে চেয়ে নেব। তুই যাবি না? তুই মাছ ধরবি না?

—না।

—তবে সারাটা দুপুর ফোকশালে বসে কি করবি?

—কিছুই করব না।

—ঠিক আছে মাছ যদি ওঠে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধরব, একা রাঁধব, একা খাব।

—খাবি, বেশ করবি। আমায় কি ভয় দেখাচ্ছিস।

শেখর স্নান সেরে বলল—জামাকাপড়গুলো উনুনের পাশে টাঙিয়ে রাখিস, নয় তো শুকাবে না।

জামাকাপড়গুলো শেখরের।

শেখর সত্যি একসময় গ্যাংওয়ে ধরে নীচে নেমে মাছ ধরতে চলে গেল। এবং একটা ছিপ চাইতেই পাশের মেয়েটি সানন্দে ছিপ বাড়িয়ে বললে—ইউ নো হাউটু ফিশ?

শেখর স্বীকার করতে মেয়েটি বললে—গ্র্যাণ্ড।—তারপর দুটো মেয়ের মাঝখানে নির্বিকারভাবে বসে মাছ ধরার জন্য ছিপের স্থতোটা সে গভীর জলে ছুঁড়ে ফেলল আর সন্তর্পণে দুবার দুটো মুখের প্রতি চেয়ে গভীরভাবে যেন আত্মনিয়োগ করল মাছ ধরার প্রতি। সে যেন যথার্থই মাছ ধরতে এসেছে।

সাজগোজ করে মোবারক ডেক অতিক্রম করে যখন গ্যাংওয়ে দিয়ে জেটিতে নামছে কিনারায় বের হবার জন্য, তখন প্রায় তিনটে বাজে। লায়ন রকের ওপারে সমুদ্র-সন্ধ্যায় সূর্য ডুবছে তখন। বিকেলের আকাশটা একরাশ ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় ভরে গেছে। আকাশ, নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর মোবারকের মতই যেন সাজ-গোজ করা। সে পথ ধরে হাঁটার সময় শেখর যেখানে মাছ ধরছে সেদিকে নজর দিল। ক'কদম পা চালিয়ে শেখরের পাশে ঝুঁকে দেখল বেশ ক'টা জ্যান্ত মাছ

তাকাচ্ছে। মেয়ে দুটো ছিপ ফেলে তখনও বসে রয়েছে। কিন্তু মোবারককে দেখে ওরা যেন আশ্চর্য হল।

শেখর বললে—অত চোখ দিয়ে দেখলে কি হবে, মাছের ঝোল রেঁধে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধরেছি একা খাব।

মোবারক কোন জবাব দিল না, শুধু বললে—লিলিরুর সঙ্গে মিশনে দেখা হলে বলবি আজ আমার যাওয়া হচ্ছে না, আজ যাচ্ছি পিকাকোরা পার্কে।

মোবারকের পোশাকটা বেশ ঢলঢলে। কালো ক্যাপ মাথায়। গলার টাইটা ডবল ক্রসিংএ বাঁধা, অনেকখানি নীচে ঝুলে পড়েছে। হাতে ব্যাগটা ঝুলছে।

শেখর বঁড়শিটা ওদের ফেরত দিয়ে বলল—সাপটা নিয়ে বেরচ্ছিস কেন? এত ঠাণ্ডায় ওটা কিছুতেই নড়বে না।

—নড়বে না—নড়বে না! তাতে হয়েছে কি। আমি তো ওটা নাচানোর জন্য নিয়ে বের হই নি। হাতে রয়েছে—থাক।

—সে অবশ্যি সত্যি—হাতে রয়েছে থাক।

—সব কিছুতেই তুই আমার সঙ্গে লাগিস কেন বলত শেখর?

—ভাল লাগে বলে, আমার কথা এমন করে আর কেউ তো হজম করে না তাই।

—তুই কিন্তু বলবি লিলিকে।

—বলব।

পথ ধরে হাঁটছে মোবারক। লায়ন রক অতিক্রম করে জোর হাওয়া ছুটছে বলে ওভার কোটের প্রান্ত বাতাসে উড়ছে—টুপিটা পর্যন্ত। টুপিটাকে টেনে টুনে সে ভাল করে মাথার ভিতর ঠেলে দিল। সে যখন হাঁটে তখন কেমন উন্মনা হয়ে যায়। দেশের কথা নিশ্চয়ই মনে হয়। নাবিক হয়েও সে সমুদ্রকে ভালবাসতে পারে নি।

বন্দর পার হলে দু-দুটো মদের দোকান পাশাপাশি। বন্দরের কাজ-করা সাহেব মানুষগুলো সেখানে লাইন দিয়ে মদ টানছে। যাঁরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছেন তাঁরা হাঁটছেন বেলাভূমিতে। কার্নিভ্যাল আজ বসবে না।

বিকালে ফ্লাস্ক-ভর্তি কফি নিয়ে এক দঙ্গল মেয়ে-বৌ এসে সমুদ্র স্নান করে গেছে—মোবারক ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। এখন যাঁরা এসেছেন বেড়াতে—সান্ধ্যভ্রমণ ওঁদের বিলাস।

মোবারক আবার হাঁটছে।

মদের দোকান পার হলে ডান দিকে সি-ম্যানস্ মিশন। মিশনের দরজা ঠেলে

দু-একজন নাবিক তখন থেকেই ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। দু-একটা লাল নীল আলো তখন থেকেই জেলে দেওয়া হয়েছে অন্ধকারকে ঠেলে দেওয়ার জন্তে।

সামনের চত্বর পার হয়ে ট্রাম লাইনের শেষ গতিরেখা। তার পশ্চিমে পাহাড় বনভূমি এবং সমুদ্র। সমুদ্র সেখানে প্রবল প্রাণবন্ত। পাহাড়টা সেখানে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে—অত্যন্ত খাড়া। উঁচু মাথায় আলোঘর—সমুদ্রের উপর এখন থেকেই আলো ফেলতে শুরু করেছে।

মোবারকের একবার ইচ্ছা হল খাড়া পাহাড়টায় উঠতে। কিন্তু প্রবলভাবে মোড় দেওয়া বলে পাহাড়টার পথ কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে মিশেছে সে হদিশ এখান থেকে সংগ্রহ করা মুশকিল।

ট্রাম লাইনটা গেছে পশ্চিম হতে পূবে। বন্দরের মানুষগুলোই একমাত্র এখান থেকে ট্রামে ওঠে। পরে দু ফার্লং পথ একান্ত জনহীন। এর ভিতর কোন স্টপেজ নেই। শুধু ঢেউখেলান পাহাড—চড়াই আর উৎরাই। নিউ-প্লাইমাউথ শহরটা পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে গ্যালারির মত গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ঘর থেকে সমুদ্রের [illegible] আর জাহাজ স্পষ্ট। জাহাজ থেকে ফানেলের ধোঁয়া ঘর বাড়ি পার হয়ে এগমণ্ট পাহাড়ের দিকে ছোটে এবং নিঃশেষে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেয় একসময়।

মোবারক এসে থামল এক ধূসর সংকীর্ণ উপত্যকায়। সে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে দুটো পাহাড়ের ফাঁকে এসে গেল। এখানে পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে। সে বাঁশিটা বের করে এই সংকীর্ণ উপত্যকায় পা দুটো বিছিয়ে বসল। শুকনো কাঠের উপর বসে সামনের এক-আকাশ তারা আর শহরের প্রতি দৃষ্টি ছাড়িয়ে নিভৃতে বাঁশিটা বাজাল। তারপর আবার পথ ধরে হেঁটে গেল সামনে। ইলেকট্রিকের তার মাঠের উপর দিয়ে ছায়া ফেলে ফেলে ক্রমশঃ বুঝি ওয়াইঙ্গানার দিকে চলে গেছে। সেই ছায়ায় ট্রাক্টর দিয়ে মাটিতে চাষ করছে চাষীরা। চাষীর মেয়ে-বৌ মাটি থেকে নুয়ে নুয়ে কিছু সংগ্রহ করছে। মোবারক সেখানেও হাঁটছে বাঁশি বাজিয়ে। চাষী আর ওর মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। একটি অভূতপূর্ব বিদেশী সুরে তন্ময় হয়ে শিস দিল মেয়েটি। এবং মোবারক যখন সামনের আপেল-বাগানটায় পিকাকোরা পার্কের পথ ধরার জন্য ঢুকে গেল, মেয়েটি তখন কাঁধে তার বেলচে ফেলে একটি ইংরাজী গান ভারতীয় সঙ্গীতের অনুকরণ করে গাইবার চেষ্টা করল।

মোবারক শুনেও যেন শুনল না। সে শোনে না। সে এমন তো কত বন্দরে দেখে এল।

পিকাকোরা পার্কে যেতে হলে দুটো পথে যাওয়া যায়। এক শহর ধরে—ফিজ-রয়ের বুক মাড়িয়ে। আর-এক, এই চড়াই-উৎরাই, গমক্ষেত, আপেল-বাগান এবং প্রেস্-বেটেরিয়ান চার্চটা যে পাহাড়-ছাদে আছে, সেই পাহাড়-ছাদ অতিক্রম করে।

এখন সেই পথ ধরেছে মোবারক। সে নুয়ে নুয়ে বাঁশি বাজিয়ে উঠছে পাহাড়-ছাদে।

পাহাড-ছাদে ওঠার পথ ত্রিশ ডিগ্রী সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মত। দু দিকে ঢালু জমি। জমিতে মসৃণ সবুজ ঘাস। সারি সারি কোরী-পাইনের বনভূমি। অনেক নীচে ঢালু জমির কোলে কোরী-পাইনের গাছগুলো সেপাইসান্ত্রীর মত সমস্ত নগরীকে পাহারা দিচ্ছে যেন। উপরে উঠতে হলে ওদের বলে কয়ে উঠতে হবে সেই বুঝি নিয়ম।

যেহেতু বরফ ঝরে গেছে সেইহেতু কোরী-পাইনের পাতাঝরা শাখায় শাখায় নূতন কিশলয় খেয়ালখুশি মত বর্শার ফলকরেখায় প্রকাশ পাচ্ছে। পথ ধরে হেঁটে গেলে অদ্ভুত এক সবুজ গন্ধ—সবুজ ঘাসের এইসব দৃশ্য মোবারককে বাঁশির ভিতর পুনরায় উন্মনা করে দিল। সে পাহাড-ছাদে উঠছে বাঁশিতে ভারতীয় হাল্কা সঙ্গীতের সুর দিতে দিতে। নির্জন সেই কোরী-পাইনের বনভূমি ভারতীয় নাবিকের পায়ে পায়ে ছন্দ মিলিয়ে বুঝি শিস দিচ্ছে!

মোবারক অবাক হল এবং নীরব হয়ে দাঁডাল পথের উপর। অনেকক্ষণ কান পেতে সে অনুভব করতে পারল পিছনে ফেলে-আসা গমক্ষেতের সেই মেয়েটিই শিস দিচ্ছে। ঠিক ওর বাঁশির সুরের সঙ্গে এক লয়ে। পথটা ইংরেজী 'S' অক্ষরের মত পাক খেয়েছে বলে মোড়ে এসে সেই শিস পুনরায় কানে এল। এবং পেছন ঘুরতেই দেখল অনেক নীচে সমুদ্র—নীল-লাল মিশনের আলো—জাহাজ, জাহাজের ফরোয়ার্ড পিক। পাহাড়ের আর-এক ধাপে মোটরগুলো খুব জোরে ছুটছে। ওরা নিশ্চয়ই সেন্ট ম্যারাইনে যাচ্ছে। মোবারকের তীব্র আপসোস শেখরকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি বলে। সে এল একা। শেখরটা কেমন যেন। একেবারেই ঘরমুখো। কেবল বই-এর উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বড়-জোর সি-ম্যানস্ মিশন পর্যন্ত আসবে। তার অধিক নয়। তার অধিক যদিও পা বাড়ায় সে দিনে। দিনমানে তার জাহাজে ফেরা চাই নতুবা সে মোবারকের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মোবারক আবার ফেল্ট-ক্যাপ আর ওভার কোট টেনে-টুনে পাহাড়-ছাদের দিকে পা বাড়ালে—শুনল, কে যেন চীৎকার করে ডাকছে ওর নাম ধরে। ডাকছে—মো—বা—র—ক। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার ডাক উঠতেই সে অবাক হয়ে

চারিদিকে চাইল ঘুরে ঘুরে। অথচ কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু মনে হচ্ছে গলাটা কোনো মেয়ের।

সন্তর্পণে ভাল করে নজর দিয়ে ও যখন কিছু দেখতে পেল না তখন সে ভয়ে ভয়ে যেন উত্তর করলে—কে! কে আমায় ডাকছেন?—তার সেই কথার প্রতিধ্বনি পাহাড়-ছাদে উঠে খান খান হয়ে উপত্যকার বুকে ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মেয়ে পাহাড়-ছাদের কোরী-পাইনের অন্তরাল হতে বের হয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। সেই একঝাঁক মেয়ের ভিতর হতে বের হয়ে এল লিলি। পাহাড-ছাদ হতে সে নেমে আসছে—ঠোঁটের ভাঁজে ওর ইংরেজী গানের এক কলি—'উই আর ইন দি সেইম্ বোট'। সে গান গেয়ে গেয়ে নীচে নেমে আসছে।

মোবারক লিলিকে দেখে যতটা অবাক না হয়েছে, তার চেয়ে দ্বিগুণ বিস্ময় মেনেছে এই একঝাঁক মেয়ের হাসিব বহর আর উঁকি-ঝুঁকি দেখে। ওরা তখনও খিল্ খিল্ করে হাসছে, মোবারকের মনে হল লিলি নিশ্চয়ই এই এক-দঙ্গল মেয়ে নিয়ে অন্য পথে ওকে অনুসরণ করেছে। নিশ্চয়ই ওর সৌন্দর্যবোধকে ব্যঙ্গ করার জন্য ওরা অমনভাবে ওকে চমকে দিয়ে ওর গতিপথে রুখে দাঁড়িয়েছে।

লিলি নীচে নেমে তখন পথের ওপর ওর হাত ধরে বলল—এস।

সেই পাক-খাওয়া সবুজ পাহাড পথে ওর হাত ধরে টানতে টানতে লিলি মোবারককে পাহাড-ছাদে নিয়ে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য হল এবারও মোবাবক। এই পাহাড়-ছাদে একটি দীর্ঘ কাঠের সবুজ হোস্টেল-ঘর যে আছে এবং এখানে একদঙ্গল মেয়ে সামনের প্রেস-বেটেরিয়ান মিশন স্কুলে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, নীচে থেকে একেবারেই তা বোঝা যায় নি! এমন কি বোট-ডেক থেকে বাইনাকুলার দিয়ে পর্যন্ত একবার খুঁজে খুঁজে দেখা হয় নি।

লিলি নিজের ঘরে মোবারককে নিয়ে ঢুকল। ঘরগুলি আকারে ছোট বলে মোবাবক দরজা দিয়ে ঢুকতে অত্যন্ত নুয়ে ঢুকেছে। পাহাড়-ছাদের একদঙ্গল মাউরী মেয়ে হেসেছে নিঃশব্দে ওর অবস্থা দেখে। মোবারক ঘরে ঢুকে দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। লিলি বলল—আমি এইমাত্র মিশনে যাব ভেবেছিলাম। আজ আমার প্রোগ্রাম ছিল সাড়ে-আটটায়। কিন্তু হঠাৎ নীচে আমাদের প্রেস-বেটেরিয়ান মিশন হোস্টেলের জানলা থেকে তোমার বাঁশির সুর শুনতে পেলাম। কোরী-পাইনের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম—তুমি ক্রমশঃ পাহাড়পথ ধরে উপরে উঠে আসছ। তোমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য সকলে একসঙ্গে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলাম আর দেখছি তুমি তখন মাউথ অর্গানটা বাজাতে বাজাতে উপরে উঠে আসছ

তারপর লিলি সব মেয়েদের প্রতি হাত তুলে বলল—এরা সবাই আমার সিস্টার। এখানে আমরা সকলে সিস্টার হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছি। এই বিদ্যালয়—Sisters' Training School. এখানকার পাঠ শেষ করে সবাই একদিন সাউথ আর নর্থ আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছোট ছোট শহরে, গ্রামে চলে যাব মানুষের সেবার জন্য।—হঠাৎ লিলির কি মনে পড়তেই বললে—তোমার হাতটা, দেখি তোমার হাত। জল নিশ্চয়ই ধর নি।—কিন্তু হাতের উপর কোন dressing না দেখে সে অবাক হয়ে বলল—একি হাতটা খালি! নোংরা লেগে বিষাক্ত হবে যে!—বলে হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে দেখল এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—না না অমন করে চলো না মোবারক। আমাদের এখানে যখন প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, তখন এ কথাই বলা হয়—আমরা প্রত্যেকে প্রথম যেন নিজেদের চিনতে শিখি, নিজেদের ভালবাসতে শিখি। নিজেব শরীর সুস্থ না থাকলে অপরকে কি করে সেবা করব বলো, তুমি তোমার শরীরের প্রতি অবহেলা করো না, তুমি নাবিক বিদেশ-ভুইঞে তোমার বাস।

শেষ পর্যন্ত লিলি আবার বললে—ছিঃ ছিঃ এতক্ষণ মোবারককে দাঁড করিয়ে রাখলাম, এস—বোস। কফি খাবে। লিজেন, যা তো কিচেন থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে আয়।

মোবারক বললে চেয়ারটায় বসে—এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না তো?

—দিচ্ছি দিচ্ছি। এলে যখন একটু বস। পরিচয় আর কি করবে? পরিচয় তো এদের তোমায় দিয়েই দিয়েছি। আমরা এখানে সবাই সিস্টার। আর তোমার পরিচয়! সে খবর তারা কালই জেনেছে।—বলে সে সাদা ভেলভেটে আবৃত একটি তাকের প্রতি চাইল। অর্থাৎ ওর অন্তরালে ভায়োলিনটা চুপ করে যেন উঁকি দিয়ে মোবারককে দেখছে। বললে—ভায়োলিনের তারটা জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

মোবারক বলল—হাতটাও আমার সেরে গেছে।

লিলি সেই সময়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে প্রায় প্রত্যেককে একটা একটা দিয়ে নিজেও একটা ধরাল। মোবারক এক ধমক ধোঁয়া টেনে বলল—তোমাদের এ কাঠের ঘরগুলো সত্যি সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগে।—কিন্তু আমার যে এখন উঠতে হয়—একটু পিকাকোরা পার্কে যাব ভাবছি।

—সে যাবে, আমিও না-হয় সঙ্গে যাব।

—তোমার সাড়ে-আটটায় আবার প্রোগ্রাম যে।

—সাড়ে-আটটা বাজতে এখনও বেশ দেরি।

ঘরের ভিতর দুটো লোহার খাট। খাটে সাদা তকতকে চাদরের নিভাঁজ আস্তর। ছিমছাম ঘরের চেহারা, ঘরের সবুজ দেয়ালে সারি সারি ফটো। 'বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু দেখান হয়েছে—পরের ছবিটা যিশুর কবর হতে পুনরাবির্ভাবের'।

মোবারক শেষে ইলেকট্রিক হিটারের পাশে টিপয়টার দিকে তাকাল। টিপয়ের উপর নীল ভেলভেটের ঢাকনা। উপরে তার কাচ-ঘেরা আলোঘর—বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকতম উৎকৃষ্ট বাতি। এবং পাশেই, দেয়ালে ঝুলছে একটি বড় লাল ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারটার গতকালের তারিখের উপর একটি লাল ক্রশের দাগ। মোবারক সেটা দেখল খুব হিসেব করে যেন—বড্ড সূক্ষ্ম হিসেবে দেখল।

কফি এল এক কাপ—কফি লিজেনই পরিবেশন করল মোবারককে। লিলি তার কোমরের সাদা এপ্রনটা খুলে রেখে বলল—পিকাকোরা পার্কের পথ এদিক দিয়ে সহজ সে তোমায় কে বলেছে?

—জাহাঁজের একজন উইনচ-ড্রাইভার।

প্রত্যেকেই ছোট ছোট কাপে কফি পান করছে আর শুনছে মোবারকের কথা। দেখছে মোবারকের অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেহ, ওর গায়ের রং, ওর দেহের অপূর্ব বাঙালী চেহারার ঢং।

লিলি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে বলল—তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের মাউরীদের চেহারায় বেশ একটা মিল আছে। শুধু শরীরের দিক থেকে আমরা তোমাদের চাইতে একটু খাটো।

মোবারক হঠাৎ হেসে বলল—আর তোমাকে যদি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া যেত তবে বাঙালী ঘরের লক্ষ্মীমেয়ের মত দেখাত।

"একসঙ্গে সেই একঝাঁক মেয়ে ওর দিকে ঝুঁকে বলল—তোমার দেশের মেয়েরা শাড়ি পরে তাই না মোবাবক?—শাড়ি পরলে দেখতে কেমন লাগে?—শেষ প্রশ্নটা করল লিজেন।

মোবারক কফিটুকু শেষ করে লিজেনের হাতে কাপ দিয়ে বলল—বাঙালীর মত লাগে, ভারতীয়ের মত মনে হয়। তারপর সে সক্রেটিসের ছবিটার প্রতি আর-একবার চেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে পা বাড়াতে চাইল সামনের চত্বরটার প্রতি। কিন্তু লিলি বাধা দিয়ে বললে—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব। পিকাকোরা পার্ক ঘুরে সব দেখিয়ে শুনিয়ে তারপর না-হয় এক সঙ্গেই সি-ম্যানস মিশনে যাওয়া যাবে। কোন আপত্তি থাকবে না আশা করি।

মোবারক বারান্দায় নেমে লিলির জন্ত অপেক্ষা করল। বলল—নিশ্চয়ই না।

আপত্তি থাকার মত কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, বিশেষত যতক্ষণ তোমার দেশে আছি।

একসময়ে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল লিলি আর মোবারক। লিলির পোষাকে নিখুঁত পরিপাট্য—নীল ডোরা-কাটা স্কার্ট, রক্তলাল ফুল ছাপের ব্লাউজ, কাঁধে ঝুলান ফারের ঘি-রঙের কোট—মাথায় ধূসর পালকের টুপি, জুতোর হীলদুটো ওর নিতম্বকে খাড়া করে রেখেছে।

এই পাহাড় আর সামনের একটি সংকীর্ণ উপত্যকা পার হলেই পিকাকোরা পার্ক। পার্কের নামডাক প্রচুর। নিউজিল্যাণ্ডে কোন বিদেশী গেলে প্রথমেই কোন দর্শনীয় বস্তু হিসাবে পিকাকোরা পার্কের নাম উল্লেখ করা হয়। মোবারক সেই পার্ক দেখতে যাচ্ছে।

পথে লিলি মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পিকাকোরার উপর করে ফেলেছিল। ওরা কোথায় বসে একটু বিশ্রাম করবে, কোন্ গাছটা দু হাজর বছরের—ঝিলের উপর ক'টা স্কীপ, স্কীপগুলো ভাডা করে বেড়াবে কি বেড়াবে না, নৌকাবিলাসে কত খরচ তারি মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে করতে একসময় উপত্যকাটা পার হয়ে এল।

লিলি বলেছে—এমন পার্ক হয়তো তুমি কোথাও দেখতে পাবে না।

মোবারক উত্তর না-করে শুধু হেঁটে হেঁটে গেছে।

পিকাকোরায় ঢুকে তার মনে হল—তার চিটাগাং দেশের পার্বত্য অঞ্চলের অযত্নে বর্ধিত অবিন্যস্ত বন। কোথাও তার সংকীর্ণ পথ আছে। কোথাও পথের নিশানা নেই। বিরাট বিরাট কোরী-পাইনের তলায় হাজারো আগাছা, আগাছার বুকে নীল হলুদ ফুল, ফুলের গন্ধে নেশাগ্রস্ত হয়ে যেন মেয়েটা মোবারকের হাত ধরে চলেছে। সেই বনভূমিতে দশ গজ অন্তর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে বিংশ শতাব্দীকে সজাগ করে রেখেছে।

আগাছার মাথা ভেঙ্গে মোবারক আর লিলির পথ করে চলেছে। জোড়ায় জোড়ায় অমন কত মানুষ রাতের নিভৃতে বন্য প্রেমে মশগুল। ওরা বিচিত্র রকমের আলাপ করছে বন্য ছায়ার অলিতে-গলিতে। মোবারক আর লিলি ওদের প্রতি চোখ না তুলে সেই ছোট্ট ঝিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝিলের উত্তর তীর ধরে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। ছোট ছোট স্কীপ কিনারায় বাঁধা। উত্তর তীরেই রয়েছে রেষ্টরুম। বারান্দায় রয়েছে গোল টেবিল। ওখানে কজন সাহেব-মেম বসে গল্পগুজব করছেন আর বোতলের মদ গলায় ঢালছেন। নীচে বৃত্তের মত গোল করা শৌখিন

বাগান। বাগানে মৌসুমী ফুলের চাষের জন্য মাটিগুলোকে ভুর ভুরে করে রাখা হয়েছে।

মোবারক আর লিলি বসল সিঁড়ির রকে, স্কীপের উপর একটা পা রেখে।

লিলি ছোট স্কীপটার গলুইয়ে পা নাচিয়ে বলল—চল না মোবারক স্কীপে সামনের পাহাড়টায় ঘুরে আসি। বেশ আনন্দ পাবে।

মোবারক বললে—আজ না আর-একদিন।—শেষে বললে—এই তোমার পিকাকোরা পার্ক।

—কেন তোমার ভাল লাগে নি!

—সে কথা বলেছি?

—তবে?

—রাতে ঘোরার পক্ষে এ নেহাৎ মন্দ জায়গা নয়।

—এর অর্থ?

—অর্থ সহজ। কোন জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। আমার দেশে এমন জঙ্গলে রাতের বেলায় ঘুরতে হলে খুব বিপদ হতে পারে।

—তোমার দেশ বিচিত্র।

লিলি ঝিলের পাড ধরে যাবার সময় বললে—আমার যেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখন না গেলে সাড়ে-আটটাব প্রোগ্রাম ধরতে পারব না। তুমিও চলো সঙ্গে।

—পার্কটা আর-একটু ঘুরে দেখব ভাবছিলাম।

—আজ চল। কাল দেখবে। আমিও আসবো তোমার সঙ্গে।

কি ভেবে মোবারক বলল—বেশ তাই চল। নয় তো আবার কোথায় জঙ্গলে হারিয়ে যাব তারপর আর হয়তো খুঁজেই পাবে না।

লিলি হাসল। মোবারকও হাসল। পিকাকোরা পার্কের শেষ মাথায় এসে মোবারক পুনরায় বাঁশিটা বের করল প্যাণ্টের পকেট থেকে। এখান থেকে শহর আরম্ভ।

লিলি মোবারকের ডান হাতটা নিজের নরম হাতের ভাঁজে এনে বললে—ফিজরয়ের ট্রাম ধরব, সময় কম লাগবে আমাদের।

মোবারক দ্রুত হাঁটতে লিলি বলল—একটু আস্তে চলো, তোমার সঙ্গে হেঁটে যে পারছি না।

—এসো। আস্তেই হাঁটছি। ওখানটায় কি হবে? অনেক লোকজন কাজ করছে একসঙ্গে।—একটি মাঠের দিকে নির্দেশ করে মোবারক প্রশ্ন করলে লিলিকে।

—কুইন এলিজাবেথ কমনওয়েল্‌থ টুরে এখানটায় আসছেন।

—কবে ?

—তা প্রায় ধরো আরো একমাস।

—এত আগে থেকে !

—অনেক খরচপত্তর হবে। গোটা শহরটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলবে ; তাই এত আগে থেকে প্রস্তুতি। শহরের কোন খুঁত যেন অতিথির চোখে ধরা না পড়ে।

—কুইনকে হয়তো দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না।

—কেন, কেন ?

—তার আগেই হয়তো জাহাজ ছেড়ে দেবে।

—তার আগেই দেবে !—কথা বলতে যেয়ে লিলির গলাটা হঠাৎ খুব ভারি হয়ে উঠল। চলতে চলতে আবার সে বললে—আচ্ছা মোবারক এই যে দুদিনের পরিচয় আমাদের সঙ্গে তোমাদের হয়, তোমরা যখন চলে যাও তখন কষ্ট হয় না ?

এমন একটা প্রশ্ন লিলির, যার সহজ এবং সত্য উত্তর 'হয় না'। তবু মোবারক অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল—হয় এবং সহ্যও করতে হয় তা। তার জন্যই আমরা জাহাজী, আমরা নাবিক। পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে আমাদের এমন ঘটে। তার জন্য তোমাকে দেখার সঙ্গে কত মেয়ের মুখ যে মনে পড়ে। উইলিয়ামের স্ত্রীকে মনে পড়ে, এডিস-ডি-কেলী, ডিয়েনা সকলকে এমনি বন্দরে বন্দরে রেখে এসেছি—জাহাজ ছাড়ার সময় অন্য নাবিকের কেমন হয় বলতে পারি না, আমার কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে তাদের জন্য। তাদের দেখেছি বন্দরে দাঁড়িয়ে জাহাজ ছাড়ার সময় হাতের রুমাল উড়িয়ে দিতে। আমাকে অভিনন্দন জানাত দুটো হাত নেড়ে। বলত—আবার যখন আসবে আমাকে চিঠি দিয়ে আসবে কিন্তু। তোমার জন্য আমি জাহাজ ঘাটায় অপেক্ষা করব। এমন অনেক বন্দর আছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বার যেখানে হয়তো আমার আর যাওয়াই হবে না।—কথা শেষ করে মোবারক মাউথ-অর্গান বাজাল। নিজের দুঃখ ঢেকে রাখার জন্য ছুটে নেমে গেল। লিলিকে ছুটে ছুটেই প্রায় আসতে হয়েছিল সেই সময়।

ট্রামে উঠে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে লিলি। ট্রামের যাত্রীরা মোবারককে তখন দেখছে। দৃষ্টিতে বিস্ময়। ওকে খুঁটে খুঁটে নিরীক্ষণ করছে। এমন কি দু-একজন উঠে ওর কাছে এসে বসল। শুধাল, নাম ? দেশ ? কি করা হয় ?

মোবারক মোটামুটি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল একেবারে। লিলি মাঝে মাঝে বাইরে আঙুল দেখিয়ে বলছে ওকে—এটার নাম এই, পথের নাম এই,

এখানে পোষ্টাপিস আছে, দূরের ওই যে বাড়িটা দেখছ ওটা কলেজ। এটা মিউজিয়াম। একদিন তোমায় সব দেখিয়ে নিয়ে যাব।

মোবারক কখনও শুনেছে কখনও শোনে নি। কখনও বাঁশি বাজানর শখ জন্মেছিল ওর। কিন্তু এই একদল যাত্রীর সামনে সে কেমন লজ্জিত, কুণ্ঠিত এবং সংকুচিত। তাই সে লিলির পাশে আরো ঘেঁষে বসল। লিলি যেন সমস্ত বিপদে তার সহায়।

মোবারক ট্রামের জানালায় মুখ রেখেছে। ট্রামের গতির সঙ্গে ফিজরয় আর লিলির জগৎকে অতিক্রম করে সে বিচরণ করছে তার নিজের জগতে—সেখানে রয়েছে তার বাপজী, আম্মাজান, নানা জসীমউদ্দিন সারেং, জৈনব খাতুন। পৃথিবীর ভাল কিছু দেখলেই মনে হয়, ওর শামীনগড়, শামীনগডের মাঠ—তার সড়ক, কাঠের পুল, কর্ণফুলীর বাঁওড়। বন্দরের অপরাধ-প্রবণ জীবনটা দেখলেও মনে হয় বাপজী আম্মাজান—। অথচ শামীনগডের জগৎ স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ওর বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখদুটো ক্লান্ত—অসহায় এবং নালিশ জানাবার একান্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু কাউকে বলতে পারল না বলে, কাউকে তার বিগত জীবনের ইতিহাসটা প্রকাশ করা হয়ে উঠে নি বলে বিষকুম্ভের মত সে জলে পুড়ে খাক হচ্ছে নিজের আত্ম-যন্ত্রণায়। এই যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্যে সে ভালবেসেছে তার বাঁশিটাকে আর শঙ্খচুড সাপটাকে। যখন মনের ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে বেইমান বলে মনে হয় তখনই ব্যাগ থেকে সাপটাকে টেনে বার করে এবং ডেকের উপর কিংবা বন্দরের পথে সাপ নাচিয়ে নিজের আত্ম-যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। অথচ শেখর তা বুঝল না।

ফিজরয় অতিক্রম করে ট্রামটা ডান দিকে একটি বাঁক ঘুরল। তারপর সামনের দিকে অর্থাৎ সি-ম্যানস মিশনের প্রতি। নীচে বেলাভূমি। কার্নিভালের খালি দোকান-পাট এবং উপরের দু-চারটা অসংলগ্ন কাঠের ঘর, ঘরের জানালায় বিদেশিনীর মুখ, মেঝের উপর দু-একটি ফুটফুটে ছেলের দৌরাত্ম্য। শিশুদের দেখলে মোবারক হাসে—নিজের জগতে ফিরে আসার পথ খুঁজে পায়? সে প্রশ্ন করল তাই লিলিকে—তোমাদের বাড়ি কি নর্থ স্নায়ার্লাণ্ডে?

—একথা কেন মোবারক?

—হোষ্টেলে থাক বলে বলছি।

—ফিজরয়ে আমার বাড়ি। সেখানে মা আছেন।

—বাবা?

—নেই, আমার শিশু বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মোবারক কথা শুনেই খুঁটে খুঁটে লিলিকে দেখল। উত্তরটা ওর কাছে

বেখাপ্পা ঠেকছে—মা আছেন বাবা নেই!—শিশু বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্রমশ ওর নাকটা এবার কুষ্ঠব্যাধির রুগীর মত দু-দুবার ফুলে উঠে আবার সংকুচিত হল। মোবারক বলল—তিনি আবার বিয়ে করেছেন নিশ্চয়ই।

—না, বিয়ে তিনি আর করেন নি। করবেন না। আমার মাকে দেখলে তুমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারবে।

—সেখানে তোমার ছোট ভাই কিংবা অন্য কেউ আছে?

—একমাত্র আমিই তাঁদের সন্তান। তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে? চল না কাল। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে মা খুব খুশি হবেন।

মোবারক চুপ করে থাকল। আম্মাজানকে মনে পড়ছে। শামীনগড়ের সড়ক পার হয়ে টিন কাঠের ঘর, আম্মাজানের আয়ত চোখ আর নাকের সরু নথটা বাঁশপাতার মত কেঁপে কেঁপে কিসের ইসারা দিচ্ছে যেন।

মোবারকের একরাশ-লোমে আবৃত হাতের কব্জিতে লিলি নিজের নরম আঙুল-গুলি স্পর্শ করে করে বলছে তখন—যাবে তো কাল? চল না মা খুব খুশী হবেন।

মোবারক তেমনি মুখ রেখেছে জানালায়। সিম্যানস মিশনের প্রতি গাড়িটা কত জোরে ছুটেছে তাই যেন মুখ বাড়িয়ে দেখছে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতরও ওর কপাল ঘামছে।

লিলি বলল—তোমায় আমি নিয়ে যাব কাল।

—না না নিয়ে যেতে হবে না। মোবারক চীৎকার করতে যেয়েও কেমন নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করে নিল এবং লিলির মুখ থেকে চোখ নামিয়ে ট্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি দিতেই দেখল সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে—ওর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী আর দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখের বিকৃত রূপের কোন সুপ্ত আত্মচিন্তার কথা ওরা সন্তর্পণে শুনছে।

এমন সময় লিলি কথার মোড় ফিরিয়ে বলল—মোবারক আমার দেশ তোমার কেমন লাগে?

—ভাল। বেশ লাগে।

ইতিমধ্যে ট্রাম ছোট ছোট দুটো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেছে। বন্দর-পথ এসে মিশেছে চড়াই-উৎরায়ে। সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড গেট। ছাদে তার একটি ক্রাউন—কাগজ আর ইলেট্রিক ভাল্বে তৈরী। ক্রাউনের দু পাশে দুটো প্রকাণ্ড পিচবোর্ডের সিংহ থাবা উচিয়ে জাহাজগুলোকে যেন দেখছে। কুইন এলিজাবেথ

আসছেন, প্রথমে তিনি এই সদর দরজা দিয়ে বন্দর পথে শহরে ঢুকবেন। তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে এই সব করা হয়েছে।

লিলি সিংহ দুটো দেখে প্রশ্ন করলো—মোবারক তোমার দেশে সিংহ পাওয়া যায়। তুমি সিংহ দেখেছ?

—দেখেছি।

—বাঘ?

—চিটাগাংগে অনেক বাঘ। সুন্দরবন থেকে—রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?—দয়া করে তারাও এসে মাঝে মাঝে আমাদের অঞ্চলে করুণা করেন। সুতরাং বাঘ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই প্রায় বাঘ শিকার করতে যেতে হত।

—তারপর?

তারপর মোবারক তার নিজের জীবনের এক আশ্চর্য বাঘশিকারের কাহিনী লিলিকে বললে, ট্রামের মেয়ে-পুরুষেরা পর্যন্ত—শুধু আশ্চর্য হল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছু যেন বললে।

লিলি সে সময় প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছ?

—মোবারক মিথ্যা বলে না, বলে কোট খুলে ফেলল এক টানে, প্যাণ্টের ভিতর থেকে জামাটা টেনে তুলে দেখাল পিঠের ক্ষত স্থানটি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রামের মেয়ে-পুরুষরা সব এসে ঝুঁকে পড়েছে ওর পিঠের উপর। দেখছে বিস্ময়-ভরা দুটো চোখ মোবারকের পিঠে এক আঁজলা মাংস নেই।

লিলি তাড়াতাড়ি ওর জামা টেনে পিঠটা ঢেকে দিল। বললে—তুমি আশ্চর্য মোবারক। তোমাকে তার জন্য পিঠ খুলে নজির দিতে বলি নি।

মোবারক সেই শুনে কেমন ফ্যাল ফ্যালে করে চেয়ে রইল। আবার তাকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে।

লিলি হেসে বললে—হয়েছে থাক, অমন করে আর চেয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু দেখবে নামার সময়, হুঁশিয়ার হয়ে নামবে, মাথা যেন ছাদে না ঠেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার ঘটল। মোবারককে নামবার আগে অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে হয়েছে। এবং সতর্ক হয়ে বেঞ্চ থেকে না উঠার জন্য ওর মাথাটা ধাক্কা খেয়েছে রডে। রডের জয়েণ্ট ছুটে গেল। মোবারক চেয়েছে ফ্যাল ফ্যাল করে আবার। ওর নরম মন লজ্জিত হল। ওর বেহুঁসের জন্য এমন হয়েছে। তাই বললে কনডাক্টারের প্রতি—আমি এর খেসারত দিচ্ছি—দয়া করে আপনি নিন। আমার অপরাধ হয়েছে?

লিলি দু হাতে ওর মাথাটা কাছে টেনে বলল—দেখি—দেখি, আগেই বলেছি এমনটা হবে—আমার কথা তো তখন খেয়াল করলে না।

—না না তেমন কিছু হয় নি। তুমি আমায় বিশ্বাস কর।—কনডাক্টারের প্রতি আবার চেয়ে বলল—আমার খেসারতটা? পাউণ্ড তিনেক দিলে নিশ্চয়ই চলবে।

কনডাক্টার হেসে উঠল। বললে—ধন্যবাদ। পাউণ্ড তিনেক দিয়ে ডাক্তার দেখান হোক। মাথায় আপনার নিশ্চয়ই চোট লেগেছে। অপরাধ কোম্পানীর—রডটা আরো উপরে ঝুলান উচিত।

—আমার কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। বলে সে কনডাক্টারের প্রতি পিঠের আঘাত দেখানর মত মাথা দেখাবার প্রচেষ্টা করতে গেলে, লিলি তার হাত টেনে বলল—এস নামবে। আমরা এসে গেছি মিশনে।

মোবারক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় শুনল কথাটা। লিলি কথাটা শুনে মোবারকের প্রতি আকৃষ্ট হল আরো তীব্রভাবে। ট্রামের মেয়ে-পুরুষরা বলছে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়—ইণ্ডিয়ান, এ ম্যান অফ্ মিষ্টিক ল্যাণ্ড।

মোবারক ফিরছে জাহাজে। একা। শেখর আজ সি-ম্যানস মিশনে যায় নি, নিশ্চয়ই এখন সে বাংকে শুয়ে বই পড়ছে ফিরিঙ্গিদের। বিদেশ-বন্দরে নেমেই ওর ফিরিঙ্গীদের বই কেনার বাতিক। সফরের অর্ধেক পয়সা বই কেনার পেছনে খরচ করছে। বড় মালোম থেকে জাহাজের সব অফিসারগুষ্টি ওর থেকে বই চেয়ে নেয়। পড়ে। আবার ফিরিয়ে দেয়।

মোবারক কাঠের সিঁড়ি ধরে ডেকে উঠছে। গ্যাংওয়েতে ঝিমোচ্ছে কোয়ার্টার মাস্টার। একগাল দাড়ি আর ভুরুর ভিতর চোখদুটো ওর জুতোর শব্দে সজাগ হল। একটু নড়ে চড়ে বসল। আল্লা আল্লা করে মুখের কাছে তুড়ি দিল হাতে।

মোবারক বললে—চাচার ঘুম পাচ্ছে।

—হাঁরে বাজান, বুড়া যানে আর সহ্য হয় না।

জাহাজ নিশ্চুপ। ফল্কায় ফল্কায় ইতস্তত আলো জ্বলছে। ফল্কার উপর কাঠ বিছান। তারপরে ত্রিপল বিছান। কিনারায় লোহার পাত, খিল-আঁটা। আগামী দশ দিনের মত জাহাজের মাল-খালাস বন্ধ। ক্রিস-মাস-ডে। তাই কোন শ্রমিকই কাজ করছে না বন্দরে। বন্দরে ক্রেনগুলো জাহাজে ছায়া ফেলে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফল্কার সমান্তরাল করে ফুট দুই উপরে ডেরীকগুলো পাতা।

উইনচ মেশিনের উপর দিয়ে দুটো ছায়া গেছে বয় কেবিন পর্যন্ত। সে দুটো ডেরিকের ছায়া।

মোবারক দাঁড়াল ডেকে। বন্দর-জুড়ে হাল্কা কুয়াসার রং দেখল। ব্রিজের দু উইংসে কোন আলো জ্বলছে না। ইঞ্জিন রুম থেকে ব্যালেস্ট-পাম্পের খট্ খট্ বিকৃত শব্দ কানে বাজছে শুধু।

সে ডেক পার হল। গ্যালী অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নীচে নাবল। স্টাবোর্ড আর পোর্ট সাইডের ভিতর কোন কেবিনেই যেন কোন শব্দ উঠছে না।

সিঁড়ির শেষ ধাপের পোর্ট সাইডের আলো নেভান। পথ অন্ধকার। কেবিনে ঢুকতে সন্তর্পণে পা ফেলছে মোবারক।

শেষ কেবিন থেকে একটি আশ্চর্য স্থর তিন নম্বর কেবিনে ভেসে এল। নিশ্চয়ই এত রাত্রে কেউ কোরান পড়ছে বাংকে। যেমন শেখর বই পড়ছে বুকে কম্বল টেনে দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে আরো দু-একটি পায়ের শব্দ কানে এল মোবারকের। সে কেবিনের দরজা খুলে আলো জেলে দিতেই চোখ ঝলসে উঠল ওর। ডেক জাহাজী বড় ট্যাণ্ডেল একটি মাউরী মেয়েকে ধরে এনেছে রাতযাপনের জন্য।

ডেক বড় ট্যাণ্ডেল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে কেমন অলস পা ফেলে। সে মদ টেনেছে প্রচুর। মেয়েটাকে জড়িয়ে সে তার কেবিনে ঢুকে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে স্তিমিত গোঙ্গানি মোবারকের কানে ভেসে আসছে। সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল শেখরের মুখের উপর বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুটো হাতই হিমে শীতল। কম্বলটা টেনে দিল বুক থেকে গলা পর্যন্ত। মুখ থেকে বইটা তুলে বাংকের ফাঁক দিয়ে পড়ে থাকা দুটো হাত তুলে এনে কম্বলের নীচে রাখল। তারপর লকার খুলে প্রতিদিনের মত থানা বের করে বাংকের উপরে বসল। কাচের গ্লাসের একগ্লাস জল দরকার। মুন শেখর নীচে লকারের এক কোণায় রেখে দিয়েছে। সে থালায় দেখল দুটো মাছ ভাজা রয়েছে। একেবারে সমান ভাগ। চারটা স্যালমনের দুটো ওর জন্য ভেজেছে।

স্মিমিত হাসি মোবারকের ঠোঁটে। ভাত খেতে খেতে শেখরের প্রতি চোখ তুলে দেখছে—দুটো চোখে ওর গভীর ঘুম। এমন ঘুম মোবারকেরও এককালে ছিল। শামীনগড়ে ছোট্ট এক উঠোনে যখন রাঙা মোরগ ডেকে উঠত—এক ঝাঁক শালিখ ঠোঁট গুঁজে কিচ্ কিচ্ করত কামরাঙ্গা গাছে—যখন আম্মাজান ভোরের আহ্বান শুনতেন গাঁয়ের মসজিদে তখনই তিনি ডাকতেন—মোবারক উঠ। মবু আমার

ওঠরে। ভোর যে হল।—যখন রোদ কামরাঙ্গা গাছের ছায়া উঠোনে ফেলত তখনও ডাকতেন তিনি—মবু রাপ তুই আমার এখনও ঘুম থেকে উঠলি না! বেলা যে অনেক হল, ওঠ, উঠে পড়তে বোস। তোর বাপজী সফর থেকে ফিরে যখন শোনবেন তুই পড়িস না—তখন যে তিনি দুঃখ পাবেন।

শেখরের মুখ অত্যন্ত নিষ্পাপ ঠেকে। তবু ইদানীং সে বলে—মোবারক আর পারছি না। কতকাল হল যেন দেশ ছেড়ে এসেছি। আঠারো মাস সফরে বিরক্ত হয়ে গেছি। কি হবে—কবে যাব কিছুই তোরা বলতে পারছিস না।

সে কি বলবে! সে কি জানে জাহাজের পরবর্তী সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে! ক্যাপ্টেন নিজেও হয়তো বলতে পারবে না। সে খবর শুধু দিতে পারে কোম্পানীর এজেন্ট অফিস। কিন্তু অফিসে আজও লোক গেছে, অথচ কোন খবর নেই।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও মোবারক বসে থাকে। ঘুমের জন্য বসে থাকে। শরীরটা বসে বসে ক্লান্ত না হলে ওর ঘুম আসে না। অনেক সমস্যা এই জাহাজীর। লিলি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার পাহাড়-ছাদে স্কুল হোস্টেলে ফিরে গেছে। শেখরের মতই হয়তো এক ঘরের মেয়ে লিজেন পেতে রেখেছে বিছানা। সাদা ধবে ধবে বিছানায় লিলিয়ু এখন শুয়ে পড়বে।

দেশের মেয়ে জৈনব খাতুন বলেছে এককালে নে না। নিয়ে দেখ না হাতে, বাপজী কেমন চীজ ধরে এনেছে কর্ণফুলীর বাঁওড়ের ভাঙ্গন থেকে। ভয় নেই, ভয় কিরে! বিষদাঁত ওর ভেঙ্গে দিয়েছি। তোর হাতে বনজ বাঁধা। ডর কিসের তবে।

—ডর নেই বলছিস?—অন্ধকারে জৈনব খাতুনের মাথার উপর মুখ রেখে বলেছে। ওর চুলের সোঁদা গন্ধ মোবারকের নাকে কত বছর পরে এখনও যেন ঝাঁঝ দেয়। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বলত অন্ধকারে—নে ধর। তোর আর আমার সাদীর রাতে ওকে মাঝখানে পাশ বালিশের মত শুইয়ে দেব। ছোবল দেবে তোরে আর আমারে। ছোবল নয়, চুমো খাবে।

মোবারকরা সাতপুরুষ নাবিক।

জৈনব খাতুনরা সাতপুরুষ বেদে। ওরা ঘর-বেদে। ওর বাপজী ওঝা। সাপের মন্ত্র পড়ে—বিষদাঁত উপড়ে দেয় সাপের। সাপে-কাটা মড়ার বিষ নামায় মা মনসার উপর খিস্তি করে। খিস্তি করা ওদের স্বভাব। সে স্বভাব জৈনব খাতুনকেও পেয়ে বসেছিল।

দুটো বাড়ি। একটি হরীতকী গাছ বাড়ি দুটোর সীমানা। সে গাছের ছায়ায় দুজনে একত্র হত রাত্রে। কত কথা হত দুজনে। সাদীর পর ওরা কে কাকে প্রথম

বুকে টানবে সেই নিয়ে কথা হত। এ ব্যাপাবে মোবারকের লজ্জা ছিল—কিন্তু জৈনব খাতুন কেমন নির্লজ্জ আর স্বাভাবিক। জৈনব জেনেছে ছোট বয়স থেকে সাদী ওর মোবারকের সঙ্গে হবে। আম্মাজান বলতেন—তোর বাপজীরও এই ইচ্ছা ছিল।

এক টুকরো গভীর অন্ধকার। হরীতকীর ছায়া পার হলে অন্ধকার ধূসর। সে অন্ধকারে পথ চেনা যায়। সামনা সামনি এলে লোক চেনা যায়—পথে কিছু পড়ে থাকলেও অনায়াসে সমঝে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু গভীর অন্ধকারে জৈনবের দেহ ছিল ছায়াশূন্য। শুধু ওর ফিস্ ফিস্ কথাগুলো মোবারকের কানে আসত। শামীনগড়ের গ্রাম তখন ঘুমিয়ে থাকত। শুধু কর্ণফুলির বাঁওড়ে মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ত মিশনারীদের চার্চে। ঘণ্টার শব্দ হত ঢং ঢং। মোবারক বলত তখন—রাত অনেক হল।

জৈনব খাতুন বলেছে—ভারি একটা বাত রে আমার। এখন রাত না জাগতে পারলে সাদীর পর রাত জাগবি কী করে। তখন যে তোবে ঘুমুতে দিচ্ছি না বে মবু। তুই যে আমার দিলের সব দুনিয়া জুড়ে পড়ে আছিস।

তারপর দুজন ফিরত দুই বিপরীত মুখো ঘবে। মোবাবক পাযে পায়ে হেঁটে আসত। দরজা খুলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে আম্মাজানের পাশে শুযে ভাবত—জৈনব ঘরে ফিরেছে, এখন হয়তো শুয়ে পড়েছে নিজেব লাল কাঁথাব বিছানায়। নিশ্চযই সে ঘুম যাচ্ছে খুব। সে এককাল ছিল বটে। ঘুমে ক্লান্ত। বিছানা ছাড়তে দুঃখ। আম্মাজান কেবল ডেকে ডেকে সারা হতেন—ওরে মবু ওঠ, কত আর ঘুমুবি।

তেমন ঘুম আর চোখদুটো এখন ঘুমোয় না, গভীর ঘুম চোখ থেকে নাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরে দাঁড়িয়েছে। কোন হাল্কা আওয়াজ পেলেই অবচেতন মন যেন বলে, না আর ঘুম নয়। মাঝে মাঝে মোবারকের ভয় হয়, ঘুম যদি রাতের অন্ধকারে চির দিনের জন্য বিদায় চায়? তখন? তখন কি হবে! নিশ্চয় শেখর তিরস্কার করবে—করুক, সে তো বুঝবে না সব। মোবারক মাটির গন্ধ ছেড়ে কেন জাহাজী হল, জাহাজী জীবনে কি করে তীব্র অনুশোচনায় এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধের যন্ত্রণায় সে জ্বলছে—শেখর একটু ভেবে যদি কোনদিন কোন প্রশ্ন করে একবার বলত, মাঝে মাঝে তুই সহসা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কি ভাবিস বলত?—তা সে বলে নি, ওর স্বরে শাসন নতুবা করুণা। দরদ কিংবা আন্তরিকতা দিয়ে সে কোনদিন প্রশ্ন করতে পারল না মোবারককে।

লকারের এক কোণে লেদার ব্যাগে শঙ্খচূড়। ব্যাগের দ্বিতীয় ভাঁজে বার ফিটের লম্বা সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে হিস্ হিস্ করছে, সর্পভুক সাপ খানা খেতে চায়—গোমাংস দিনের পর দিন খেয়ে ওর অরুচি ধরেছে।

মোবারক বাংক থেকে উঠে দু টুকরো গোমাংস ব্যাগের ভিতর ঠেলে দিল। তারপর ব্যাগের মুখ বন্ধ করে বাংকে বসতেই,মনে হল প্রথম যেদিন রাতে ওকে সাপটা দেখিয়ে জৈনব খাতুন হরীতকীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—দেখেছিস শঙ্খচূড়ের বাচ্চাটা কেমন হলুদ রং।

মোবারক বলেছে—তোর গায়ের মত।

—পেটের দিকটা দেখেছিস কেমন সাদা ?

—অর্থাৎ আমার মত রং ওর।—মোবারক নুয়ে অন্ধকারে সাপের উপর সন্তর্পণে হাত চালিয়ে বলত, বাচ্চা বলে—দেখবি এটা নিশ্চয়ই পোষ মানবে।

—পোষ মানবে ঠিক তোর মত, তুই যেমন আমার পোষ মেনেছিস। তারপর হঠাৎ আবার মোবারকের হাত টেনে বলত জৈনব—তুই এটা নিবি—বাচ্চা আছে যখন। তুই তো বাপজীকে একটা সাপের জন্য কত বলেছিস ! কিন্তু দেয় নি। ভয়ে দেয়নি কোনদিন বিষ-দাঁত উঠে আবার কামড়ে দেবে সেই ভয়ে। আমি তোকে পোষ মানিয়েছি, তুই এটাকে পোষ মানা—দেখি তোর কত মুরদ।

মোবারক হরীতকী গাছের অন্ধকারে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—তোর বাপজী রাগ করবে না তো ?

—না রে—না। বলব ঝাঁপি খুলে সাপটা কোথায় যে গেল !

—কিন্তু আম্মাকে না বললে যে চলে না।—ততোধিক সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিয়েছে মোবারক।

—তাহলে আম্মাকে বল, বুঝলি ! কাল রাতে না হয় আবার আসব এই অন্ধকারে। বলবি কিন্তু—বুঝলি ! তুই বাপজীকে রোজ রোজ সাপের জন্য জ্বালাতন করে খাস—একটা সাপ পোষার শখ তোর, তাই এটা দিচ্ছি। মনে রাখিস স্রেফ কথা বলে দিচ্ছি—এ সাপটা আমার—বাপজীর কাছ থেকে আজ এটা চেয়ে নিয়েছি। আমার শখের জিনিষ তোরে দিলাম, আমার মত একে ভালবাসবি কিন্তু।

বাংকে মোবারক তখন কম্বল টেনে শুয়ে পড়েছে। মাথার উপরে বাতির বাল্‌বে পাক খাচ্ছে উড়ন্ত তিন-চারটে পোকা। যেমন এই জাহাজটা আবর্তন করছে পৃথিবীকে। ওরা পোর্ট-হোল দিয়ে উড়ে এসেছে ভিতরে। ওদের মৃত্যু আসন্ন।

শঙ্খচূড়ের রং বদলালো অদ্ভুতভাবে। প্রথমে ছিল ওর হলদে রং। দিন যাওয়ার সঙ্গে ওটা বাদামী রঙে বদলে গেল। এখন এর কালো রং। শীতের বিষে সাপটা বুঝি জর্জরিত। মাঝে মাঝে সে এখনও রং পাল্টায়। শীতের বন্দরে একরকম, নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে খয়েরী আবার আফ্রিকার কেপটাউন বন্দরে একেবারেই যেন সাদা।

হয়ে গেল। এই পরিবর্তন দেখে জাহাজীরা অবাক হয়েছে—কিন্তু মোবারক হয় নি। ছ'সাত সফর ধরে সাপের রং পাল্টান দেখে তার অরুচি ধরেছে এখন।

তারপর মোবারক পাশ ফিরে শুয়ে কম্বল টেনে দিল মুখে। স্টাবোর্ড-সাইডের কেবিন থেকে স্টোর-রুমের বাঁক ঘুরে ভেসে আসছে এখনও একটি স্তিমিত গোঙানি। হয় মেয়েটা গোঙাচ্ছে, নয় তো ডেক-বড়-ট্যাণ্ডেল। তুজনেই মদে মাতাল এবং স্থবির। যখন মেজাজ ফিরবে তখন সে নিশ্চয়ই চীৎকার করতে শুরু করবে আর মেয়েটা ফাঁক বুঝে বাথরুমে যাবার নাম করে ডেক অতিক্রম করে জেটিতে নেমে পড়বে।

মোবারক আবার পাশ ফিরে শুল। কম্বলটা এবার মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। কোন শব্দ যেন কানে না আসে। তারপর হাতের কনুইয়ের ভাঁজ চোখের উপর রেখে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকে মুক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল বালিশে মুখ চেপে। ঘুম আসছে না—কাল রবিবার। কার্নিভাল জমবে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। এইচ. জি বুচারের মদের দোকানে লিলি অপেক্ষা করবে তার জন্যে—সে যেন খুব তাড়াতাড়ি কাল বের হয়।

জৈনব খাতুনও তু বাড়ীর সীমানায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করেছিল—কাল আসবি তো! কি রে মবু আসবি কি-না বল?

—রোজ এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হয়?

—কেন, তোকে দেখি।

—দিনের বেলায় তো কত দেখিস!

—সে দেখা আর এ দেখা। তুই কিছু বুঝিস না রে! চুপি চুপি চুরি করে দেখতে তোকে ভাল লাগে। দিনের বেলায় দেখলে মনে হয় তুই বড্ড ভাল মানুষ। ফকির দরবেশের মত মনে হয়। তুই আসবি কিন্তু, কেমন, আসবি তো?

মোবারক অন্ধকারে মাথা নাডিয়ে সম্মতি জানিয়েছে।

অন্ধকার বলে দেখতে পায় নি। জৈনব প্রশ্ন করত তাই আবার—কিছু বললি না যে!

—আসব রে, আসব।—জৈনবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে উত্তর করত তখন মোবারক।

রবিবারের সকালে জাহাজে সব নাবিকেরই কিছু-না-কিছু কাজ থাকে। ফোকশাল সাফাই তাদের ভিতর অন্যতম। সে সময় বাংকের বিছানা গুটিয়ে আফটার-পিকে

তুলতে হয়। বালতি বালতি জল আনতে হয় নীচে, জল ঢালতে হয়। সাবান-জল দিয়ে বাল্কেডের বিভিন্ন এলোমেলো কালির দাগ, নোংরা মুছে দেওয়ার কাজ নাবিকদের। মেঝেটা ভাল করে ধুয়ে তারপর রং করতে হয় তখন। বিছানা রোদে দেওয়ার কাজটাও নাবিকদের ডিউটির মধ্যে ধরা হয়।

ভোরে মোবারক সেই কাজের জন্য এক টব জল নিয়ে নীচে এসেছে। শেখর এনেছে এক বালতি সাবান-জল, নিজেদের কেবিনটা ভাল করে পরিষ্কার করছে তারা। মাঝে মাঝে সারেং উঁকি দিয়ে দেখছে কতটা হল। আর বলছে—জলদি কর রে মিঞা। বাড়ীওলার আসার সময় হইয়া গেল।

ব্রিজ থেকে ঠিক দশটায় ক্যাপ্টেন নীচে নামবে। পিছনে থাকবেন বড় মালোম, তারপর বাটলার। বয়-কেবিন সাফাই সেরে এদিকে আসবেন অর্থাৎ জাহাজের গলুইয়ের দিকে।

জাহাজের গলুইয়ের স্টারবোর্ড-সাইডে ডেক জাহাজীরা এক সারিতে দাঁড়িয়েছে ঠিক দশটা বাজতে পনের মিনিট আগে। পোর্ট-সাইডে ইঞ্জিন-রুমে নাবিকেরা অপেক্ষা করছে সাফাইয়ের জন্য। ইঞ্জিন-সারেং-এর আগের মত ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। একবার গ্যালীতে, একবার মেসরুমে, তারপর বাথরুমে, কেবিনে কেবিনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও ত্রুটি, কোথাও নোংরা কি একদলা বুড়ো জাহাজীর ... পোড়া সিগারেটের টুকরো বাংকের কিনারায় কিংবা কোন অন্ধকারে আড়াল ... কি-না। ঘুরে ঘুরে তাও দেখছেন। ক্যাপ্টেন্ নীচে নেমে কোন ত্রুটি দেখেন তো নিশ্চয়ই বলবেন—ছ্যারেং ক্লিন মাংতা।—এই তিনটি মাত্র শব্দ ক্যাপ্টেনের। ... সেই তিনটি মাত্র শব্দই মাত্র কচলাতে কচলাতে বলবে—ইয়েস স্যার। আই ... ডু।

বুড়ো ক্যাপ্টেন গলুইয়ে উঠে এলে সারেং হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলবে—এক-সারিতে দাঁড়াও রে মিঞার দল।

ক্যাপ্টেনকে কেউ গুডমর্নিং দিল। কেউ সেলাম জানাল।

ক্যাপ্টেন গ্যালীতে ঢুকে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখলেন ভাত, গোস্তের ঝোল, আলু-ভাজা। কতকটা ঝোল মুখে দিয়ে অনুভব করতে চাইলেন ঝোলের কেমন স্বাদ উঠেছে। নাবিকদের প্রতি চেয়ে বললেন—রান্না খারাপ হচ্ছে কি তোমাদের?

সারেং বলল—নো সাব।

ক্যাপ্টেন খেঁকিয়ে উঠলেন—তোমায় আমি জিজ্ঞেস করছি না সারেং।

সারেং চুপসে গেল। মোবারক বললে—ভাণ্ডারীর রান্না ভাল।

ক্যাপ্টেন নীচে নামার আগে ইঞ্জিন-ক্রুদের বাথরুমটা দেখে নিলেন। ইঞ্জিনরুম-টোপাজ্ সঙ্গে ঢুকেছে এবং সব খুলে দেখাল—কোথাও সে পরিষ্কার করতে ত্রুটি রাখে নি।

তারপর বড় মালোম, বাটলার, ক্যাপ্টেন নীচে বন্দরের প্রতি রবিবারের মত আজও টর্চ মেরে মেরে দেখলেন কেবিনগুলো। পিছনে রয়েছে ইঞ্জিন-রুম সারেং—শঙ্কিত দৃষ্টি চোখে। কখন ক্যাপ্টেন কি বলে বসেন। কোথায় ত্রুটি দেখিয়ে বলে বসেন—লেজী বাগার। একদম স্বস্তিওয়ালা আছে।

মোবারক আর শেখর একটু দূরে সরে রেলিংয়ের উপর ভর করে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন মই বেয়ে গলুইয়ের ছাদে উঠছেন। ক্রুদের ফ্রেস-ওয়াটার ট্যাংকে আলো ফেলে দেখলেন ভিতরে ময়লা জমল কি জমল না। তারপর নীচে নামার সময় শেখরকে একা পেয়ে ক্যাপ্টেন কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন —এনি গার্ল ইন্ দি পোর্ট স্যাখোর ?

শেখর সেই সময় মুচকি হেসে মোবারকের দিকে সামান্য তাকিয়েছে। বলেছে—নো স্যার।

—ব্যাড্ ব্যাড্। নো গার্ল ইন্ দি পোর্ট মিন্স ইউ আর নট এ সেইলর।

শেখর এবারও মুচকি হাসল।

মোবারক হাসছে না। সে উঁকি দিয়ে দূরে এইচ. পি. বুচারের মদের দোকানের বারান্দায় লিলি এসেছে কি-না দেখছে। লিলি এলে বারান্দায় দাড়িয়ে নিশ্চয়ই হাত নাড়বে। অথবা পালকের টুপি উড়িয়ে ইসারা করে বলবে—এস।

দুপুরবেলায় পোষাক পরে উপরে উঠে এল মোবারক। বন্দরের কলাহল-মুখরিত জাহাজগুলো একেবারে নিশ্চুপ। রবিবার। তার ওপর ক্রিস-মাস-ডে। সুতরাং একটি জনপ্রাণী কোন জাহাজডকে কাজ করছে না। শুধু একটা মাত্র জাহাজ বন্দর থেকে ধীরে ধীরে সমুদ্রে নামছে। অনেকক্ষণ টানাটানি করেছে দুটো টাগ-বোট। টাগ-বোটের মাঝিরা জাহাজটাকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়ে ঘাটে এসে রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিল। সুতরাং গোটা বন্দরটা নিস্তব্ধ।

অথচ বন্দর সীমানায় লোহার রডের বেড়া অতিক্রম করে সমুদ্রের ঠোঁট-ছোঁওয়া বালির চটানে শহরের পাহাড়-সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে লোক নেমে আসছে। ওরা জমছে সব কার্নিভালে। ক্যার্নিভালের খালি দোকানগুলো ভরে উঠেছে। মেয়ে দোকানীরা তাদের পারিপাট্য এবং ঝকঝকে পোষাকের ভিতর কেবল হেসে গড়িয়ে পড়ছে—আজ থেকে ক্রিস-মাস-ডে আরম্ভ।

আকাশে তখন বেশ সোনালী রোদ। নির্মেঘ আকাশ। দিগন্তে শুধু একটি কুয়াশার ছায়া ঝুলছে! এগমণ্ট-হিলের বরফ সোনালী রোদে তখন নাইছে। জেটির কিনারে কেউ আজ মাছ ধরছে না। ক্রেনের নীচে তাই কোন কোলাহল উঠছে না। শুধু দু-একজন নাবিক এখনও জাহাজ থেকে নেমে যায় নি বলে পোর্ট-হোল দিয়ে দু-একটি আওয়াজ গড়িয়ে পড়ছে বন্দরে।

মোবারক ডেকে এসে আর-একবার উঁকি দিল। শেখরটা আজ ওর সঙ্গে বের হল না। নীচে কি একটা ইংরেজী পত্রিকায় সে ডুবে রয়েছে। হয়তো যখন বিকেল নামবে বন্দরে তখনই সে তার ইজিচেয়ারটা নিয়ে আসবে ডেকে এবং সেখানে বসেই হাজার মানুষের ভিড় দেখবে। এবং যেদিন শেখর পথে নামবে সেদিন সে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল—রাস্তায় মেয়েদের ডেকে বলবে—হ্যালো মাই ডার্লিং ;—মোবারক বিরক্ত হয়, শাসন করে এবং সেজন্যই বুঝি শেখর অন্তত আর কিছুদিনের জন্য জাহাজ থেকে নামে না। শেখর আজও কার্নিভালে যাবার জন্য জাহাজ থেকে নামল না।

কোয়ার্টার-মাস্টার যেখানে বসে জাল বুনছে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখল এইচ. জি. বুচারের মদের দোকানের বারান্দায় লিলি ওর জাহাজের দিকে চোখ রেখে মোবারকের জন্য অপেক্ষা করছে। মোবারককে দেখে সত্যি লিলি ওর পালকের টুপি বাতাসে উড়িয়ে দিল। হাত নেড়ে নেড়ে ওকে ডাকছে।

মোবারক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। হাতের লেদার-ব্যাগটা ওর অলক্ষ্যে অত্যন্ত বেশী ঝুলছে। ব্যাগের প্রথম ভাঁজে কালকের কেনা দু-তিনটি আপেল গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিতরে। মোবারক মাউথ-অর্গান বাজিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে। সারা পথে ওর ছায়া যেন নেচে নেচে চলেছে। লোহার বেড়া যেখানে, বন্দর সীমানা যেখানে শেষ, সেখানে ক্যার্নিভালের কতক ছেলে-ছোকরা রডের ফাঁকে মুখ রেখে ভারতীয় নাবিকটিকে পরম কৌতূহলে দেখছে। কেউ কেউ বলছে—হ্যালো ইণ্ডিয়ান য়্যু নো ম্যাজিক ?

মোবারক মাথা দুলিয়ে বলছে—নো।

মোবারক যত এইচ. জি. বুচারের মদের দোকানের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তত ছেলে-ছোকরা আর ছোট ছোট মেয়েগুলো শুধু বন্দরের লোহার বেড়াটা ব্যবধান রেখে ওর পেছন পেছন ছুটেছে। মোবারক সেজন্য বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয় নি। বরং মাঝে মাঝে বাতাসে তার হাত উচিয়ে দিয়ে বলেছে—কাম অন মাই বয়জ্।

মোবারকের স্বাভাবিক নিস্পৃহ দৃষ্টিকে এক সময়ে সেই পিছু-নেওয়া দলটি যেন সহ্য করতে পারল না। তারা আবার কার্নিভালে নেমে গেল। মোবারক [illegible] দূর

থেকে আবার ডাকল—এস—। তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের বাঁশি বাজিয়ে শোনাব।

বন্দর-গেট পার হলেই এইচ. জি. বুচারের মদের দোকান। দোকানের ভিতরে কাউণ্টারে সারি দিয়ে কজন মেয়ে-পুরুষ হাতে কাচের গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছে—মদ খাওয়ার জন্য। লিলি মোবারককে দেখে নীচে নেমে এল। সামনের একটি জাহাজের চিমনি এবং ব্রিজের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদে ওর মুখ উজ্জ্বল। মোবারক সামনে দু কদম পা বাড়াতেই ওর ছায়াটা সোনালী রোদের তেজটা ঢেকে দিল। লিলি মোবারকের হাত টেনে বললে—এখনি কার্নিভালে ঢুকবে, না পিক্কাকোরা পার্কটা ঘুরে ফিরে দেখে পরে যাবে?

মোবারক কোন উত্তর করল না।

এইচ. জি. বুচারের মদের দোকান অতিক্রম করলে একটি ছোট্ট স্টেশনারী দোকান। দোকানে টালির বারান্দা। কাঠের ঘর। লাল রং ঘরের। বারান্দার খুঁটিতে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে একজন ভদ্রমহিলা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মোবারককে দেখছে। মেয়েটির শ্যাম্পু-করা চুল উড়ছে ফুরফুরে হাওয়ায়। ছেলেটি তার মায়ের কাছে মুখ নিয়ে বলছে—হ্যাট জায়েণ্ট! ইজিণ্ট মাদার? প্লেজ মাউথ-অর্গান গুড্।

মোবারক স্পষ্ট শুনেছে সেই কথা। সে হেসেছে। তারপর দু কদম বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে বলল—নো মাই বয়—আই য়্যাম্ নট এ জায়েণ্ট। আই য়্যাম এ ম্যান—ইণ্ডিয়ান। ডোণ্ট ফিয়ার মি।—বলে দু হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে মুখো-মুখি বলল—য়্যাম আই জায়েণ্ট? আই য়্যাম অ্যান ইণ্ডিয়ান—গুড ম্যান। সি-ই সি-ম্যান। মিন্স্ সেইলর। সেইলর অফ অ্যান ইংলিশ শিপ। ইউ লাইক শিপ্?

সেই ছোট্ট সাত-আট বছরের ছেলেটি এতটুকু সঙ্কুচিত না হয়ে বলল—ইয়েস্ আই ডু।

লিলি হাসল। ভদ্রমহিলা হাসছেন। ভদ্রমহিলা লিলিকে ডেকে বললেন—জনী এই বিদেশীকে ফিজরয়ের পোস্টাফিসের কাছে প্রথম দেখেছে সেদিন। আমায় বললে —মা এস, এস না। গেলাম ওর কথা মত। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এঁকেই দেখেছি সেদিন। বাঁশি বাজিয়ে মেথডিস্ট চার্চের দিকে হেঁটে চলেছেন। আমি বুঝেছিলাম তিনি এই ছোট্ট সহরে আগন্তুক। জনী, তার বাবা যখন কাজ থেকে ফিরে এল তখন দু হাত বড় করে ভয়ে বিস্ময়ে বললে—এ জায়াণ্ট। আমি হেসে বলেছি—না উনি একজন বিদেশী এবং নিশ্চয়ই উনি নাবিক হবেন।

মোবারক তাদের কথা মোটেই লক্ষ্য করছে না। বলছে—তুমি যাবে আমার

জাহাজে ? কাল এস না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে আমার জাহাজ। হলুদ রঙের চিমনি, উপরে কালো বর্ডার-দেওয়া দাগ! ওই জাহাজটা এই ভাল মানুষটির। তুমি জাহাজে গেলে দেখতে পাবে আমি দৈত্য নই। আমি মানুষ—আমি ভারতীয়।

তারপর একজোড়া উচ্ছল-জীবন কপোত-কপোতীর মত হাতে হাত ধরে পাহাড়-সিঁড়িতে উঠে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। ন্যনী আর ন্যনীর মা চেয়ে থেকেছে যতক্ষণ না ওদের দুটো রং-বেরঙের দেহ পাহাড় ছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর ন্যনীর হাত ধরে ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট ঘরের জীবনধারার রঙিন কাল্পনিক চিন্তা করতে করতে কার্নিভালের ভিড়ের ভিতর মিশে গেল ওর মা। বাতাসের দিকে চেয়ে দেখছে ওর মা সিগারেটের ধোঁয়াটা বড্ড বেশী পাক খাচ্ছে।

বুকে অশান্ত জ্বালা লিলির। অষ্টাদশী যৌবনের জ্বালা। মোবারকের নিস্পৃহ ভাব এবং উদার মনোবৃত্তির নীরব কীট দংশন ওকে অশান্ত করে তুলেছে। ওর চোখ জ্বলছে—দেহের প্রতি রোমকূপে আবর্তিত হচ্ছে রক্তের ঘোর-পাক। ত্রিশটি রাতের কোরী-পাইনের ব্যর্থতার অন্ধকার ওর বুকে আশাহত বধূর মত বোবা কান্নার ঢেউ তুলছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই লাল ক্যালেণ্ডারের মুখোমুখি। একটি স্তিমিত আলো জ্বলছে ঘরে। পাশের খাটে লিজেন কালো কম্বলের তলায় ঘুমচ্ছে। সমস্ত প্রেসবিটে-রিয়ান স্কুল হোস্টেলটা ঘুমে শিলীভূত। সে প্রতি রাতের মত আজও বিলাসভ্রমণ থাকে ফিরে একটি দাগ কেটে দিল। লাল ক্যালেণ্ডারে সাদা রঙের তুলি তুলে খুব ধীরে ধীরে টুয়েন্টি এইটথ্ তারিখটা মুছে দিয়ে ভাবল—মোবারক নিশ্চয়ই এখন জাহাজে ফিরেছে।

ঘরে আলো—বাইরে অন্ধকার। সবুজ টেনিস লন ধূম-ধূসরিত যেন। কুয়াশা ঝরছে আকাশ থেকে। টেনিস লনের সীমান্তে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ। চার্চের আলো কুয়াশার স্তর ভেঙ্গে লিলির ঘরে পৌঁছতে পারছে না। পাশের জানালা খোলা। কনকনে ছুঁচের মত ঠাণ্ডা হাওয়া দরজার পর্দা উড়িয়ে ঘরে ঢুকছে। লাল স্কার্ট উড়ছে লিলির। তবু স্থিরনিবদ্ধ-দৃষ্টি তারিখটার প্রতি। গাড়ীর চাকার মত বিগত তারিখগুলো পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙ্গে সমুদ্রের দিকে কেবল ছুটছে যেন দ্রুত। ওর হাত কাঁপছে।

ভেলভেটের পর্দাটা কাঁপছে দরজায়। ক্যালেণ্ডারের দু-তিনটে পাতা উড়ছে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে যেন। পাশের খাটে লিজেন পাশ ফিরে শুল। লিলির দেহ কাঁপছে তখন উদগ্র কামনার আর্তিতে।

রেস্টরুমের সান-ডায়েল ক্লকের ছায়াশূন্য কাঁটা বুকের ভিতর ঠুকে ঠুকে কেমন টিক টিক করে গভীর দাগ কেটে চলেছে কেবল। ওর অবিন্যস্ত স্যাম্পু-করা চুলগুলি ঠাণ্ডা বাতাসের তাড়নায় নারকেল পাতার মত মুখের উপর ঝরে পড়ছে। সে ক্লান্ত। ওর চোখে জল কি জ্বালা ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

পাশের চেয়ারটা টেনে বসল লিলি। ক্লান্ত হাতদুটো বিছিয়ে দিল টেবিলে। তারপর হাতদুটোর ভাঁজে মুখ বেখে টেবিলের উপর পড়ে থাকল। তখনও কন্‌কনে সমুদ্রহাওয়া ঘরের পর্দা উড়িয়ে লিজেনের কম্বলের ভিতর ঢুকছে ছুঁচের ফলার মত। লিলি নড়ছে না। লিজেন পাশ ফিরে আবার শুল। বাতাসের তীব্র তাড়নায় সে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জাগছে।

লিলি চেয়ার থেকে উঠে এল এক সময়ে। অশান্ত বুকের জ্বালা কিছুতেই নিবছে না। তাই সে পায়চারী করছে মেঝের উপর। মাঝে মাঝে জানালার উপর ঝুঁকে পাহাড়-ছাদ থেকে দেখার চেষ্টা করছে বন্দর। বন্দরের বিদেশী জাহাজ। মোবারকের শিপ। মোবারক বুঝি কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠছে জাহাজে। ওর অস্পষ্ট ছায়া লিলির জানালায় স্পষ্ট। প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের পাহাড়-ছাদে অন্তত লিলির চোখদুটো সেই কথাই বলে।

বন্দর অতিক্রম করে লিলির দৃষ্টি আর চলছে না। আদিগন্ত সমুদ্রে নীল অন্ধকার। সমুদ্রের বুকে জাহাজটা নোঙর করা। জাহাজের আলো সমুদ্রের নীল অন্ধকারে আকাশ তারার মত নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। জাহাজটা বুঝি দুলছে শীতের ঠাণ্ডায়। দুলছে কি কাঁপছে লিলির চোখ ঠাহর করতে পারল না। তারপর ওর দৃষ্টি সমুদ্র থেকে বন্দরে—ক্রমশ পাহাড়-সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ছাদে, ছাদ থেকে ঘরে, শেষ পর্যন্ত ভেলভেটের পর্দায় ঢাকা শেলফের বুকে। ভায়োলিনটা সেখানে রয়েছে। লিলির সব জ্বালা থমকে দাঁড়াল যেন সেখানে। তাই নীরবে ভায়োলিনটা বের করে আবার এসে জানালার উপর ভর করে দাঁড়াল। নীরব রাত আর এক-আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে সে বার বার বাজাল—মোবারক আমার, সে আমার—সে আমার।—লিলি ভায়োলিনের উপর পড়ে আবার কাঁদলে যেন—উই আর ইন দি সেম্ বোট।

ভায়োলিনের উপর লিলির করুণ কান্না শুনে লিজেন জেগে বিস্মিত হয়ে বললে—কি করছিস্ তুই ব্লিউ? দরজা-জানলা খোলা রেখে এভাবে দাঁড়িয়ে বন্দরের কি দেখছিস! ইস্ বিছানা-পত্তর বাতাসে কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দেখ তো? আর এত রাতে কেউ বেহালা বাজায়, না, বাজাতে আছে!

লিজেন খাট থেকে নেমে এল। অবিন্যস্ত চুলগুলি দুহাতে চেপে পর্দা সরিয়ে দরজা

বন্ধ করে দিল। তারপর জানালার পাশে লিলির হাত টেনে বলল—কি হয়েছে তোর। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

লিলি উত্তর করল না। কিছু যেন সে ভাবছে।

লিজেন পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে—মোবারকের জাহাজ আজ বুঝি ছেড়ে দিয়েছে?

—না—লিলি খাটের দিকে আসতে আসতে উত্তর করল।

লিজেন দু-চার বার নাকটা জোরে জোরে টেনে বলল—তুই মদ খেয়েছিস ব্লিউ?

—খেয়েছি।

—তুই না সিস্টার?

—মানি না।

—ব্লিউ!

—মানি না, মানি না—আমি কিছু মানি না।

—এমন করছিস কেন?

লিলি কি ভেবে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল আবার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুনল বাইরের ওকগাছগুলোর পাতা থেকে শিশির ঝরছে। শিশিরের শব্দ স্কাইলাইটের কাচে রিন্ রিন্ শব্দে বাজছে। লিজেনের দিকে চেয়ে ও বলল—খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

রাত ক্রমশ গড়িয়ে চলেছে। চার্চের ঘড়িতে শব্দ উঠছে—টিক্ টিক্। অন্যান্য ঘরগুলোর কাচের ছায়ায় কোন আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধ পাহাড়-ছাদে শুধু লিলি আর লিজেন জেগে রয়েছে।

লিজেন বলল—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড।

লিলি ফারের কোট খুলে ছুঁড়ে দিল আলনায়। ব্লাউজটা টান মেরে খুলে ফেলল। স্কার্টের বোতাম খুলে স্লিপিং গাউনটা তুলে নিল বিছানার একপ্রান্ত থেকে। তারপর নিজের নগ্ন সৌন্দর্যের সে কেমন অভিভূত! দেহের প্রতি অঙ্গে কেমন তীব্র শিহরণ অনুভব করল। হৃদয় তার অবাক। চোখদুটো প্রতিদিন তার বিস্ময় মেনেছে—একজন সাধারণ মানুষ রাতের পর রাত কোরী-পাইনের অন্ধকারকে কেমন ব্যর্থ করে তুলতে পারে। গম-ক্ষেতগুলো পার হয়ে যে পাহাড়-ছাদ রয়েছে, যে রেস্টরুম রয়েছে—যে সান্-ডায়েল ক্লক আলোর ছায়ায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সেই নির্জন এক টুকরো পৃথিবীতেও মোবারক কেমন ভারি ভালমানুষ! সে বলেছে কেবল তার জাহাজের কথা, জাহাজী জীবনের দুঃখবেদনা—একঘেয়ে জীবনপ্রবাহ, ফোঁকশাল, শেখর, শেখরের দেশ, তার শামীনগড়। এইসব বলে মোবারক মাঝে মাঝে চুপ করে যেত।

তখন সান্‌-ডায়েল ক্লকের একটুকরো পৃথিবীতে শিশির ঝরত। কোরীপাইনের কচি কিশলয়ে শির্‌ শির্‌ শব্দ উঠত। ওক গাছগুলো নীরবে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের নরনারীর জীবন ও যৌবনের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সামান্য মুহূর্তের বুঝি কামনা করত। কিন্তু মোবারক তখন উঠেছে। বাঁশি ব্যাগ থেকে বের করেছে—হঠাৎ লিলিকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলেছে—আমি গেলাম, তুমি ঘরে যাও। কাল সন্ধ্যায় আবার সি-ম্যানস্‌ মিশনে। ওক গাছগুলো তখন যেন সোজা হয়ে দাঁড়াত। স্তব্ধ রাতের বুকে একটি মুহূর্তের জন্য কান পাতা নিষ্ফল হল। মোবারক নেমেছে তখন পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙ্গে, বাঁশিতে স্বর দিয়ে দিয়ে বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছে। লিলি ফিরছে তার প্রেসবিটেরিয়ান স্কুল হোস্টেলে। শরীর কাঁপছে তার। তবু চীনার গাছের নীচে নিঃশব্দে আরও একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে—মোবারকের বাঁশি শুনছে।

আরও কত রাত রয়েছে—কত রাত থাকল। সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের রক্ত লগ্নে তারা দুজন গেছে সেণ্ট মেরাইনে। সমুদ্রতীরে যেখানে পাহাড়ের শিকড় সিঁড়ির মত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে সেখানে তারা দুজনে দাঁড়াত দু হাত ধরে, হাতদুটো দুলত—স্কার্ট আর ওভার কোট উড়ত দুরন্ত বাতাসে। শ্যাম্প্‌-করা চুল ফুর ফুর করত লিলির। দুজনে দুটো সিগারেট টেনে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। তখন সমুদ্রের নীল তরঙ্গ দুরন্ত শিশুর মত চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে, পা ছুঁই ছুঁই করত তাদের।

হঠাৎ মোবারক বলেছে—আমি চলি জাহাজে, তুমি ঘরে যাও, কাল সন্ধ্যায় আবার মিশনে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

লিলির আপশোস—তার পরিপুষ্ট গমের মত সৌন্দর্যকে মোবাবক তীব্রভাবে অবহেলা এবং বিদ্রূপ করে চলেছে। রাতের পর রাত সেণ্ট মেরাইন হতে লায়ন রকের বুক পর্যন্ত ওদের বিচরণ। কিন্তু মোবারক সব কথা বলে, সব পথ বিচরণ করে, সব রূপ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ার সময় যখন কোন ওক গাছের ছায়ায় বসত তখনই দেখেছে ভারতীয় নাবিকটির চোখে জ্বালা। সে-সময় লিলি ওর বলিষ্ঠ হাত টেনে এনে নিজের নরম হাতের উপর চাপ দিয়েছে। মোবারক চুপ করে থাকত তখন। কথা বলত না। কণ্ঠে ও তখন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইত লিলি, মোবারককে বলতে শোনা গেছে তখন—চলি। কাল আবার—

লিলি উত্তেজনায় তখন কেবল কেঁপেছে। কোন কথা বলতে পারে নি।

মোবারকের মনে হয়েছে জৈনবের কথা—নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না।…

লিলি বললে লিজেনকে তখন—মানুষটা অদ্ভুত লিজেন।—তারপর কম্বলের ভিতর ঢোকার আগে আর-একবার অনুরোধ করলে—লিজেন আমি যে মদ খেয়েছি তুই কিন্তু কাউকে বলিস না। বলবি না তো? কি রে বল না তুই আবার বলে দিবি কি না। মোবারক পর্যন্ত আমায় কেমন ঘৃণা করল আজ। বললে—তুমি না সিস্টার! সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

—আরও কিছু বলেছে?

—না এ সম্বন্ধে তেমন আর কিছু বলে নি।

লিজেন এক সময় মাথার উপরকার আলোটা নিভিয়ে দিল। বললে—এ সহর ভারতীয় নাবিকটিকে ভুলতে পারবে না। কাল দেখলাম ফিজরয়-এর বাজারে মাউথ-অর্গান কেনার ধূম লেগেছে। অনেকে আবার মোবারকের মত অনুকরণ করে পা ফেলে ফেলে চলে।

লিলি কম্বলের তলায় মুখ নিয়ে হাসল। বললে—শুধু ভুলতে পারবে না, নয় রে। ভোলা ওকে চলবে না। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল সে।

—বিশেষ করে লিলির জীবনে।

—না শুধু লিলির জীবনেই নয়, প্রতিটি নিউ-প্লাইমাউথ মানুষের জীবনে ও যে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল।

—সে কেন হবে?

—হবে না, হচ্ছে।

—এসব কি বলছিস তুই!

—আমি ঠিক বলছি।

—তুই ঠিক বলছিস?

ঠিক।

—সে কেমন করে হবে?

—হবে—যেমন করে হয়। তুই শুধু কাল সকলকে বলে দিবি খবরটা। আমি স্কুলে যাচ্ছি না। তুই-ই আমার হয়ে বলবি, মোবারক ম্যাজিক দেখাবে।

লিজেন লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। আলোটা পুনরায় জ্বেলে দিল এবং ছুটে এসে লিলিকে কম্বলসহ জড়িয়ে ধরে বললে—ঠিক বলছিস!

কম্বলের ভিতর চুপি চুপি বলল লিলি—ঠিক বলছি।

লিজেন আনন্দে নেচে নেচে গাইল সেই খাটের উপর—ইফ আই উড্ বি দাই

ড্যালিং—। কম্বলের ভিতর থেকে তখন লিলি জোরে জোরে হাসছে। সে বলছে আবার—মোবারক সাপের নাচ দেখাবে। সাপের ম্যাজিক।

—মোবারক বুঝি বললে।

—না রে না। সে বলবে কেন ? সে যে আমায় সত্যি আজ সান-ডায়াল ক্লকে সাপের নাচ দেখাল ?

—ধ্যাৎ! আমি তোর কথা ছাই বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে বল, সব খুলে বল। কি মজা হবে না একটা! ওফ! ভাবতে গেলে শরীর আমার এখনই যে শিউরে উঠছে রে। সাপটা তোর চোখের সামনে নাচল ? তোকে মোবারক বুঝি বললে সে ম্যাজিক জানে, সাপটা দেখতে কেমন রে।

—কালো।

—ছবিতে যেমন দেখতে।

—ঠিক সে রকম বলতে পারিস।

—তোর ভয় করল না ?

—ভয়! লিলি মুহূর্তের জন্য চুপ করল। নিজেকে প্রশ্ন করল, ভয় ? তা ভয় করছে—একটু করেছে। না, মিথ্যে কথা। ভয় একটু করে নি, ভয়ে সে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সে অন্ধকার রাতের বুকে ভূমিকম্পের মত থর্ থর্ করে কাঁপছিল। মোবারক তখন চেয়েছে, চোখে বিদ্রূপ—চোখে তার জ্বালা। থরো থরো মেঘের মত সেও অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। পাহাড়-ছাদে দুটো উন্মত্ত যৌবনকে রেস্টরুমের আলোয় সান-ডায়াল ক্লকের উপর নেচে ব্যঙ্গ করছে যেন তখন শঙ্খচূড়টা।

এমন ঘটত না—যদি লিলি বেখাপ্পা প্রশ্ন করে মোবারককে উত্তেজিত করে না তুলত। সংশয় আর সন্দেহকে কেন্দ্র করে লিলি নেশার তাড়নায় মোবারককে কাছে টানবার প্রচেষ্টা করেছিল, রাতে স্কুল হোস্টেলে ফিরে আসার আগে বিক্ষিপ্ত ঘটনাটা ঘটল। সামনের উপত্যকার ঠিক শেষ প্রান্তের পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্টরুম রয়েছে—যেখান সান-ডায়েল ক্লক রয়েছে। যেখানটা নির্জন—যেখানে কোরী-পাইনের শাখায় এখনও কিশলয় বেরুচ্ছে। আর কাছে সমুদ্রের বাতিঘরের বাতিওয়ালার হাসিটা হাঁচিটা সেখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়—সেই পাহাড়ে। সেখানে সে প্রশ্ন করেছে—মোবারক তোমার দেশ বিরাট। দেশ বিচিত্র—সে দেশের মানুষ বিচিত্র! তাদের জীবনধারা বিভিন্ন। পোষাক-আচার, রীতি-নীতি সব বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলবশত কোন প্রশ্ন করলে রাগ করবে না তো ?

মোবারক ক্লকের ডায়ালটার উপর আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলেছে—না। রাগ আমি করব না, বিভিন্ন বন্দরে কত বিদেশীনীর কাছে কত বিচিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমার দেশ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাতে। কিন্তু আমি রাগ করি নি।

—তোমার দেশে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছেন। ফকির দরবেশ আওলিয়া আছেন —তাই না মোবারবক ?

—আছেন।

—গল্পের বইয়ে সেই সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প পড়েছি।

—সেগুলো তো গল্পই।

ক্লকের ডায়ালে দুজনেই বসে আছে। দু-দশ কদম দূরে রেস্টরুমের একটি সঙ্কীর্ণ আলো ওদের দুজনের ফাঁক দিয়ে আরও নীচে নেমে গেছে। শীত একটু বেশী পড়েছে বলে কেউ এ পাহাড়-ছাদে বেড়াতে আসে নি। একমাত্র লিলি আর মোবারক বসে বসে গল্প করছে। অন্য পাহাড় প্রান্তে লাইট হাউসের বাতিওয়ালা মাঝে মাঝে ঠাণ্ডায় কাসছেন বুঝি। সেই শব্দ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে পাহাড়-ছাদে।

মোবারক চুপ করে ছিল।

লিলি সানডায়েল ক্লকে বসেছে। পা দুটো তুলে। লাল স্কার্টটা হাটুর নীচে নামানোর জন্য টানছে। লাল নখ পালিশের নরম রবারের মত আঙ্গুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সেই স্কার্টের গা। হাত ইচ্ছে করেই যেন আর একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। চোখ দুটো টান টান করে চাইছে মোবারকের দিকে। আরক্তিম ঠোঁট দুটোয় আবার অহেতুক কথা যেন—ফকির, দরবেশ; সাধুসন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে ইচ্ছা করলে হাওয়ায় হিমালয়ে মিলিয়ে যেতে পারেন—ঠিক ? যোগী বলে, এক ধরণের সম্প্রদায় আছেন তাঁরা বরফে বসে নাকি ধ্যান ধারণা করেন—ঠিক ?

সেগুলো গল্পে জেনেছে সুতরাং সেগুলো গল্পের মতই থাক। তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে ? এবার আমি উঠবো। রাত অনেক হয়েছে।

—তুমি রাগ করলে মোবারক ?

—লিলি তুমি অসুস্থ।

—অসুস্থ ! মদ খেয়েছি বলে ?

—লিলি, তুমি না সিস্টার ? সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

—আমি সত্যি অসুস্থ নই মোবারক।—দৃঢ় গলায় বললে লিলি।—তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—বলো, উত্তর দিচ্ছি।

—সেই সাধুসন্ন্যাসীরা হাতের মাটী ফুঁ দিয়ে সোনা করে দেন শুনেছি। তাঁরা ভোজবাজি জানেন।

—মিথ্যে কথা।

—তুমি মিথ্যে বলছ মোবারক।

—লিলি!

—কি করবো বলো। তোমার দেশের নাবিকেরাই এ-কথা বলে গেছে। সমস্ত দেশটা নাকি যাদুকরের দেশ।

মোবারক কড়া চোখে এবার লিলির দিকে চোখ তুলে চাইল। তারপর ভিতরের গুমরে মরা ব্যাধিটা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলে, চীনার গাছের পাতাগুলো যে মুখো হয়ে দুলছে সেদিকে নজর ফিরিয়ে দিয়ে বললে—এবার ওঠা যাক।

—তুমি তো আমার উত্তর দিলে না।

—মিথ্যে যে বলে তার কোন জবাবেরই দাম নেই লিলি।

—তুমি রাগ করলে মোবারক?

রাগ আমি করি নি।

—তোমার দেশের মেয়েরা শাড়ী পরে। তুমি বিয়ে করেছ মোবারক? জ্যান্ত সাপ দেখেছ? সাপ!

—দেখেছি। তুমি দেখবে?—মোবারক নিজের ব্যাগটা আরো কাছে টেনে নিল।

লিলি হেসেই যেন কুল পেল না। এবং সে হাসতে হাসতে সত্যি এক সময়ে ডায়ালের উপর গড়িয়ে পড়ল। বললে—মোবারক তোমার কথায় হাসব কি কাঁদবো বুঝতে পারছি না।

ব্যাগটা কোলের কাছে টেনে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললে মোবারক—তুমি হেসো না। দেখতে চাও—দেখিয়ে দিচ্ছি। শীত এখনও যায় নি বলে সাপটা বের করি নি।

—দোহাই মোবারক অমন কথা তুমি আর বলো না। তুমি দেখছি তোমার সাধু সন্ন্যাসীদের মত আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ভেল্কি খেলবে। এ যে শীতের দেশ এখানে সাপ পাবে কোথায়?

—অত কথায় কাজ কি। দেখতে চাও তো দেখিয়ে দিচ্ছি।

—ওসব বুজরুকীতে আমার বিশ্বাস নেই। তুমি দয়া করে থাম মোবারক।

মোবারক তার ব্যক্তিত্বে খোঁচা খেয়ে যেন মারমুখো হয়ে উঠল, লিলি তখনও ওকে বিদ্রূপ করে হাসছে। সে হাসির আওয়াজ চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে আঘাত

খেতে খেতে ছুটেছে বন্দরের দিকে। বন্দর হতে সমুদ্রে। যে জাহাজটাকে আলো দিচ্ছে এখন লাইট হাউসটা সেখানে গিয়ে বুঝি ঝুপ করে থেমে গেল। লিলি উঠে বসল—তারপর মোবারক—

মোবারক নিঃশব্দ—নিশ্চুপ। ওর ভিতরটা আঘাত খেয়ে শঙ্খচূড়টার মতই ফুলে ফুলে উঠছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বেইমানীতে ওর জর্জরিত মন কেঁদে উঠল যেন বলতে বলতে—মোবারক মিথ্যা বলে না। এই তোমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে শঙ্খচূড়টা।

কালো মোটা দড়ির মত সত্যই কিছু একটা পড়ে রয়েছে ডায়েলের উপর। একটু নড়ে নড়ে ডায়ালের বুক বেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে সময় মোবারক অবাক হয়ে দেখল লিলি ওরই কাছে ছুটে এসে ওর বুকে আছাড় খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। কোন আওয়াজ নেই, কেবল শ্বাস ফেলছে জোরে। ভয় পেয়ে সমুদ্রের ছোট ছোট তরঙ্গের মত হিল্ হিল্ করে কাঁপছে। মুখ তুলছে না বুক থেকে। বিবর্ণ, ভয়ে চোখ বুজে আছে।

মোবারক মাউথ অর্গানটা দিয়ে ছোট ছোট দুটো শব্দ করতেই ডায়ালটার উপর, শঙ্খচূড়টা ব্যাগের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। সে তখন তার কোলের উপর পড়ে-থাকা মেয়ের চুলের ভিতর সন্তর্পণে আঙ্গুল চালিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে অপরাধীর মত বললে—সাপটা চলে গেছে লিলি। তুমি এমন ভয় পাবে জানলে শঙ্খচূড়টাকে তোমায় আমি দেখাতাম না। আমার সত্যি খুব ত্রুটি হয়েছে।

লিলি তখনও পড়ে রয়েছে এবং পড়ে থাকল।

আবার বললে মোবারক—ওঠ রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরী করে ফিরলে ভাতগুলো আর খাওয়া যাবে না।

লিলি তখন উঠল। কিন্তু বিবর্ণ ভয়টা তখনও কাটে নি, তবু অস্পষ্ট করে বললে—তুমি ম্যাজিসিয়ান।

মোবারক কথা আর বাড়াল না। বিদেশের এই নির্জন পাহাড়-ছাদে লিলির দেহের দিকে চেয়ে তার করুণা হল। সে বললে—চল, তোমাকে হোস্টেলে রেখে আসি।

লিলি নীরবে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে-যাওয়া পথ ধরে মোবারককে অনুসরণ করলে শুধু। আর মোবারকের দৃঢ় পদক্ষেপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করে নিল—এ শীতের দেশ। এখানে কোন জীবজন্তুই এককালে ছিল না। ঔপনিবেশিকরা নিজেদের প্রয়োজনে ছাগল-ভেড়া গরু-ঘোড়া আমদানী করেছিল মাত্র। তারপর মোবারক তো নাবিক অথচ সে তার নিজের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং সংক্ষিপ্ত কথার আর চোখের জ্বালায়

আমার চিন্তাধারাকে নিশ্চয়ই বশীভূত করে নিয়েছিল—যার ফলে ভায়ালের উপর ভীষণ এবং ভয়ঙ্কর দীর্ঘ সাপকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। লিলি তাই গোটা পথ ধরে কোন কথা বলে নি এবং সমস্ত দেহে একটি পরাজয়ের গ্লানি মেখে স্কুল হোস্টেলে ঢুকেছে। কেবল মোবারক যখন তাকে রেখে নীচে বন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছিল তখনই কোন রকমে বাতাসে পাণ্ডুর হাতটা ঢেউ খেলিয়ে বলেছিল গুড-নাইট মোবাবক !··

মোবারক পাহাড়-ছাদ থেকে নামতে নামতে উত্তব করেছে—গুড-নাইট।

লিজেন আবার প্রশ্ন করল—কি রে তোর ভয় করল না ?

—হ্যাঁ ভয় করেছিল। ভয়ে আমি মোবারককে জড়িয়ে ধবেছিলাম।

লিজেন সে কথা শুনে মুচকে হাসল—তারপর ?

—তারপর চোখ বুজে রয়েছি।

—তারপর ?

—তারপর কিচ্ছু না। যখন সে বলল—ওঠ, সাপটা চলে গেছে তখন চেয়ে দেখি সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি একেবারে অদৃশ্য—বলে লিলি লিজেনকে আবার কেমন ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে ধরল। বললে—দৃশ্যটা মনে হলে আমাব এখনও ভয় করে লিজেন। তুই আমার সঙ্গে শুয়ে থাক।

—তাহলে—আর কিছুই হল না।

—আঃ ফাজিল! এমন করলে তোর সঙ্গে কথা বলব না বলছি।

—থাক হয়েছে, আব বলব না। কিন্তু মোবারক কালকে ম্যাজিক দেখাবে তো!

—দেখাবে না বলছিস ? নিশ্চয়ই দেখাবে। আমি অনুরোধ করলে সে নিশ্চয়ই দেখাবে। সি-ম্যানস্ মিশনের প্রোগ্রাম কালকে সম্পূর্ণই বদলে দেব। তোর কেবল কাজ থাকল তুই স্কুলের সকলকে বলে দিবি সি-ম্যানস্ মিশনের চত্বরে মোবারক ম্যাজিক দেখাবে—সাপের নাচ।

—কিন্তু কাল কুইন আসছেন ডুনেডিন থেকে।

—কুইন! আসুক।

—লোক তেমন তবে জমবে কি ?

—জমবে না! কি যে বলিস তুই। এই ছোট শহরে কোন রকমে যদি এই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে গোটা শহর ভেঙে লোক নামতে শুরু করবে বন্দরে। এ দেশের লোক সাপের নাচ কোন কালে দেখেছে, না আর দেখবে ?—কুইন এলিজাবেথকে কি দেখবে রে—তিনি তো মেয়ে। আমার মত মেয়েমানুষ।

বাকী রাতের জন্য বুঝি তবে আর ঘুম আসছে না। কম্বলের নীচে লিজেনকে জড়িয়ে মুখোমুখী দুজন শুয়ে রয়েছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা পাক খাচ্ছে ভিতরে। সেই চিন্তা পাক খাচ্ছে সমুদ্রমানুষটিকে কেন্দ্র করে। চিন্তায় তার রয়েছে মোবারকের জাহাজ, মোবারকের কেবিন, তার বাংক। দৃঢ় বলিষ্ঠ দৃষ্টি—উন্নত নাক—হাল্‌কা ঠোঁট—আয়ত চোখ মোবারকের। লিলি ভাবতে ভাবতে নিজের বালিশটা আরো জোরে চেপে ধরল। কানদুটো থেকে তখন ওর গরম হল্‌কা বের হচ্ছে। লিজেন নাক ডাকাচ্ছে কম্বলের তলায়। তেমনি করে কুয়াশা এখনও আকাশ থেকে ঝরছে মনে হল। স্কাই-লাইটের শব্দ তেমন করেই এখনও রিন রিন সঙ্গীতের শব্দে শিহরণ জাগাচ্ছে ওর দেহমনে। তাই সে তার নিজের পাণ্ডুর হাল্‌কা বরফ হাতদুটো দু পায়ের ফাঁকে আরো জোরে চেপে ধরল। মোবারক নিশ্চয়ই তার বাংকে এখন ঘুমুচ্ছে। মানুষটার গভীর ঘুম হয়তো।

লিলির যথার্থই আর ঘুম আসছে না। একবার ইচ্ছে হল লিজেনকে ডেকে তোলে। মেয়েটার বড্ড ঘুম। এত ঘুম ভাল নয়।

রাত ভোর হতে তেমন আর নিশ্চয়ই দেরি নেই। লিজেনকে সকাল সকাল ডেকে তুলতে হবে। বাতিওয়ালার ঘরে ম্যাক্সিসের মোরগগুলো ডাকছে। তৃতীয় প্রহরের ডাক হবে হয়তো। ঘরে একটা ঘড়ি থাকলে ভাল হত। ইচ্ছে করলেই ঘড়ি একটা সে কিনে পরতে পারে। কিন্তু কেমন খেয়াল জীবনের, মনটা ঘড়ির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে যেন পারল না। লিজেনটা তো মস্ত কৃপণ। তাই সেও ঘড়ি পরল না। অথচ আজ কেবল বার বার ঘড়ি দেখার প্রয়োজন হচ্ছে। ঘড়ি থাকলে দেখত রাত আর কতটা আছে। ভোর হতে আর কতক্ষণ, সাজগোজ করে সি-ম্যানস্‌ মিশনে পৌঁছতে কত দেরি, বন্দরের জাহাজটা আর ক' কদমের পথ—জানার বড্ড আকাঙ্ক্ষা জাগছে।

লিলি কম্বল ছেড়ে উঠল। ঘুম এল না বলে সে এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। লিজেন যেন টের না পায় সেজন্য পা টিপে টিপে বারান্দার রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। উঁকি দিয়ে চার্চের ঘড়িতে ক'টা বাজল দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু একটি কুয়াশার মস্‌লিন এখনও পাহাড়-ছাদটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে বলে সেই শীতের ঠাণ্ডায় লিলি সবুজ টেনিস-লনের শিশির ভেঙে চার্চটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এমন সময় চার্চে শব্দ উঠছে ঢং ঢং ঢং। তিনটা বাজল।

রাত যে এত দীর্ঘ লিলি জীবনে এই প্রথম বুঝল। রাত আর কাটতে চায় না।

রাত আর যেতে চায় না। শীতের এই দীর্ঘ রাতে বারান্দায় তাই সে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখছে বন্দর। নীচে কুয়াশার এতটুকু চিহ্ন নেই, একটা দাগ পর্যন্ত আঁকে নি। মোবারকের জাহাজের ব্রীজে কোন মানুষের ছায়া পায়চারি করছে ইতস্তত যেন। লিলি চোখদুটো ভাল করে রগড়ে আবার এক ঝলক অপলক দৃষ্টিতে ভাল করে দেখে বুঝল সেটা মানুষের ছায়া নয়। মাস্টের আলো বাতাসে দুলে একটি প্রকম্পিত শূন্য-ছায়ার সৃষ্টি করেছে ব্রীজে। লিলি নিজের অপরিণত দৃষ্টির জন্য ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। মনটা সম্পূর্ণ ওর মোবারক-ময় হয়ে উঠেছে। যখন শীতের একঝাঁক পাখী উপত্যকার সীমানা ভেঙ্গে অন্য পাহাড়ে উড়ে গেল, যখন একজন শ্রমিক মেয়ে-বৌকে ঠেলে এক কৌটো টিফিন বগল দাবা করে বন্দরের দিকে ছুটছে হাড়িয়া-হাফিজের জন্য, সি-ম্যানস্ মিশনেব দরজা যখন বন্ধ, ফিজরয়ে আর চার্চ স্ট্রীটের দোকানীরা আপেলগুলো যখন রুমালে মুছে সেলফে ত্রিভুজের মত অথবা স্কাই-স্ক্রেপারের মত সাজাচ্ছে—একটি নূতন বিয়ে-হওয়া বৌ যখন তার পাহাড়সিঁড়ির ঘর থেকে সমুদ্রের বুকে ঠেলে-ওঠা সূর্যটাকে সবুজ মন নিয়ে দেখছে, তখন লিলি আর লিজেনের ঘরে স্কুল হোস্টেলের মেয়েরা রীতিমত একটা হাট বসিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নের রকমফের রয়েছে ওদের। চোখ বড় করে, কখনও ছোট করে, কখনও বা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ম্যাজিকের রহস্য জানার জন্য ভিড় করেছে মেয়েগুলো। খবর শুনে কেউ নেচে নেচে ঘরে ঢুকল, কেউ শিষ দিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল। লিলি টুথপেস্ট মুখে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কথা বলছে—দাঁড়া, দাঁড়া বলছি। লিজেন বিছানাগুলোর উপর উটপাখীর ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলছে—আমাদেব গিলে ফেলবি নাকি তোরা।

লিলি স্নান করেছে একসময় গরম জলে, লিজেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে হোস্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে—সে আজ স্কুলে থাকতে পারবে না। তার আজ কাজ রয়েছে বন্দরে। বন্দরের সি-ম্যানস্ মিশনে। তারপর আলমারি খুলল, লিজেনকে ডেকে বলল—কোন্ স্কার্টটা পরলে মানাবে ভাল। কোন ব্লাউজটা আজকের আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক মত খাপ খাবে?—সেই শুনে লিজেন বারান্দায় এল। সবুজ টেনিস্-লনের শিশির-ভেজা ঘাসের উপর শীতের এক টুকরো পাতলা রোদের রং দেখল। পাহাড়-সিঁড়ি দেখল—সমুদ্রের রং দেখল। শেষে ঘরে ঢুকে বললে—সবুজ স্কার্ট পর, সাদা সাটিনের ব্লাউজটা গায়ে দে। মেজাজের সঙ্গে আবহাওয়া খাপ খাবে।

তাই হল। তাই পরল লিলি। সবুজ স্কার্ট পরল, সাদা সাটিনের জামা গায় দিল। ধূসর রঙের একটি কোট রাখল হাতের কনুইয়ে যদি কুয়াশা নামে, যদি কনকনে ঠাণ্ডা

ওঠে সমুদ্র থেকে। চুলের উপর আরেকবার ব্রাশ চালাল। দুটো অত্যন্ত হাল্কা ফুল-মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল বড় আয়নাটার সামনে। তারপর প্রসাধনে বসল। ঠিক জানলাটার রং দেখে ঠোঁটের উপর তুলি দিয়ে রক্ত-আঁক দিল সরু করে। ভ্রূতে পেন্সিল টেনে আবো দীর্ঘ করে দিল ঈগল পাখীর ডানার মত রেখাদুটোকে। শেষে ভ্রূদুটো প্রশস্ত করে শরীফ মেজাজে হাসল। হাসি দেখে লিজেন বললে—তুই রাজরাণী।

লিলি লিজনের গালে চুমো খেয়ে বললে—তবে তুই আমার বাঁদি।—বলে আলনার কাছে গেল। আলনায় তিন-চারটা ভ্যানিটি ব্যাগ। এবারও জানালার রং দেখে একটা তুলে নিল পছন্দ মত কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বারান্দায় বের হয়ে জুতো টেনে জুতো পরলে। পরে দুরন্ত দুটো হাত উডন্ত বুলবুলের মত বাতাসে নাচিয়ে নাচিয়ে স্কুল-হোস্টলের সকল মেয়েদের অভিবাদন করে পাহাড-ছাদ থেকে নেমে গেল।

পাহাড়ের পথ শঙ্খমুখী। ঘুরে ঘুরে পাহাড থেকে উপত্যকায় নেমেছে। গমক্ষেতে ঢুকেছে, আপেল-বাগানের অলিগলি ধরে কবরখানার পাঁচিলের বাঁ দিকের পথ অতিক্রম করে এসে থেমেছে ট্রাম্-স্টপেজে। শেষ শের্ডের তলায় দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ট্রাম এলে উঠবে, সি-ম্যানস্ মিশনে নামবে।

মিশন পৌঁছতে বেশ বেলা হল লিলির। মিশনের সামনের গোটা চত্বরটায় রোদ। হাল্কা রোদ—পাতলা রোদ। সে রোদের তেজ নেই, তোয়াজ আছে। সে মিষ্টি মিষ্টি রোদ গায়ে লাগলে মন নরম হয়, শীত যেন উষ্ণ হয়। সে রোদ গায়ে মেখে লিলি মিশনের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

যেই ঘরে ঢোকা সেই দশটা প্রশ্ন। এমন অবহেলায়, এমন অসময়ে! তারপর খুলে বলতে মরিশ্ বললে—বলছ কি লিলি! লিটন কনুই কোমরে রেখে বললে—এ যে রীতিমত আজগুবি কথা হল। বিশ্বেস হচ্ছে না—কেমন করে হবে?

লিলি ততো বলছে, আমি দেখেছি সে মন্ত্র পড়ে কোত্থেকে একটা কালো সাপ এনে ডায়ালের উপর ফেলল। তারপর আবার দেখেছি ডায়ালের বুক বেয়ে সেই সাপটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু রং চড়িয়েছে কথাটা বলার সময়। লিটন আবার মিশনের সেক্রেটারীকে বলার সময় রং-চড়ানো পর্দায় আর একটি স্থুল প্রলেপ দিয়েছে, ক্রমশ সে চড়ানো রং বন্দর থেকে ক্রেনগুলোর পায়ে পায়ে কাঠের ঘরের অলিন্দ ধরে দোকানে দোকানে বিস্তৃতভাবে বিস্তারিত হল। ঘরে যে-ই ফিরেছে বন্দর থেকে সে-ই কুইন এলিজাবেথের সমারোহপূর্ণ জাহাজটার সঙ্গে খবর দিয়েছে বন্দরে সন্ধ্যায় ম্যাজিক

হবে—সাপের নাচ। মোবারক নাচাবে সাপ, মন্ত্র পড়ে সাপটাকে ভারতবর্ষ থেকে এনে সকলের চোখের সামনে নাচাবে। মোবারক—ইণ্ডিয়ান—এ ম্যান অফ্ মিষ্টিক ল্যাণ্ড।

তারপর লিলি গেছে মোবারকের জাহাজে। একটি ডেনিস, তুটো আমেরিকান জাহাজ পার হলে সে জাহাজ। মাল খালাস হতে কিছু বাকী বলে কাঠের সিঁড়িটা প্রায় খাড়া হয়ে গ্যাংওয়েতে উঠে গেছে, তাই সে তু দিকের তুটো দড়ি ধরে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠল। সামনে গোল টেবিলে কোয়ার্টার মাস্টার, মাছ ধরার জাল বুনছে। চিত্ত তার একাগ্র। তবু লিলির দেহগন্ধে চোখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে কেমন ঢোক গিলল। তু-একটি জরুরী প্রশ্ন করা দরকার, এ যে জাহাজ, এখানে যে যার খুশী মত উঠতে নামতে যে পারে না সে কথা না জানিয়ে ওর জমকালো পোষাকের প্রতি শুধু সেলাম ঠুকল একটি। এবং লিলি যখন বললে, মোবারক কোন্ কেবিনে থাকে, সে তার কাছেই এসেছে তখন সুখানী সাহেবের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আরো গদ গদ হয়ে উঠল। জাল বোনা ফেলে কুর্নিশের কায়দায় বললে—আসুন। আমি আপনার বান্দা।

লিলি ডেকে ছোট ছোট পা ফেলে চলেছে আর দৃষ্টি রেখেছে চারিদিকে। সে দৃষ্টি কৌতূহলের। উইন্‌চ ড্রাইভাররা কি করে মেশিন চালাচ্ছে, ক্রেন ড্রাইভার কেমন করে নীচে ঝুয়ে দেখছে সব, তু নম্বর মালোম ফল্কায় ফল্কায় কি সব কথা বলে যাচ্ছে, ওর দৃষ্টিতে সব ধরা পড়ল। তারপর সে এল পিছিলে, যেখানে গ্যালী, বাথরুম, মেসরুম। তু-চারজন জাহাজী মেসরুমে মাতুর বিছিয়ে তখন মুখে ভাত ঠেলছে। তু-একজন একটু যায়গা করে নামাজ পড়ে নিচ্ছে। লিলি মেসরুমে উঁকি দিয়ে তাও দেখে নিল। সুখানী তখন বলছে—ওদিকে নয়, এদিকে আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। সেখানেই মোবারকের কেবিন। আপনি আসুন।

লিলি নীচে নামল, নেমে আওয়াজ পেল ফোঁকসালে ফোঁকসালে জাহাজীর। মোবারকের স্তিমিত আওয়াজও ওর কানে এসে ধাক্কা খেল। মোবারক অন্যান্য জাহাজীর তুলনায় যেন খুব আস্তে কথা বলছে।

শেষে এ-কেবিন সে-কেবিন দেখে লিলি ঢুকল মোবারকের কেবিনে। ঢুকে প্রথমে শেখরের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে মোবারকের দিকে এগিয়ে গেল।

মোবারক তখন বললে—গুড্ মর্নিং। লিলি তোমার শরীর ভাল তো?

—নিশ্চয়ই। তাই তোমার জাহাজে এসেছি।

—সে তো আমার সৌভাগ্য।

—আমি তোমার সৌভাগ্যকে টেনে নিয়ে আসতে রাজী নই। আমার সৌভাগ্যকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

—তবে বোস।

—বিপরীত হলে বুঝি বসতে দিতে না ?

শেখর হেসে বলল—আমি কিন্তু দিতাম।

শেখর বালিশের নীচে থেকে সিগারেট বার করে লিলিকে দিয়ে বলল—নাও ধরাও। তাড়াতাড়ি কর। এখনি আবার ঘণ্টা পড়বে ইঞ্জিন-রুমে। এলে তো খুব সময় মত। এখনি তো আমাদের কাজে বের হয়ে যেতে হবে।

—হবে তো হবে।—মোবারকের দিকে চেয়ে বললে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কথা আছে, কথা বলবে। আগে বসো। তোমাকে বসতেই বা দিই কোথায় ? বাংকের উপর পা ঝুলিয়ে রেলিং'য়ে বসতে তোমার হয়তো খুব অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা হলেও তো আর না বসে পারছি না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব ?—বলে শেখরের বাংকে বাল্‌কেডের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়ল এবং নিশ্চিন্তে সিগারেট টেনে দম নিল যেন দুবার।

এমন সময় ইঞ্জিন-রুমে ঘণ্টার শব্দ উঠেছে। উইণ্ডস হোলের ফাঁক থেকে চীৎকার করছে ইঞ্জিন-রুম বড-ট্যাণ্ডেল—যোয়ান লোক টাণ্টু কামে যাও।

শেখর বললে—তাহলে উঠি।

মোবারক বললে—সারেংকে বলবি শেখর, ইঞ্জিন-রুমে নামতে আমার একটু দেরী হবে। লিলির কথা বলবি।

শেখর চলে যাওয়ার সময় লিলি বললে—তুমি বুঝি জাহাজ ছেড়ে কোথাও যাও না।

—কেন ? যাই তো। মাঝে মাঝেই মিশনে যাই। তোমাকে দেখি, মোবারককে দেখি। তারপর জাহাজে আবার ফিরে আসি।

মোবারক বললে—ও যাবে কি বাইরে ? ওর যে এক গাদা বই রয়েছে জাহাজে। সেগুলো ফেলে ওর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না।—তারপর শেখর চলে গেলে মোবারক ওর লকার খুলে বইয়ের স্তূপ লিলিকে দেখিয়ে বলল—গোটা সফর ধরে এরই ভিতর শেখর ডুবে রয়েছে। লেখা-পড়া জানা ছেলে কেন যে জাহাজে মরতে এল বুঝি না ছাই।

লিলি বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে টের পেল আঙুলের দু ফাঁকের সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সে পকেট থেকে তাই আর-একটা সিগারেট বের করে মোবারককে একটা দিল। তারপর পোড়া সিগারেট থেকে আগুন ধরিয়ে হুস্ হুস্

করে জোরে টানল ক'বার। শেখরের বাংকে বসে বসে উন্মনা হয়ে ভীষণ কিছু যেন চিন্তা করছে লিলি।

মোবারক তার বাংকে বসে প্রশ্ন করলে—তারপর, কি বলছিলে ?

—বলব, বলার জন্যই তোমাকে এমন অসময়ে বিরক্ত করছি। তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি মোবারক ?

—রাগ করার কথাটা এত বেশী বলা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত রাগ না-করে পারবো না দেখছি ?

—তবে যে আমার বলা হবে না।

মোবারক হেসে ফেলল বলতে বলতে—বলো বলো, রাগ আমি করব না।

লিলি আধ-পোড়া সিগারেটটা হিলের তলায় ঘষে পোর্ট-হোল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আরক্তিম ঠোঁটে একটি হাল্কা হাসির পাপড়ি মেলে বললে—মিশনের প্রোগ্রাম আজ বদল করে দিলাম। তোমার আজ মাউথঅর্গান বাজানো হবে না।

—সে তো ভাল কথা। দু জনে বেশ তবে সানক্লকের ডায়ালের উপর বসে গল্প করা যাবে। বাতিওয়ালার হাঁচিটা কাশিটা শুনে ফিস্ ফিস্ করে বলবে—আস্তে মোবারক।

লিলি সব কথা বাদ দিয়ে ফোঁকসালের উষ্ণতা মেখে বললে—তুমি ইণ্ডিয়ান মোবারক !

—সে কথা ভাবতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

—না, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আজ অন্ততঃ আমার সম্মান রক্ষার্থে একটি বিষয়ে আপত্তি করবে না।

মোবারক কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললে—আমার সাধ্যের আওতায় থাকলে আপত্তি থাকার তো কিছু কথা নয়।

—তেমন কথাই বলব। তুমি ইণ্ডিয়ান তাই তোমার পক্ষে সম্ভব। কাল তুমি আমায় ডায়ালের উপর সাপ, সাপের-নাচ দেখিয়েছিলে !

মোবারক এবারও হেসে উঠল।—সে কথা তুমি এখনও ভুলতে পার নি। সে তেমন কিছু না। কথাটা ভুলে যাও। অমন ভয় পাবে জানলে নিশ্চয়ই সাপটা দেখাতাম না। বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যা বলছি না। তা ছাড়া তোমার তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

লিলিকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখালো। অথচ অম্লান ওর চোখের দৃষ্টি। তেমনই হাল্কা হাসি ওর ঠোঁটে। চোখের নীল তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। সে আরো

ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মোবারকের বলিষ্ঠ দুটো হাত ওর নিজের নরম দুটো হাতে অঞ্জলির মত গ্রহণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল—বলো তুমি আমার কথা রাখবে?

মোবারক লিলিকে কাছে টেনে আরো কাছে বসল। ফোঁকসালগুলো নির্জন, কোথাও থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। শুধু ছাদের উপর পিছনের গ্যালীতে ভাণ্ডারীর কাঠের ছেনি নাড়ার শব্দ ঠক্ ঠক্ করে নীচে নেমে আসছে। সে গত রাতের সান ডায়াল ক্লকের ত্রুটির জন্য আজ সর্বতোভাবে লিলির অনুরোধকে অনুগ্রহের মত যেন ঠেলতে পারছে না। তাই মুখোমুখী হয়ে বলল—বলো, বিন্দুমাত্র সম্ভব হলে তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব।

—তুমি ইণ্ডিয়ান, তোমার পক্ষে সব সম্ভব। মিশন চত্বরে আজ শহর ভেঙ্গে লোক জমবে। খবরটা আমিই সকলকে দিয়েছি। তোমাকে না জানিয়ে মিস্টার লিউডকে বলে প্রোগ্রাম করেছি ভিন্ন। ভিন্ন মঞ্চ হবে চত্বরে। সেখানে তোমার প্রোগ্রাম। তুমি সাপের-নাচ দেখাবে সেই মঞ্চে।

গত রাতে লিলি ডায়ালের উপর বিদ্রূপ করে যতটা উচ্চকিত হয়ে হেসেছিল, মোবারক হাসছে তার দ্বিগুণ চড়ায় সে হেসে হেসে বাংকের উপর গড়িয়ে পড়ল এই বলে—ব্লিউ তার জন্য তোমার এত ম্রিয়মাণ হয়ে অনুরোধ, এমন ভাঙ্গা গলায় দু হাত হাতে তুলে এত বিনীত হয়ে বলা?—তারপর বাংকের উপর সে সোজা হয়ে বলল—কথা আমি তোমার নিশ্চয়ই রাখব। শীত না থাকলে তুমি না বললেও আমি পথে-ঘাটে এমনি নাচাতাম, যেমন করে অন্য সব বন্দরে নাচিয়েছি।

লিলি এবার সহজ হয়ে বসল বাংকে। ওর উচ্চকিত হাসির জন্য ওর কতক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী একেবারেই বুঝতে পারে নি সে। শুধু এই বুঝল মোবারক তাকে কথা দিয়েছে, সে সাপ নাচাবে। ভারতবর্ষ থেকে সাপটাকে সে মন্ত্র পড়ে ধরে নিয়ে আসবে বোধ হয়!

লিলি এবার বাংক থেকে উঠে দাঁড়াল, বললে—তবে চলি। সন্ধ্যা সাতটায় প্রোগ্রাম। আমি মোটর নিয়ে আসব, তুমি ছটায় ঠিক হয়ে থাকবে।

লিলি মোবারকের বুকের কাছে এসে মুখ তুলে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল। সে নুয়ে হাত ধরলে লিলির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের দুটো মুখ। কিন্তু সাহস হল না মেয়েটির। ওর নরম দেহ মাধবীলতার মত কেঁপে কেঁপে উঠলেও সে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর আরক্তিম ঠোঁটদুটোয় কিছুর উষ্ণ চাপ পেতে পারল না, শুধু মুখোমুখী হয়ে বলল ফিস ফিস করে—মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ান।

মোবারক আর্তনাদ করে যেন উঠল—ব্লিউ আমি যাদুকর নই।

লিলি ততক্ষণে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে।

মোবারক দরজার বাইরে এসেছে যেন আর্তনাদ করতে করতেই—লিলি আমি যাদুকর নই। সাপটা আমার ভেল্কি নয়, সে জীবন্ত, আমার পোষমানা জীব।

লিলি ডেক ধরে 'দ'-এর মত পা ফেলে প্রায় ছুটে যাওয়ার মত যেন হাঁটছে। ডান হাত বাতাসে নেড়ে বলছে—যাদুকর যারা তারা তো এমনি করেই বলে মোবাবক।

—বিশ্বাস না হয় নীচে আমার ফোঁকসালে এস দেখিয়ে দিচ্ছি।—কথাটা বলে কিছুক্ষণ পিছিলের স্টেন্‌সান ধবে হাঁফিয়ে নিল বুঝি মোবারক।

লিলি সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নামছে মোবারকের প্রতি দৃপ্ত দৃষ্টি তুলে। ওর যাদুকর মোবারক। আশ্চর্য এক দেশের মাটির গন্ধ ওর দেহে, চোখদুটোয় কেমন এক মাযায় ভরা ডাক। জেটিতে নেমে হাত নেড়ে বললে—না না মোবারক, তোমার সে ম্যাজিক, তোমার সে সাপের-নাচ একা ফোঁকসালে দাঁড়িয়ে দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারব না। তুমি সে অনুরোধ আমায় আর করো না।

মোবারক স্টেন্‌সান জড়িয়ে এতটা উত্তেজিত হয়েছে যে সে আর কোন কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। সে শুধু চেয়ে রয়েছে লিলির দিকে। তার দেহছায়া সোনালী রোদে পাহাড়-সিঁড়ির ধাপে-ধাপে উঠে যাচ্ছে। পাকে-পাকে যে পথ গেছে সেই পথে কেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে তাই দেখছে দাঁড়িয়ে।

ভাণ্ডারী, গ্যালী থেকে উঁকি দিয়ে বলেছে যখন—এই মিঞা মাইয়াডা কি কইল রে ব?

মোবারক কোনরকমে যেন বললে ভাণ্ডারীকে—কিছু না।

লিলি যতটা হাল্কা হয়ে পাখীর ডানার মত উড়ে উড়ে পাহাড-সিঁডিতে হারিয়ে গেল—মোবারক ততো প্রস্তরের মত ভারী হয়ে সেই পিছিলের উপর থেকে পাঁচ নম্বর, চার নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে না-চলি না-চলির মত ইঞ্জিন-রুমে গিয়ে নামল। ওর বুকে আবার জ্বালা ধরেছে। লিলি এতক্ষণ বাংকে বসে কথা বলে নি তো—বিদ্রূপ করেছে। মোবারকের পোষমানা জীবটিকে সে ভেল্কি বলেই জেনেছে।

নিজের মনেই বিড় বিড করতে করতে এক সময় মোবারক টানেলের ভিতরও ঢুকে গেল। সে শেখরকে খুঁজছে। শেখরের কাছে তার নালিস। শেখরকে বলবে মেয়েটা এতক্ষণ কথা বলে গেল না তো—বিদ্রূপ করে গেল। সেই কথার পুনরাবৃত্তি তাই ওর ঠোঁটদুটোয় কেবল পাক খাচ্ছে।

শেখরকে মোবারক টানেলের তলায় খুঁজে পেল না। টানেলের ভিতরও না। প্রপেলার-শ্যাফ্‌ট পর্যন্ত সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। টানেলের বাইরে

এসে এভাপরেটারের তামার পাইপগুলোতে যারা স্ক্রেপ করছে তাদের ভিতরও সে নেই। তারপর জেনারেল পাম্পের নীচে এবং পাশে, স্টোকহলে—কিন্তু কোথাও নেই। সারেংকে জিজ্ঞেস করতে সারেং বললে—বাঙ্গালী বাবু চার নম্বর সাবের সঙ্গে এক নম্বর উইনচে কাজ করছে। সেই শুনে মোবারক ছুটল হ্যারিকেন ডেকে। শেখরকে বলতেই হবে—ব্লিউ এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে শঙ্খচূড়টাকে ভেল্কি বলে বিদ্রূপ করে গেল। মেয়েটাকে সমুচিত জবাব দিতে হবে।

মোবারক স্টোকহোলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। চিমনীটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল জোরে। পাদুটো ক্রমশ যেন প্রস্তরীভূত হয়ে উঠছে। উত্তেজনা এবং মনের আঁকুপাকু শেখরকে না বলা পর্যন্ত খালাস হবে না। সে তাই বোট-ডেক থেকে নেমে তিন নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে এক নম্বর উইনচের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শেখর কাজ করছে। চার নম্বর সাব উইনচের ভিতরে ঢুকে স্ট্রেপার খুলছে। দুটো পা শুধু বাইরে বের হয়ে আছে ওর। হাতুড়ি, বাটালি, স্প্যানার যখন যা কিছুর দরকার সরবরাহ করছে শেখর। ঢিলে স্ট্রেপারগুলো ফাইল করেও দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

মোবারক শেখরের পাশে দাঁড়িয়ে বললে—ব্লিউ আমার সাপটাকে অস্বীকার করল।

—করেছে তো বেশ করেছে তাতে তোর কি এল গেল?

—তুই এটা কেমন কথা বলছিস শেখর!

—আমি ঠিক বলছি।

—না, তুই ঠিক বলিস নি আমি জ্যান্ত সাপটা কালকে দেখালাম আর সে বলছে কি না যাদু করে আমি সাপ দেখিয়েছি। আমার পোষমানা জীবটিকে অস্বীকার করে বলবে ম্যাজিক, আর মুখ বুজে তা হজম করব?

—একান্তই যদি অস্বীকার করে তো সাপটাকে ওর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পরখ করতে বলবি সত্য কি মিথ্যা।

মোবারক এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল, এতক্ষণে যেন পথ পেল, একগলা উত্তেজনা থেকে খালাস পেল। কিন্তু কথা সে ঠিক রাখবে। মঞ্চের উপর সাপের নাচ সে যথার্থই দেখাবে। সেই দেখে যদি ওরা ওকে যাদুকর ভাবে তো বয়ে গেল। সে শুধু লিলিকে প্রমাণ দেবে—সাপটা তার ঘরের মানুষ। জৈনব খাতুনের অতি আদর করে দেওয়া। বিগত প্রেমের এক জীবন্ত ফসিল।

পাহাড়-সিঁড়ির ধাপে ধাপে লিলি কিন্তু তখনও 'দ'-এর মত পা ফেলে কেমন উচ্ছল হয়ে হাঁটছে। বুকে তার অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত কানাকানির কথা। মোবারককে নিউ-প্লাইমাউথের ঘরে ঘরে ভালবাসায় বেঁধে রেখেছে। তারা

একান্ত বিস্ময়ে কাচের শার্সি তুলে অপেক্ষা করেছে প্রান্ত বিকেলে,—মোবারক বাঁশি বাজিয়ে যাবে। যাবে পাহাড়-ছাদে, যাবে ব্রিউর স্কুল-হোস্টেলে। ব্রিউকে দেখে কত মেয়ে তাই হিংসে করছে। লিজেনও বুঝি!

লিলি চড়াই ভেঙ্গে উৎরাই ভেঙ্গে হাঁটছে। অসহিষ্ণু মন নীল আকাশ দেখছে। চার্চ স্ট্রীট, নিউ স্ট্রীট, গীর্জার পুকুর অতিক্রম করে সে নেমেছে ফিজরয়ে। একটা কাফেতে ঢুকে ঢক ঢক করে গলায় ঢালল কিছু—বখশিস দিল বয়টাকে, খুশী মত পয়সা খরচ করল। যাকে পেল, পরিচিত অ-পরিচিত তাকেই ম্যাজিকের খবর দিয়ে ফুরফুরে চুল উড়িয়ে বাঁদিকের পথ ধরে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল। সব আজ তার ভাল লাগছে। সুন্দর মনে হচ্ছে এই পৃথিবীকে। পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হল তারা আজ অত্যন্ত খুশী। সোনালী রোদকে মনে হল খিল খিল করে হাসছে। সমুদ্রের নীল তরঙ্গে দেখল নিভাঁজ ঢেউ তারপর একটা দমকা হাওয়ায় নিজের রুমালটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললে—মোবারক মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ান।

লিলি আবার বালিয়াড়ি থেকে উঠে গেল। পাহার-সিঁড়ি বেয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘরে গেলে হয়। মাকে খবর দিলে হত! কিন্তু লিলির কেমন সংকোচ হল। মা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছেন। সে তাই পিকাকোরা পার্কের পথ ধরে রাণী এলিজাবেথকে যে চত্বরে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হবে সেখানে গিয়ে ঢুকল। বিরাট মঞ্চ করা হয়েছে, হাজার অতিথির জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। তারপর দামী কার্পেট বিছানো, চত্বরে ঢোকার প্রথম দরজায় দুজন অশ্বারোহী পুরুষ। ঝকঝকে তলোয়ার হাতে। রুপালি রঙের কটিবন্ধ। তারা লায়ন রকের দিকে মুখ করে আছে।

সে হাঁটল শহরের বিভিন্ন পথ ধরে। পথগুলো সুসজ্জিত। কাঠের ঘরগুলো বিভিন্ন ফুলের সমারোহে নৃত্যচঞ্চল মেয়ের মত মুখরিত হয়ে উঠেছে। পথের দু'পাশে কাঠের রেলিং দেওয়া। গ্রাম থেকে লোকের ভিড় সেই রেলিং লাগোয়া হয়ে অপেক্ষা করছে কখন রাণী এই পথ ধরে যাবেন। এলিজাবেথের গাড়ীতে তারা ফুল ছিটিয়ে দেবে। ঘরের বারান্দাগুলোতেও মানুষের ভিড়। তারা বন্দরের দিকে দৃষ্টি রেখে উন্মুখ হয়ে আছে।

লিলি নিজের মনেই হাসল—মানুষগুলো পাগল।

শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার একটুকরো কুয়াশার মায়া মেখে নিউ-প্লাইমাউথের মাটিকে চুমো খেল, যখন কুইন এলিজাবেথের শোভাযাত্রা শত অশ্বারোহীর ঠক্ ঠক্ আওয়াজের ভিতর মিলিয়ে গেল, যখন সেই ভগ্ন জনতা শহর ভেঙ্গে বন্দরে ছুটেছে

সেই সময় লিলি লিটনের মোটর হাঁকিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে হাঁকল—স্বখানী, মোবারককে খবর দাও ভাই ব্লিউ এসেছে মোটর নিয়ে।

উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রার মত লিলির শরীর উইংসের আলোতে ঝক্ ঝক্ করছে। ওর সবুজ স্কার্টে আলোর বন্যা নেমেছে যেন। মোবারক ডেক অতিক্রম করে আসছে তখন। শেখর ওকে অনুসরণ করছে। দুজন বাঙালী একজন মাউরী মেয়েকে অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, পাঁচ নম্বর সাবের কেবিনের ফাঁক থেকে—মেয়েটা উঠে আসছে।

মোবারকের গায়ে দামী নেভী ব্লু সার্জ। হাতে লেদার ব্যাগ। মাথায় নীল ফেল্ট ক্যাপ। আমেরিকান কায়দায় টাইটা ঝুলিয়েছে নাভি পর্যন্ত। ডান হাতটা পকেটে। সে সিঁড়ি দিয়ে নামল কেমন ক্লান্ত পা ফেলে। নীচে নামলে লিটন দরজা খুলে দিল। লিলি হ্যাণ্ডশেক করল দু জনের সঙ্গে কিন্তু কোন কথা হল না। মোবারক নীরব। মোটরটা যখন বন্দর-পথ ভেঙ্গে এইচ. পি বুচারের মদের দোকান পিছনে ফেলে মিশনের চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করল সেই সময় লিলি বললে—দেখেছ শেখর, দেখেছ মোবারক, শহর ভেঙ্গে জনতা এসে কেমন ভিড় করেছে!

মোবারক উত্তর করল না—শুধু শেখর 'হুঁ' বলে কিছু প্রতিধ্বনি করল মাত্র।

মোবারকের দীর্ঘ দেহটা চত্বরে নামতেই জনতা দু ভাগ হয়ে পথ করে দিল। লিলির হাত ধরে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টি তার বিরাট জনতাকে পার হয়ে সেই পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্ট-রুম রয়েছে। যেখানে সান ডায়েল ক্লক রয়েছে। সে দেখল ভিড় থেমে আছে বাতিঘরের পাহাড়-ছাদের নীচের ধাপ পর্যন্ত। পাহাড়-সিঁড়ির হাঁটু ভাঙ্গা 'দ'-এর স্তরে স্তরে গ্যালারি। সব মানুষ উন্মুখ প্রত্যাশায় বসে আছে। নীরব, নিস্তব্ধ, এতটুকু আওয়াজ নেই কোথাও। শুধু এক পশলা হিমের গুড়ো রিণ রিণ শব্দে ক্রমশ নীচে নেমে আসছে।

মোবারক গিয়ে মঞ্চে উঠল। লেদার ব্যাগটা উইংসের ছায়ায় রেখেছে। তারপর উইংসের তলায় হাত বাড়িয়ে সাপটাকে টেনে টেনে বের করল। বিস্ময়ে 'থ' হয়ে থাকা হাজারো মানুষের চোখের উপর বারো ফিটের শঙ্খচূড়টাকে দুলিয়ে দুলিয়ে নাচাল। দু ঠোঁটে তার মাউথঅর্গান বাজছে এবং সে দুলে দুলে ভয়ঙ্কর সাপের মুখোমুখী হল। জনতার উন্মুখ দৃষ্টি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যকে সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢাকল।

তারপর মোবারক নেমেছে মঞ্চ থেকে। সাপটা গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হাজারো মানুষের কণ্ঠ উচ্চকিত। তারা অদ্ভুতভাবে টুপি উড়িয়ে মোবারককে অভিবাদন জানাল। অনেকে ভিড় ঠেলে এসে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহটাকে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। লিলি এল, সেক্রেটারী এল কিন্তু কারো সঙ্গে সে কথা বলল না। শুধু একসময় উইংসের আড়াল থেকে ব্যাগটা নিয়ে লিলির হাত চেপে ধরল। বললে—চল পাহাড়-ছাদের সান ডায়াল ক্লকে

সেই সান ডায়াল ক্লক আর রেস্ট-রুম, সেই পাহাড়-ছাদ। বিগত অনেকগুলো রাতের কবোষ্ণ নিশ্বাস যেখানে লিলির সিক্ত ঠোঁটগুলোয় কামনার আর্তি লতিয়ে লতিয়ে আবার হিমশীতল হয়েছে।

লিলি এল, মোবারক এল। নিঃশব্দ উভয়ে ডান হাতের কঠিন চাপে মাঝে মাঝে লিলির নরম হাতটা আর্তনাদ করছে। তবু সে কিছু বলছে না—কাঁদছে না। হাতের কঠিন চাপে শুধু মাঝে মাঝে মোবারকের উপব ঢলে পডতে চাইছে।

পাহাড়-ছাদে সান ডায়াল ক্লকের উপর ত্রিভুজের মত কাঠটাকে ব্যবধান বেখে দু জন বসল। তারপর ব্যাগ থেকে টেনে টেনে মোবারক শঙ্খচূডটা বেব করছে। শীত তীব্র বলে কিছুতেই ভিতরেব গরম ছেড়ে হিমশীতল ঠাণ্ডায় আসতে চাইছে না সে। তবু অনেক টেনে সাপটা লিলির সামনে বের করতেই অর্ধ-মৃতের মত চোখ বুজে দুটো হাত মোবারকের প্রতি তুলে লিলি শুকনো কণ্ঠে শুধু বললে—মোবারক!

—দেখই না—বলে সাপটাকে আরো কাছে টেনে নিল মোবারক।—ভাবতবর্ষ থেকে এটাকে মন্ত্র পড়ে নিয়ে আসি নি, দয়া করে আমাব ব্যাগের ভিতরই শঙ্খচূডটা থাকে। এটা আমার পোষমানা জীব।

ডায়ালের উপর ভয়ে লিলি উঠে বসেছে। লিলির শ্যাম্পু-করা ফুর ফুরে চুলগুলি উড়ছে।

মোবারক ক্লান্ত, লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত। মাথা নীচু করে তাই সে অনেকক্ষণ,বসে থাকল।

লিলি বললে ওর হাত টেনে। তোমার আজ জাহাজে ফিরতে হবে না, আজ চল ফিজরয়ে মায়ের কাছে।

মোবারক উত্তর করতে পারল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শুধু ডায়াল ছেড়ে উঠে দাঁডাল।

অন্য কোন আওয়াজ নেই। পাহাড়-ছাদ, কোরী-পাইনের বনভূমি অন্ধকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। একমাত্র উপত্যকার গ্যালারীর মত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বন্দর থেকে মোটরগুলো মাল নিয়ে শহর ছাড়িয়ে অন্য পাহাড় প্রান্তে ছুটছে। তারা দুজন পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল সেই সময়।

নীচে কবর-ভূমি। কবরের পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে পথ, পথ গিয়ে থেমেছে ট্রাম স্টপেজে।

লিলি এসে একবার কবর-ভূমির দরজায় থামল। পিছনে মোবারক। মোবারক কথা বলছে না। সে কেমন আনমনা হয়ে পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁটছে।

লিলি বললে—মোবারক তুমি আমার বাবার কথা শুনেছিলে।

মোবারক বললে—তিনি তো মারা গেছেন।

—তাঁর সমাধি আছে এই কবর-ভূমিতে। চল না দেখবে।

লিলি চাইছে মোবারক পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। ওর আনমনা মন লিলির চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হোক।

সদর দরজার পরে লাল কাঠের ঘর। দারোয়ান বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ বার বার একই সুর করে পড়ছে।

বারান্দার সামনে কালো সরীসৃপের মত অমসৃণ পথ। লিলি আর মোবারক সেই পথে আরো দুটো গ্যাসপোস্ট অতিক্রম করে গেল।

প্রতি কবরের বুকে নিভন্ত মোমের আলো। প্রিয়জনেরা সন্ধ্যায় আলো জেলে দিয়ে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জ্বলে আর জ্বলতে পারছে না।

লিলি আর মোবারক এসে থামল ক্ষুদ্র একটি আপেল গাছের ছায়ায়। জাফরানী রঙের আলো গ্যাসপোস্ট হতে ঝরে পড়েছে, নিভন্ত মোমের আলো নিবু নিবু হয়ে কবরের ক্রশের উপর জ্বলছে। লিলি বসল হাঁটু গেড়ে এবং মোবারক সেই মত অনুসরণ করে কবরের প্রতি আর-একটু ঝুঁকে বসল।

লিলি বললে তখন—মা সন্ধ্যায় রোজ এখানে আলো জেলে দিয়ে যান।

কিন্তু নিভন্ত আলো এবং বিবর্ণ জাফরানী রঙের আলোর ছায়ায় কবরের উপর কতকগুলো হরফ অত্যন্ত অস্পষ্ট। সে-জন্য মোবারক আরও একটু ঝুঁকে অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে দেখার চেষ্টা করল লেখা দুটো কিসের। আলোর পড়ো পড়ো শিখা নিঃশেষ হয়ে গেল বলে, নিভন্ত আলো একেবারে নিভে গেল বলে দেয়াশলাইর আলো জ্বালল মোবারক। জাফরানী আলোয় হঠাৎ নীল-নীল চোখে দেখল সে হরফের রেখাগুলো নীল হয়ে উঠেছে। নীল রেখায় মূর্ত হয়েছে—পাতার ফাঁকে চুইয়ে-পড়া জাফরানী রঙের নীচে দুটো কথা, ক্রসের উপর—প্রথমে ইংরেজীতে, হেনাফোর্ড এবং আরো কি; পরে বাংলা হরফে···

লিলি ডায়ালের উপর চোখ বুজে দু চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মোবারকের হাত থেকে ছাড়া সাপুটা তখন ডায়াল থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে ধূপছায়া এক পাহাড় অন্ধকারে লিলির পা জড়িয়ে কোমর অতিক্রম করে যেন বুকের ভিতরের

উষ্ণতা খুঁজছে। ব্লাউজের অন্তরালে মাথাটা ঢুকিয়ে বুকের চারিপার্শে প্যাচ কসবে বুঝি!

লিলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডায়ালের উপর ঢলে পড়ার সময় মোবারক ওকে দু হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিল। ব্লাউজের অন্তরাল থেকে সাপের মাথাটা খুঁজে টেনে টেনে বের করল। হাতের উপর প্যাচ খেলিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে— শঙ্খচূড়টা আমার হাতে। ভয় নেই, চোখ খুলে চেয়ে দেখ। ও অন্যায় করে না। প্রতিদিন দেখলে তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলতে।

লিলি মোবারকের বাঁ হাতের উপর সমস্ত শরীরের অবলম্বন রেখে কোন রকমে একবার অর্ধ-নিমীলিত হয়ে চাইল হাতে প্যাচ-খাওয়া সাপটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে চোখ বুজে ফেলল। শেষে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল—আর পারছি না মোবারক। তারপর বললে—আমি বিশ্বাস করি।

সাপটা চলে গেল মোবারকের নির্দেশে, ডায়ালের বুক বেয়ে বেয়ে ব্যাগের ভিতর ঢুকে চুপ করে বসে থাকল। একবারের জন্যও সে আজ ফোঁস করে বললে না—এসব কি হচ্ছে।

মোবারক বললে—শঙ্খচূড়টা চলে গেছে লিউ!

লিলি এবার সোজাসুজি তাকাল। দু হাতে হঠাৎ মোবারককে সাপটার মত পেঁচিয়ে ধরল। ডালিম পাতার মত সরু নাকটা আর রক্তিম ঠোঁটদুটো বুকের উপর ঘষে ঘষে বললে—মাই ডার্লিং, আই লাভ য়্যু।

তারপর লিলি থেকে থেকে বার বার বলছে এক কথা—বুকের উপর নাক-মুখ ঘসে বলছে শুধু, মো—বা—র—ক।—তার মনের প্রকাশ, সমস্ত কামনার উষ্ণতা, তীব্র নিবিড়তার ঘনিষ্ঠতা, একটি কথার ভিতরই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আকাশ-ঝরা তারার মত সে কথা ওর মনে রেখাঙ্কিত করে দিল লিউর কান্না-ভরা হৃদয়ের ছবি। মন তাই তার ঝর্ণার গলে-পড়া হীরকচূর্ণের মত গলে গলে পড়ল। সেইজন্যই বুঝি আবার ডাকল—লি-উ।

লিলি বুকের উপর পড়ে থেকেই উত্তর করলে—মো—বা—র—ক।

শঙ্খচূড় চলে গেছে। সুতরাং চল কোরী-পাইনের তলায় গিয়ে বসি।

লিলি নিথর। দুটো হাত সেই আগের মত জড়ানো, এবং কোন জবাব উঠল না ওর কণ্ঠে। সে নির্জন রাতের মত নীরব হয়ে গেছে। কামনাবহ্নি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে রক্তপ্রবাহ হতে।

মোবারক অনুভব করছে ওর শরীর ক'বার কেমন করে যেন রোমাঞ্চিত হল।

হরীতকী গাছের ছায়ার নীচের অন্ধকারটার মত এ অন্ধকারটাও হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানছে। শামীনগড়ের বাল্যপ্রেম এখানটায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

মোবারক ওর কাছ থেকে দু-কদম সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে ওর সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ জট পাকিয়ে আছে, ওর যেন এতটুকু ক্ষমতা নেই এ জট ছাড়িয়ে মুক্ত হবার।

পাশেই ক্লকের সিমেণ্ট-করা ডায়াল। কোন অদৃশ্য শক্তি ওদের দুজনকে সে দিকে যেন শুধু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর দুটো তাবা আকাশ থেকে খসে পড়ল সেই ডায়ালে। ডায়ালের বুকে ওরা এগিয়ে গেল। এবং ক-ফোঁটা শিশিরবিন্দু গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়াল পৃথিবীর কোলে। নির্গমপথে সবুজ সেই রং জন্মের ইসারা দিল।

তারপর— ?

তারপর আবার নীরব সব। মোবারক ক্লান্ত দেহটা নিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল।

সে সময় প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ শোনা গেল। কোরী-পাইনের অন্ধকার ভেঙ্গে সে-শব্দ মোবারকের কানে এসে ধাক্কা খেল। সে শব্দে মোবারক উৎকর্ণ হল। দু হাত উপরে তুলে পাগলের মত ডেকে উঠল তারপর— খোদা হাফেজ!

অনেকক্ষণ পর শেখর পা বাড়াল ডেক থেকে মেস-রুমের দিকে। এতক্ষণ এই ভোরের আলোয় শেখর পাহাড-সিঁডির দিকে চোখ রেখে প্রতীক্ষায় ছিল মোবারকের। গত রাতে সে জাহাজে ফেরে নি।

মেস-রুমে ঢুকে টিনের থালায় ওর খাবার নিয়ে নিল। মোবাবকের খাবারটা গত রাতের মতই সাজিয়ে লকারে রেখে দিয়ে এসেছে। যখনই আসুক, দু মুঠো অন্তত কিছু মুখে দিতে পারবে।

কিন্তু মেস-রুমে খেতে বসতেই ইঞ্জিন সারেং এসে দরজার উপর ভর করে ডাকল— শেখর, তোকে বাডিওয়ালা ডাকছে। বড় মালোম, বুড মিস্ত্রী ওঁরাও ব্রীজে আছেন

—আমায় ক্যাপ্টেন ডাকছেন ?

—হুঁ। ডাকছেন। মোবারক কাল জাহাজে আসে নি। আজ কাজে যায় নি, আমি তাই রিপোর্ট দিয়েছি।

—কাল আসে নি, আজ আসত। আঠারো মাস সফরে কাল রাতেই শুধু আসে নি। আর তার জন্যই আপনি রিপোর্ট দিয়ে দিলেন?

—আমি বাপু ওসব বুঝি নে! যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। আমার সঙ্গে তুমি এস।

শেখর হাত মুখ ধুয়ে মেস-রুম থেকে বেরিয়ে এল এবং প্রথম বারের মত থামল এসে অ্যাকামোডেশান ল্যাডারের গুঁড়িতে। সারেং আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ব্রীজে গিয়ে খবর দিল, শেখর নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ পর সারেং ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—ওপরে উঠে আয়।

শেখর কোনরকমে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল। মই বেয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিন ঘুরে উঠে গেল ব্রীজে। ভিতরে ঢুকে দেখল চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার ষ্টিআরিং-হুইলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। কম্পাসটার সোজাসুজি বার্নিশকরা মেহগনি কাঠের রেলিংয়ের ওপর ভর করে বসে আছেন চিফ্-অফিসার আর ক্যাপ্টেন।

শেখর ঢুকতেই চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলেন—মোবারক কোথায় গেছে শেখর? তুমি বলতে পার?

—পারি। সন্ধ্যায় সে সি-ম্যানস্ মিশনে গেছে।

—তারপরের খবরটা জানতে চাই।

—তারপরের খবর আপনি ঠিক যা জানেন আমিও তাই জানি স্যার।

—কিন্তু সারেং যে বলল মোবারকের সব খবর তুমি রাখ।

—রাখি। কিন্তু কতটা রাখি সারেং সাব তা জানতেন না।

—শেখর!—চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার ধমক দিয়ে উঠলেন।—সব খুলে না বললে লগ-বুকে স্যার তোমার নাম তুলে নেবেন।

—যা আমি জানি না স্যার, জানবার কথা নয়, সে নিয়ে যদি সারেং সাহেবের কথার উপর ভর করে লগ-বুকে আমার নাম তোলেন তবে ক্ষতি আমার হবে ঠিক, কিন্তু মোবারকের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে না।

মোবারকের নামে ওরারেণ্ট দিচ্ছি। শুনেছি সে অ্যাগমণ্ট-হিলের দিকে একটি মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।

শেখর চুপ করে থাকল।

—হাতে আমাদের এতটুকু সময় নেই। কারণ জাহাজ আজ-কালই ছেড়ে দেবে, নয় তো অপেক্ষা করা যেত।—চিফ্-ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে শেষে বললেন—তাহলে যেতে পারে স্যার?

হুম্ করে একটি শব্দ ঘোঁৎ করে ক্যাপ্টেনের নাক মুখ দুই জুড়ে বেরিয়ে এল। ক্যাপ্টেন সম্মতি জানিয়েছেন।

শেখর ব্রীজ থেকে তখন নেমে এল ডেকের উপর। মাউন্ট অ্যাগমণ্ট আর লায়ন রকের বুক জুড়ে ওর বিবর্ণ দৃষ্টি। বড্ড অসহায় ও আজ। অন্তর থেকে খুব সহজভাবে উঠে এল কথাগুলি—জাহাজ সেল করবে। ওয়ারেণ্ট যাচ্ছে মোবারকের নামে। হয়তো সে না ফিরলে শেখরের অস্তিত্ব জাহাজে দুঃসহ হয়ে উঠবে। অনুভব করল আজ তার জীবনটা কেমন কেন্দ্রবিমুখ হয়ে উঠেছে। আঠার মাস সফরে দরিয়ার বুকে ওদের দু জনের ভিতর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজ আর গৃহজীবনে সে সম্পর্ক গড়ে ওঠা ভার। তাই মোবারক আর শেখর দুই ভিন্ন জাতির দু-ধারা সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনে এক রক্ত হয়ে গেল। সেই ধারা যদি দু-ধারা হয় তবে শেখর ঝরা পাহাড়ী কুরচীর মত শীর্ণ গ্লানিমায় ঢাকা পড়বে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে ওঠায় শেখর ফোকশালের দিকে পা বাড়াল।

সারেং নীচে এসেছিল শেখরকে খুঁজতে, সে যেন নীচে কাজ করতে যায়। চার নম্বর সাবকে সাহায্য করতে হবে। কণ্ডেন্সার খোলা হয়েছে, পানি মারতে হবে পাইপে। সে শুনেও শুনল না। সারাটা দুপুর বসে বসে মোবারকের দুর্যোগপূর্ণ জীবনের কথা সে চিন্তা করল। সঙ্গে সঙ্গে বাকী সফরের নিঃসঙ্গ জাহাজী জীবনের কথা ভেবে যেন মুষড়ে পড়ল।

বিকেলবেলায় শেখর একবার মাত্র উঠে এসেছিল ডেকে। মোবারকের ওয়ারেণ্টের মতই যেন বিকেলটা পাণ্ডুর হয়ে আছে। সব চুপ হয়ে আছে। জাহাজীরাও। শুধু কারপেণ্টার আর দু নম্বর ডেকে অ্যাপ্রেণ্টিস ফল্কার ওপর ক ভাঁজ ত্রিপল ঢাকা দিয়ে নীচে লোহার পাতের ওপর কীল আঁটছে। ডেকে আর কেউ নেই। ডেক-পথ, এলিওয়ে-পথ সব শূন্য। শুধু পোর্ট সাইডের গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার কনকনে হাওয়ার ভিতর বসে বসে কাঁপছে।

ক্রেন মেশিনের নীচে জেটির ওপর সবুজ মোটর। সে মোটরে সারেং বড় মালোম ওয়ারেণ্ট দিতে যাচ্ছেন। শেখর দাঁড়িয়ে থাকল। বড় মালোম কেবিন থেকে বেরিয়ে এলে একবার অনুরোধ করবে। শুধু এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। কারণ ওর মন বলছে আজ যখনই হোক মোবারক ফিরবে। পোর্ট-সাইডের এলিওয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বুকের ভিতর কেমন যেন ধুকধুক একটা বিচিত্র শব্দ উঠছে। কেমন এক বিচিত্র রকমের জড়তায় সে পাথরের মত স্থির হয়ে আছে।

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে ওর শরীর মন সব। কারণ এলিওয়ে ধরে চিফ্-অফিসার বের হয়ে আসছেন। আসছেন ওর দিকে। এসেই এমন দুটো রক্তচোখ

নিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে গেলেন যে সে কিছুতেই অনুরোধ করে বলতে পারল না, শুধু একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে দেখুঁন মোবারক আসে কি-না।

চিফ্-অফিসার গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেলেন। পরে জাহাজ থেকে জেটিতে নামল সারেং সাব। ওঁরা মোটরে উঠে পাহাড়-সিঁড়ির পথে এজেণ্ট অফিসের দিকে চলে যেতেই দেখল সেই পথ ধরে বন্দরের দিকে আর-একটি নীল মোটর উল্কার মত ছুটে আসছে। এসেই খ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সিঁড়ির সামনে। দরজা খুলে ছবির মত বেরিয়ে এল অষ্টাদশী লিলি।

উচ্ছল হয়ে উঠল শেখর। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর বিবর্ণ মুখ। চিৎকার করে উঠল—লিলি, ভগবান মঙ্গলময়। মোবারক কোথায়?

চিৎকার করতে করতে শেখর ছুটে গিয়েছে কাঠের সিঁড়িটা পর্যন্ত। সিঁড়ি থেকে লিলিকে নামিয়ে আনতে আনতে বলল—মোবারক যে আসে নি। সে কোথায়?

—ফিজ্‌রয়ে আমাদের বাড়িতে।

—মোবারকের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওয়ারেণ্ট দিয়েছে কোম্পানি।

—ওয়ারেণ্ট! ওয়ারেণ্ট যাচ্ছে। ঠোঁটের ভাঁজে কবার কথাগুলি শুধু উচ্চারিত হল। তারপর কি চিন্তা করল মুহূর্তের জন্য এবং চোখ তুলে চাইল শেখরের দিকে!—ভয় নেই। ওয়ারেণ্ট দিয়ে ওরা কিছু করতে পারবে না। কারণ মোবারককে আমি বিয়ে করছি।—শেষে কোটের আস্তিন টেনে ঘড়িটা একবার দেখে বলল—চল তোমার কেবিনে। কথা আছে।

লোহার ডেকের উপর জুতোর হিলের খট খট শব্দ করে পা বাড়াল লিলি। চলেছে সে পিছিলের দিকে। তামাটে রঙের হাল্কা মোজায় জড়ান পা দুটোর চলার ঢঙে কেমন যেন আড়ষ্ট প্রভাব। মনে হয় পাদুটো এক্ষুনি যেন হাঁটুর মাঝামাঝি ভেঙে পড়বে। কোন রকমে তবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পিছিলে। মুহূর্তের জন্য থামল ক্রু-গ্যালীর সামনে। পিছন ফিরে ডাকল—শেখর! লিলির কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গা কাঁসার শব্দের মত শোনাল। শেখর এতটুকু প্রত্যুত্তর করতে পারল না। সমস্তটা ডেকপথ অতিক্রম করতে করতে সে ভাবছিল বাকি সফরের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। মোবারক আর ফিরছে না। লিলি তাকে বিয়ে করবে। এছাড়া ওর আরও কথা আছে। ফোকশালে গিয়ে সে কথা হবে। কি কথা! কেমন কথা! সে কথার ভিতরে শেখরের জাহাজডুবির কথা নেই তো!

সেই সময়ে অনেকগুলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পিছিলের ডেকে পায়চারি করছিল। শেখরের

দিকে চেয়ে সে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়ে ওঠে নি—শেখর আর লিলির মুখের দিকে চেয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যেই যথাসম্ভব অনুমানের জবাবগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।

লিলি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। ভিতরে ঢুকল ফোকশালের। শেখরও ঢুকল এবং ঢুকেই বলল—বোস।

লিলি বসল না। দাঁড়িয়ে থেকেই স্কার্টের পকেট হতে বের করে নিল সিগারেটের প্যাকেটটা। দু চোখের ভুরু উঁচিয়ে শেষে হাত বাড়াল শেখরের দিকে—তোমার লকারের চাবিটা!

লিলির চোখ আর মুখ দেখে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠল শেখর। হয়তো ভুল করেই শেখরের চাবিটা চাইছে। দরকার মোবারকের চাবির, ওর লকারের। বিয়ে-থা হবে, কাজেই মোবারকের সব কিছুর ওয়ারিশ লিলি। সারেংকে ডেকে আনলে হয়, চাবিটা সারেং-এর কাছেই আছে। গাদা মেরে সব কিছুই সামনের লকারটার ভিতর রেখে গেছে।

—সারেংকে ডেকে আনছি। মোবারকের চাবিটা ওর কাছেই আছে। তুমি দাঁড়াও, চাবিটা এনে দিচ্ছি।

—আমি তোমার চাবি চাইছি। মোবারকের চাবি দিয়ে আমার কি হবে? ওটা আমাকে দিয়ে বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এস। ততক্ষণে আমি এ দিকের সব ঠিক করে রাখছি। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

সব কথার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না শেখর। তবু নির্বিকারভাবে বালিশের নীচ থেকে চাবিটা বের করে দিল লিলিকে। এদিক ওদিক খুঁজে সাবানের বাক্সটা বের করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে ক জন জাহাজী এসে উঁকি মেরে গেছে শেখরের ফোকশালে। সারেংও একবার এসেছিল দেখতে। ট্যাণ্ডেল, ডংকীম্যান সবাই দেখে গেছে লিলি শেখরের লকার থেকে কি সব টেনে টেনে বের করছে। ওসব দেখে ফোঁসফোঁস করে উঠেছিল তিন নম্বর ডংকীম্যান—মাগীটা আবার এসেছে শেখরবাবুর মাথা খেতে। আজকে হয়তো শেখরবাবুকে নিয়েই ভাগবে। তাই ওসব সাবধান করতে হবে, সারেংকে বুঝিয়ে বলতে হবে নচ্ছার মেয়েটার সম্বন্ধে। এমন অনেক কিছু ভেবেই যখন উপরের দিকে উঠতে যাবে সে সময় দেখল শেখরবাবু বাথরুম হতে বেরিয়ে আসছেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তিন নম্বর ওয়াচের ডংকীম্যান। কিছু বলতে গিয়েও শেখরবাবুকে বলতে পারল না। এবার আরো বেশি দূরে সরে দাঁড়াল—শেখরবাবুর মুখটা আজ

খুব বেশি থমথমে। চিঠি-লিখে-দেওয়া বাবু—দেশের খবর যে দুটো-একটা আজও পায় সে এই বাবুর মেহেরবানিতেই। এ বাবু কি আর সেই মোবারকের মত। সাদা মেয়ের ভেল্কীতে পড়বেন ইনি ?

শেখর ভিতরে ঢুকে দেখল লিলি চকোলেট রং-এর স্যুট আর ইটালিআন আর্টি-ফিসিয়াল সিল্কের শার্ট ভাঁজ করে রেখেছে ওরই পাশে। চকচক করছে বাক্সের নীচে জুতোজোড়া পর্যন্ত। শেখরকে দেখে বলল—বাইরে অপেক্ষা করছি—জামা-কাপড ছেড়ে নাও। যেতে হবে মোবারককে দেখতে।

ওরা দুজন এক সময় উঠে এল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উপরের ঘন সাদা কুয়াশার ছায়াটা চিমনির ধোঁয়ায় কেমন ধূসর হয়ে উঠেছে। লায়ন রক্ হতে মাউন্ট অ্যাগমণ্টের মাথায় মাথায় সেই আবরণ। ধূসর কুয়াশায় আবৃত ডেক-পথে এসে শেখরের চোখদুটোও কেমন ধূসর হয়ে উঠতে থাকল। একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতে থাকল লিলিকে কেন্দ্র করে।—মোবারককে দেখতে যেতে হবে। লিলি ওকে নিতে এসেছে তাই ? মনের ভিতরেই গুমরে মরতে থাকল শেখর। মোবারক কেমন আছে ? কি হয়েছে ওর ? কোন প্রশ্নেরই সহজ উত্তর সে খুঁজে বের করতে পারল না। কি যেন একটা অস্বস্তি সব কিছুকে কেন্দ্র করে। হয়তো মোবারককে দেখবার উন্মুখ আগ্রহ তাকে সহজ হতে দেয় নি। সেজন্য আর একটাও প্রশ্ন সে লিলিকে করতে পারল না।

তারা দুজন এসে থামল গ্যাংওয়েতে। কোয়ার্টার-মাস্টারই বাধা দিয়ে দিল। শেখর আর-একবারের জন্য বিস্মিত হল। গ্যাংওয়ের বুকে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার-মাস্টার হাত মুখ দাড়ি নেড়ে শেখরকে বলেছে—যেতে দেওয়া হবে না। জাহাজ কাল ছাড়ছে। ক্যাপ্টেন কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন না।

লিলি কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না দুজন একদেশী মানুষের জাতভাষা থেকে। শুধু শেখরের দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে—সে অনুবাদ করে নিশ্চয়ই বলবে দুজনের মধ্যে এতক্ষণ কি কথা হল।

আর শেখর যখন অনুবাদ করে শোনাল লিলিকে তখন সত্যি যেন ওর হাঁটুর ভাঁজদুটো ভেঙে এল। যাতে কাঠের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জেটির জলে ডুবে না যায় সেজন্য যেন দড়িটা শক্ত করে ধরল। শেখরকে অনেক কথা বলবার ছিল। মোবারকের অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মাতৃভাষায় চিৎকারের অর্থ সে কিছুই বোঝে না। আজ লিলির জীবনে শেখরকে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কই, সে যেতে পারল না, কোম্পানি তার পথ রোধ করে বসে আছে—সে পথ থেকে টেনে নিয়ে যাবার কতটুকু শক্তি লিলির ? মোবারকের ভালমন্দের ভার ওর উপর বর্তে আছে—কিন্তু শেখরের ?

কাজেই এক অপার্থিব ভাবলেশহীন দৃষ্টির বিনিময় হল শুধু শেখর আর লিলির মধ্যে। শেষে প্রায় টলতে টলতে দু হাতে দু দিকের দড়ি শক্ত করে ধরে লিলি নেমে গেল জেটিতে—পার্ক-করা মোটরে উঠে পাহাড়ের ঢেউয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেখর তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে পাহাড়ী ঢেউয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে—ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে নীল-লাল আলোর রেশ কুয়াশার জাল ভেদ করে ওর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে তুলছে। মৃত্যুর মত সে দৃষ্টি স্থির। তবু তার ভিতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটো জীবন, মোবারক আর লিলি। কিন্তু মোবারক আর ফিরল না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় নেবে জাহাজ। সুখানী এসেছিল ডেকে। স্টোর-রুম হতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায়ের চিহ্নিত কালো বর্ডারের ফ্ল্যাগটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল। এখন ওটাই উড়ছে মাস্টে।

ডেকের ওপর পায়চারি করছে শেখর। দৃষ্টি ওর পাহাড়ী ঢেউয়ের ভাঁজে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার রং-বেরঙের কাঠের বাড়িগুলোর ছায়ায়। এমনি এক কাঠের ঘরের নরম ছায়ায় মোবারক আর লিলির দুটো চখা-চখীর আকাশ-নীড়। মোবারক অসুস্থ। লিলি ওর ভালমন্দের ভার নিয়েছে।—শেখরকে দেখতে চেয়েছিল ও।—লিলির জীবনে শেখরের প্রয়োজন খুব বেশি।

ইঞ্জিন-সারেং সেই পথেই এল। সেই পথেই নেমে গেল ইঞ্জিন-রুমে। ইঞ্জিন-রুমে ঢোকার আগে সজারুর মত খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখে গেল শেখরকে। একটা সরু কটাক্ষপাত প্রবাহিত হয়ে গেল শেখরের দেহকে বৃত্ত করে। নীচে নেমে গেলে ও। বয়লারে আগুন দেবে, স্টীম তুলতে হবে দু শ ত্রিশ। স্টীম গেজের কালো কাঁটাটা লাল দাগে উঠে থর থর করে কাঁপবে।

সাড়ে বারোটায় চর্বি-ভাজা রুটি খেল সবাই। আধখানা করে রুটি খেয়ে আধ বদনা করে জল ঢালল গলাতে। সারেং ডাকল—মাস্টার।…ক্রু-গ্যালীর সামনে ট্যাণ্ডেল থেকে কোলবয় সব দাঁড়াল সার বেঁধে। নূতন করে ওয়াচ ভাগ হল। এক নম্বর ওয়াচে মোবারক যেখানে বয়লার টানছিল শেখরকে সেই বয়লারে ঠেলে দেওয়া হল। শেখর মাস্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সব। বুকের ভেতরে কে যেন ছুরির ফলা দিয়ে আঁচড় টানছে একটা একটা করে। ধুকধুক করছে বুকের একটা ক্ষতস্থান। দু নম্বর বয়লার, কোম্পানির শয়তান পুষে-রাখা কসবী—বাবুর প্রতি ওর খুব বেশি টান। কসবীটাকে সায়েস্তা করতে পারে মোবারক, ছোট ট্যাণ্ডেল আর সিলেটি আগওয়ালা গণি।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শেখর। প্রতিবাদ জানাল না। প্রতিবাদ জানিয়ে কোন লাভ নেই। সে জানে মোবারক আজ জাহাজে থাকলে দু নম্বর বয়লারে ওকে ঠেলে দেওয়া দূরে থাক, কেউ একথা তুলতে পর্যন্ত সাহস করত না—মোবারককে জাহাজীরা সমীহ করে চলত। শেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবল, মোবারক তুই চলে গেলি! গেলি তো আমায় নিয়ে গেলি না কেন? দেশেও যে আর ফেরা হল না আমার দেখছি। কি করে হবে? আমি নূতন আগওয়ালা—দু নম্বর বয়লারের স্টীম দু শ ত্রিশে তুলে রাখা—সে কি আমার কাজ?

ডেক-সারেং আর ডেক-বড়-ট্যাণ্ডেল দুদিকের দু পিকে চলে গেছে—সঙ্গে গেছে দু ভাগ হয়ে ডেক-জাহাজীরা।—হাফীজ হবে লোহার মোটা তার, হাসিল টেনে তোলা হবে, ওয়ার পিন ড্রাম গড় গড় করে উঠবে—সেই সঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে উঠবে ম্যানিলা হ্যাম্পের মোটা মোটা হাসিল।

কিনারায় ক জন সোরম্যান ছুটোছুটি করছে। দু পিকের দু মালোমের নির্দেশ-মত হাসিল খুলে দেওয়ার ভার ওদের উপর। সমস্ত জাহাজ আর জেটি জুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। বাঙ্ক লাইন কোম্পানির জাহাজ সিউলবাঙ্ক সিডনীতে রওয়ানা হচ্ছে। আবার কবে আসে কি আসবে না কেউ তা বলতে পারবে না।

এক সময় পাইলট উঠে এল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। ব্রীজে উঠে দেখল দূরে ফরোয়ার্ড পিকের নীচে, পিছনে আফটার পিকের তলায় দুটো টাগ-বোট জাহাজকে টানছে।

শেখর আগওয়ালার পোশাক পরে মাথায় নীল টুপি টেনে বের হয়ে এল ফোকশাল থেকে। বোট ডেকে এসে স্কাইলাইটের পাশে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। শেখর শেষ-বারের মত দেখে নিল পাহাড়ী শহরটাকে—সি-ম্যানস্ মিশনকে আর ফিজ্‌রয়ের বুকে ঘর বাঁধবার স্বপ্নময় দুটো জীবনকে। চোখদুটো কেন জানি ছলছলিয়ে উঠল। তবু খুব সন্তর্পণে পা বাড়াতে হল—নীচে নামতে হবে। নীচে নামবার লোহার জালিটার উপর দাঁড়াতেই ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার করে উঠল হুইসেলটা, দিকে দিকে খবর পাঠাল, বিদায় নিচ্ছে সিউলবাঙ্ক—নূতন দেশ, নূতন জমির জন্য।

শেখর নীচে নেমেই দু নম্বর বয়লারের এক নম্বর ওয়াচের আগওয়ালা গণির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর জুড়িদার। আরো যারা নেমে এল তারাও নম্বর মিলিয়ে বয়লারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার সময় সবাই এক চোখ দেখে গেল—শেখর পাথরের মত দাঁড়িয়ে শুধু ভূতুড়ে স্টীম গেজটা দেখছে।

এক সময়ে গণির দিকে চেয়ে বলল শেখর—র‍্যাগ শ্লাইস শাবল?

—ঐ নীচে। চুলো তিনটা প্রথমেই টেনে নিস—জাম হয়ে আছে।

—জাহাজ ছাড়বে ক'টায় ?

—তোদের 'পরী'তেই।

—তুই চুলো টানিস নি ?

—টেনেছি—কিন্তু চুলো অস্ট্রেলিআন কোল খাচ্ছে। শুয়রের বাচ্ছা বড় মিস্ত্রী একট বাঙ্কার খুলে দিয়ে গেছে। ক্রস-বাঙ্কার বন্ধ। অস্ট্রেলিআন কোল শেষ না হলে আর ক্রস-বাঙ্কার খুলছে না।

প্রথম ওয়াচ শেষ হতে এখন দশ মিনিট বাকী। মাথায় সাদা টুপি-আঁটা বড় ট্যাণ্ডেল এক নম্বর পরীদের ডেকে বলল—যাওরে ব তোমরা। গোসল টোসল করগা। একটু পানী আমার লাইগা রাইখা ছ্যান যে।

গণি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে শেখর এসে দাঁড়াল বয়লারের সামনে। চেয়ে দেখল স্টীম নামছে! দু শ ত্রিশ থেকে দু শ দশে নেমে এসেছে। আরো নামবে। তাড়াতাড়ি বয়লারের পোর্ট সাইডের দরজাটা খুলে কয়েক শাবল কয়লা হাঁকডালো। তবু স্টীম এক পয়েণ্ট বাড়ছে না, দু নম্বর বয়লার আর অস্ট্রেলিয়ান কোল মিলে যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে! এমন সময়ে চিৎকার উঠল পাশ থেকে, বড ট্যাণ্ডেল হাঁকছে, স্টীম নামছে, কয়লা হাঁকড়াও, র‍্যাগ মারো, শ্লাইশ দাগো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক উঠল—আল্লা আল্লা! শোঁ শোঁ করে উঠল বয়লারের স্টীমককৃগুলি। একসঙ্গে ছয় বয়লারের ছয় র‍্যাগ উঠল, ঠন্ ঠন্ করে বাড়ি পডল নীচে—লোহার প্লেটে। শ্লাইশ হাঁকডালো একসঙ্গে—ভিতরের জ্বলন্ত আগুন থেকে ঝাং-ধরা পোড়া কয়লা চড় চড় করে ফেটে উঠল। র‍্যাগ মেরে টেনে আনলো ছাই, পোড়া কয়লা। পাশ থেকে জ্বলন্ত পোডা কয়লার উপর বালতি বালতি নোনা জল ছিটকে পড়ল। সমস্ত স্টোকহোলটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে। শেখর চোখ মেলে চাইতে পারছে না—চোখ বুজেই টানছে। দূর থেকে আবার চিৎকার করছে বড় ট্যাণ্ডেল, স্টীম নামছে। একসঙ্গে দুটো শাবল সন্ সন্ করে উঠল। ঝন ঝন্ করে বাডি পড়ল লোহার প্লেটে—কয়লা হাঁকড়ালো শাবলের পর শাবল। ছয় বয়লারের পোর্ট সাইডের ছয় চুলো নিমেষে ভরে উঠল। এয়ার-ভাল্‌ব্‌টা টেনে দিতেই কালো কয়লা লাল হয়ে উঠল।

শেখর হুম্ হুম্ করে কয়লা মারছে দু নম্বর বয়লারের তিন নম্বর চুলোতে। বার বার করে ত্রিশ সের ওজনের শ্লাইস টানতে গিয়ে মোচড় দিয়ে উঠছিল হাতের নরম পেশীগুলো। অন্য আগওয়ালাদের পোড়া কয়লা টানা শেষ। ছাই হাফিজ হয়ে গেছে। স্টীম ওদের দু শ ত্রিশে। তাই উইণ্ডসহোলের নীচে বসে একটু বিশ্রাম নিতে

পারল। কিন্তু শেখরের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উইণ্ডস্‌হোলের নীচে বসে মুহূর্তের জন্য হাওয়া খেতে পারল না। ঘাম আর ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ। পোড়া কয়লায় ঢেকে গেছে চোখ। মুহূর্তের জন্য থেমে রগড়ে নিল একবার চোখত্নটো, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখল ষ্টীম গেজটা—ত্ন শ ত্রিশে তবু উঠল কই ?

ডংকীম্যান একবার এসেছিল ইঞ্জিন্‌-রুম থেকে।—তিন নম্বর মিস্ত্রী ত্ন নম্বর বয়লারের ষ্টীম চাইছে আরো।

ডংকীম্যান এসে থেমেছিল ইঞ্জিন্‌-রুম পেরিয়ে স্টোকহোলের প্রথম দরজায়। পকেট বাঙ্কারের কোণায় দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিল কথাটা। শেখরের কাছে যেতে ওর সাহস হয় নি। বলা তো যায় না! হয়তো ষ্টীম তুলতে গিয়ে গনগনে লোহার র‍্যাগটা শেখর ডংকীম্যানের মাথায় মেরে পরখ করে দেখতে পারে, দ্বিতীয়বার সে র‍্যাগ দিয়ে টন্‌ টন্‌ আগুনে কয়লার মাথা ভাঙতে পারে কি-না। এমন হানাহানি কত বার কত জাহাজে হল। ষ্টীম না উঠলে কয়লার জাহাজে, চিৎকার করবে তো ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন-রুম হতে করো, ষ্টীমের জন্তে স্টোকহোলে ঢুকেছ কি মরেছ। প্রথমেই পোড়া লাল লোহার ত্রিশ-সেরী শ্লাইসটা ভিতর হতে টেনে বের করে নিয়ে আসবে—বল্লমের মত করে হাঁকডাবে ইঞ্জিনিয়ারের বুকে, শেষে টেনে এনে মানুষটা সহ শ্লাইসটা ঢুকিয়ে দেবে চুল্লোর ভিতর! র‍্যাগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পাল্টে ত্নটো টান। একেবারে সাফ। গনগনে চুলোটা সাদা মানুষের তেল খেয়ে ষ্টীম দেবে ত্ন শ ত্রিশ। তাই যখন এমনি হানাহানি চলে ষ্টীম নিয়ে—ফায়ারম্যান ষ্টীম দিতে পারছে না, ইঞ্জিনিয়ার ষ্টীম চাইছে, তখন ডংকীম্যান কিংবা তেলওয়ালাকেই আসতে হয় দূতের কার্য করতে। দহরম-মহরম যা হবার ওদের ওপর দিয়েই হোক। কারণ এ সময়ে ফায়ারম্যানদের ষ্টীম তোলার ব্যাপারে ত্ন-একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পুড়িয়ে দিলে নাকি দড়ি কিংবা হাজতের ব্যবস্থা হয় না। ডংকীম্যান তাই পকেট বাঙ্কার পর্যন্তই এসেছিল। শেখরের হাতে লাল লোহার গনগনে র‍্যাগটা দেখে আর এক পাও ভিতরে আসতে সাহস করে নি।

ট্যাণ্ডেল ত্ন হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল আবার,—ত্নই নম্বর বয়লার আউর ষ্টীম মাংতা।

ট্যাংক-টপের ওপর লোহার প্লেটে মাত্র র‍্যাগটা রেখেছে শেখর, সে-সময় দেখল চিৎকার করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে ট্যাণ্ডেল,—আউর ষ্টীম মাংতা। আল্লার নাম কর রে ব। মার জোরে র‍্যাগ, কয়লা দাগাও রে ব।

শ্লাইস্‌ র‍্যাগ শাবল আর টন্‌ টন্‌ কয়লার আগুন জোঁকের মত চুষে খাচ্ছে যেন

শেখরের বুকের রক্ত। তবু টান মেরে খুলল এয়ার ভাল্‌ব্‌টা। লোহার হাতল ধরে দরজা খুলে শাবল শাবল কয়লা হাঁকড়াতে থাকল। তিন চুলোয় কয়লা খাচ্ছে রমারম্‌। ভরে উঠেছে ফাযার ব্রীজটা পর্যন্ত। শেষে আবার টেনে দিল এয়ার-ভাল্‌ব্‌। জোরে বেরিয়ে এল আগুনের হল্কা। ঝলসে উঠল মুখ, দেহের রক্তটা একেবারেই সব ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি, কাঠ হয়ে গেল ভিতরটা।

খট্‌ খট্‌ করে শেষে বন্ধ করে দিল তিন চুলোয় তিন দরজা। মুহূর্তের জন্য ভর করে দাঁড়াল শাবলের বাঁটের উপর। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে আয়ত্তের মধ্যে এনে চাইল স্টীম গেজের দিকে। দু শ পঁচিশে গিয়ে কালো কাঁটাটা কাঁপছে। দু শ ত্রিশে তবুও উঠল না। চারিদিকে চেয়ে দেখল তখন উইণ্ডস্‌হোলের নীচ থেকে বেরিযে আসছে মন্নু, ইদাহী, লুৎফল। মুহূর্তের বিশ্রামে ওরা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার হাত চালাতে হবে।

সমস্ত সফরের অভিশাপ হয়ে দু নম্বর বয়লাব আজ শেখরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। মোবাবক আলী সারা সফর তাকে সুখ দিয়ে নিজে এখন সুখের ঘর তৈরি করে তাকে প্রাযশ্চিত্ত করতে রেখে গেছে। প্রায়শ্চিত্ত সে করবে।

রাত আট থেকে বারো—পুরো চার ঘণ্টা, স্লাইশ, র‍্যাগ, শাবল আর কয়লার ভিতর ডুবে থাকল শেখর। তার ভিতর ডুবে রইল ওর দেহ মন সব। কয়লা হাঁকড়ানো বাদে পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে শেখরের, মুহূর্তের জন্য আজ সে কথা ভাবতে পারল না। তাই জলের পট থেকে বার বার জল খেয়ে ঢাক করে তুলল পেটটাকে। কয়লা আর শাবলেব ঠুন্‌ ঠুন্‌ আওয়াজের ফাঁকে হাঁক আসছে ফায়ারম্যানদের কাছ থেকে—পানী খেয়ে-খেযে বাঙালী বাবুটা যে ঢাক হয়ে মরবে গো!

ইদাহী র‍্যাগ মেরে দাঁড়াল শেখরের সামনে। মাথার ফেজ টুপিটা শেখরের মুখের ওপর ঝেড়ে বলল—ফালতু থেকে বাবুর শরীর আরো বাবু হয়ে গেছে। তারপর তো আবার হল পীর দরবেশের যোগাযোগ। আর পড়লি তো পড় একেবারে দু নম্বর বয়লারে।—শেষে হি হি করে হেসে সবাইকে যেন জানিয়ে দিল ইদাহী হাসছে।

পরিপূর্ণ অনুভূতিশূন্য শেখরের হৃদয় আজ ব্লাস্ট ফার্নেসের মত ঝল্‌সে উঠল না ইদাহীর কথায়। মোবারক আজ জাহাজে থাকলে হয়তো ইদাহীর রসিকতার ফল ঘটত বিপরীত। হয়তো হাতের শাবলটা নিস্‌পিস্‌ করে উঠত ইদাহীর মাথাটাকে চৌচির করে দেবার জন্য। পরিবর্তন হয়েছে জাহাজের—মোবারক নেই। পরিবর্তন হয়েছে ওর মনের, সে আজ অনুভূতিশূন্য। কিন্তু এই অনুভূতিশূন্য হৃদয়েও কি করে যেন গরম-সীসে-গলা তরঙ্গের মত একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ মোবারককে কেন্দ্র করে

প্রবাহিত হতে থাকল। ইদাহী ঠিক বলেছে। ওর রসিকতা সম্পূর্ণ সার্থক আর্ট থেকে বারোটার ওয়াচে। 'ফালতু থেকে বাবুর শরীর আরো বাবু হয়ে গেছে।' মোবারক যদি প্রথম থেকেই শেখরের প্রতি করুণা না করত, তাহলে হয়তো এই আঠার মাস সফরে ওরও নরম পেশী শক্ত হয়ে উঠত। দু নম্বর বয়লার আর ইদাহী মিলে কঠিন রসিকতা করতে অন্ততঃ সাহস করত না আজ।

এক সময় 'পরী' শেষ করে লোহার রডে-তৈরি হাঁটুভাঙা সিঁড়িটার মুখে এসে দাঁড়াল শেখর। সবাই ওর পাশ কাটিয়ে তর্ তর্ করে উঠে গেল উপরে। কিন্তু ওর ভয় করছে। লোহার সিঁড়িটাও যদি ব্যঙ্গ করে! যদি পরিহাসচ্ছলে ছিটকে ফেলে দেয় ওর থেকে! তাহলে তো শেষ। নীচে পড়ে দুমড়ে যাবে। কয়লার সঙ্গে মিশে যাবে ওর হাড়-পাঁজর রক্তমাংস। ছুটে আসবে 'বাড়িওয়ালা', 'বড় মিস্ত্রী', আরো সবাই। ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দ করে চলা প্রপেলারটা কিন্তু থামবে না। তিন নম্বর ওয়াচের লোকেরা তখন ছিটকে-পড়া শেখরের রক্তমাংসের কণাগুলো কয়লার সঙ্গে—'আহা লোকটা বড় ভাল ছিল গো', বলে মিশিয়ে নেবে। খট্ খট্ করে শব্দ হবে বয়লারের দরজা খোলার। হুম্ হুম্ করে হাঁকড়াবে হাড-পাঁজর রক্তমাংস—দু নম্বর বয়লারে। হয়তো তখন কসবীটা স্টীম দেবে দু শ ত্রিশ। আর জাহাজ থেকে শুধু একটা নাম বাদ পড়বে। কোম্পানির আর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন নেই।

আকাশে সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার। একটা বলিষ্ঠ ছায়া সেই অন্ধকারে এগিয়ে এসে দুটো বলিষ্ঠ হাত শেখরের দিকে বাড়িয়ে দিল। রজনীর সেই দ্বিতীয় প্রহরের শেখরের অনুভূতিশূন্য দেহটা তেমনি পড়ে আছে ফানেলের উপর। মৃত্যুর মত স্থির দৃষ্টি ফিঙ্গ্রয়ের বুকে মোবারককে খুঁজছে। অনুভূতিশূন্য দেহটাকে দুটো হাত এসে জড়িয়ে নিল। বলল—শেখর চল, পরী সেই কখন ভেঙেছে।

শেখরের মড়ার মত স্থির দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল জাহাজে, ছড়িয়ে পড়লো ছায়াটাকে ঘিরে। সন্ত্রস্ত প্রশ্ন এল সঙ্গে সঙ্গে—কে?

—আমি আলী।

—আলী! মোবারক!

অনুভূতিশূন্য দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলিষ্ঠ ছায়ার বুকে।—দেখ দেখ—বলে ক্লান্ত দুটো হাত মোবারকের দু গালে লেপ্টে দিল।—দেখ দেখ, রক্তমাংসের কেমন তাজা গন্ধ।—অসহায় অপরাধীর মত শেষে কেঁদে নালিশ জানাল, আমাকে দু নম্বর বয়লারে সারেং ঠেলে দিয়েছে।

সেই আকাশের ছায়া ছায়া অন্ধকারে দুটো ছায়া একাত্ম তখন। দুটো অসহায় উত্তর-গোলার্ধের মানুষ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাশাপাশি সংলগ্ন তখন। কোন প্রশ্ন নেই, কোন উত্তর নেই। সব প্রশ্ন, সব উত্তর দু জনের হারিয়ে গেছে। বোবা হয়ে গেছে যেন ওরা।

তারপর এক সময়ে ওরা দুজনই নেমে এল নীচে, টুইন ডেকে। নিঃশব্দে। মোবারককে অবলম্বন করে শেখর এসে দাঁড়াল আফটার পিকে। মোবারক গ্যালিতে ঢুকে এক টব গরম জল বের করে আনল—বাথরুমে স্নানের সমস্ত ব্যবস্থা করল শেখরের। মোবারকই স্নান করিয়ে দিল। মাংস-বের-করা হাতদুটো ব্যাণ্ডেজ করে দিল। শেখর চুপচাপ বসে থাকল। জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে থাকল। সব প্রশ্ন, সব উত্তর কেমন জট পাকিয়ে গেছে ওর! মোবারকের দিকে চেয়ে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারল না। একটা কথা বলতে পারল না।

মোবারক আব লিলির সম্পর্ক তবে ভেঙে গেছে! কেন ভাঙল, কি করে ভাঙল, কোথায় ভাঙল, সব প্রশ্ন গলায় এসে কেন জানি চুপ হয়ে আছে।

শেখর কোন রকমে আবার ক্লান্ত চোখে দেখল মোবারককে। সমস্ত শরীর যেন মরে ভূত হয়ে ফিরেছে জাহাজে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ, কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখ, কেমন এক নিভৃত পরাজয়ের প্রলেপ ওর জীবনকে কেন্দ্র করে। শেষে শেখরের চোখদুটো থামল একান্ত স্থির হয়ে। মোবারকের বাঁ হাতের কব্জিতে—ঘড়িটা ঝুলছে। যেন একটা অক্টোপাশ নিরীহ তিমিমাছের মুখে ঝুলে আছে।

ঝড় উঠল!

সমুদ্র ঝিমুচ্ছে।

ঝড় এল মনে—মোবারকের।

মোবারক দাঁড়িয়ে আছে জোনাকি রাতের ছায়া ছায়া আলোতে, বোট-ডেকে। লাইফ-বোটের রাডাবের পাশে ঠিক সেই আগের মত জলছে ওর চোখ—ধক্ ধক্ করে জলে উঠছে। জলছে বুকের ভিতর ফুসফুস পর্যন্ত। লিলি হয়তো তখন পিকাকোরা পার্কের পশ্চিমের পাহাড়ে। পাহাড়-ছাদে কোরী-পাইনের তলায়। চোখ রেখেছে বন্দরে। মোবারকের জাহাজ যেখানে ছিল, সে জেটিতে। হয়তো ওর দু চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

মোবারকের চোখেও জল এল।

লিলি কিছুই জানল না কেন সে চলে এল। কিছুই বুঝল না, কেন সে

দক্ষিণ-গোলার্ধের সবুজ দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে ছুটল উত্তর-গোলার্ধে। অজ্ঞাত থাকল এ খবর লিলির কাছে। কিন্তু তার মা? শেখর প্রশ্ন করে সহজ কোন জবাব পেল না। স্থির করতে পারল না, তিনি জানলেন কি জানলেন না। শুধু শব্দ করছে ঘড়িটা—টিক্, টিক্, টিক্—সেই মোবারকের বাপের আমল থেকে।

মায়ের কথা মনে হল প্রথম। মায়ের মুখ, আম্মাজানের অশ্রুভরা চোখ, শামীনগড়ের আপন মাটির গন্ধে যেন লেপ্টে রয়েছে। জৈনব বিবি হয়তো স্বামীর বুকে শুয়ে এখন স্বপ্ন দেখছে মোবারকের। হয়তো সেই স্বপ্নে আছে লিলি আর মোবারকের দেহ সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারকের ওপর যে আস্থা ছিল জৈনবের, সব হয়তো কাচের মত ভেঙে গেছে। দেন-মোহরের সময় মাকে যেমন ও খুঁজে পাচ্ছিল না শামীনগড়ের মাটিতে, পৃথিবী তখন যেমন চুপ হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, সেই মত পৃথিবী আজও চুপ হয়ে রয়েছে সমুদ্রের লোনা-লাগা মরা ঢেউয়ের মাথায়।

দুরু দুরু শব্দ কোথা থেকে সব ভেসে আসছে। বোধ হয় নীল লোনা জল থেকে এল সে শব্দ। সে আওয়াজে মুখ তুলে সে চাইল দূরে। ইস্পাতের ফলার মত ছুটে আসছে ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক। লোনা জলের বুক চিরে আসছে তারা। হয়তো অতিকায় একটা ডলফিন সাগরের অন্ধকার নিবাস থেকে ছুটে আসছে, আক্রমণ করেছে নিরীহ ফ্লাইং-ফিশের দলকে। সন্ত্রস্ত হয়ে তাই তারা উড়তে চেয়েছে আকাশে।

ঝাঁকটা এদিকেই ছুটে আসছে।

এসে ঝপ ঝপ করে পড়ল সমুদ্রে—জাহাজের কিনারায় শুধু একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে মোবারক তুলে নিল মাছটা। ব্রীজের উইংসের আলোতে দেখল তেমন জখম হয় নি উড়ন্ত নিরীহ সামুদ্রিক জীবটি। অন্য দিন হলে ধরেই মোবারক মাছটার পাখা দুটো ছিঁড়ে দিত। ক্রুগ্যালীর সামনে গিয়ে হেঁকে বলতো—ভাণ্ডারী চাচা, এটা দুভাগ করে আমাকে আর শেখরকে ভেজে দেবে।

মোবারক খুব নরম হাতে তুলে ধরল জীবটিকে। চক্ চক্ করে উঠছে ওর শরীর ইস্পাত-ফলকের মত। সমস্তটা শরীর জুড়ে দুটো পাখা প্রায় লেজ পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝে মাঝে জীবটা নিজের মুখ খুলে ধরছিল, যেমন করে রুই-কাতলা পচা পুকুরের জল টানে। এই উৎকট লোনা জলে এমন নিরীহ শৌখীন জীবটাই বা বাঁচে কি করে! নিজেই প্রশ্ন করল নিজেকে মোবারক। বাঁচে, যেমন করে বেঁচে আছে লিলি কোরী পাইনের তলায়, যেমন করে বেঁচে আছে জৈনব বিবি ওর স্বামীর বুকে, যেমন করে বেঁচে আছে আম্মাজান ওর। আর ভাবতে পারল না মোবারক। চোখ দুটো ঘোলা হয়ে উঠল। সব কিছু যেন সবুজ হয়ে আসছে। ছ'বছর আগের এক কাহিনী, সে

কাহিনীর সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবে যাওয়া কাহিনীর পরিচয় আছে। মোবারকের সাত পুরুষের নাবিক বংশ যেখানে এসে থামতে চেয়েছিল, যে শেষ পুরুষকে চেয়েছিল শামীনগড়ের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে, আপন মাটির গন্ধের সঙ্গে চেয়েছিল যে শেষ পুরুষকে জমির সঙ্গে জীবনকে মানিয়ে নিতে, সেই মানিয়ে নেওয়ার পরমক্ষণেই ভূতের মত ঘড়িটা এসে তাদের নাবিক বংশে আশ্রয় নিয়েছিল। সমুদ্র আবার তাই তাদের টেনেছে। উত্তর পুরুষ মোবারক তাই পূর্ব-পুরুষের ধারাটাকেই অক্ষুণ্ণ রাখল।

মোবারক ছেড়ে দিল উড়ন্ত সামুদ্রিক জীবটাকে। ক্রুগ্যালীর দিকে ছুটে গিয়ে আজ আর বলল না, ভাণ্ডারী চাচা, ভেজে দিও আমাকে আর শেখরকে। মনের ভিতর আজ যে সব বিশৃংখলা চলছে, যে বিশৃংখলার ইতিহাস নিয়ে ওর জীবন-চরিত রচিত, সেই চিন্তাধারাই আজ সমান করে দিল একটা মানুষকে আর মাছকে। ডলফিনের কাছে এই নিরীহ জীবটি যেমন অসহায়, তেমন অসহায় মোবারক, পৃথিবীর কাছে, সমুদ্রের কাছে, কৌরী পাইনের তলায় আর সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারক অনুতপ্ত, দুর্নিবার অনুতাপের জ্বালায় ডেকের কাঠে কাঠে খুঁজছে শান্তির আশ্রয়। সান্-ডায়াল ক্লকের উপর রক্তমাংসের দেহটার জন্য যে বিচিত্র কাহিনী ওর জীবনের সঙ্গে যোগ হল, যে গুণাহ্ দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল, তার থেকে মুক্তি কোথায়?

হাতের ঘড়িটা বিগত দিনের ঘটনার সঙ্গে যোগ দিয়ে আজও যেন হাসছে।

হাসছে। সব যেন হাসছে। কেমন এক অপার্থিব চিৎকার সমুদ্র-বুকের। বুঝি হাসছে অগভীর জলে হাঙ্গরের ঝাঁক। অগভীর জলের হাসি, তাই চিৎকার হয়ে আসছে মোবারকের কানে।

মোবারক চুপ। কাহিনী শুনছে আম্মাজানের মুখ থেকে। বিচিত্র অনুভূতি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে নি। নিভৃত নীল সমুদ্র, নীল আকাশের দশমী চাঁদ নিবিড় হয়ে আছে ওর মুখের উপর। শামীনগড়ের মাটিতে তখন তার আম্মাজান শীতে উনুনের প্রজ্বলিত কাঠের আগুনের পাশে বসে কাহিনী বলছেন।

টিন-কাঠের ঘর। সিমেণ্ট বাঁধানো ভিটে। উনুনে আগুন জ্বলছে। আম্মাজান কাহিনী বলতে বলতে চুপ হয়ে যান। শীতে প্রজ্বলিত কাঠের আগুনে মায়ের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

মোবারক উনুনের পাশে বসে আছে। পা দুটো উনুনের দিকে বাড়ান। আগুনে দুটো মুখ রক্তাভ হয়ে উঠতে থাকলে আম্মাজান তখন আবার বলতে থাকেন।

মোবারকের বয়স তখন দশ।

আম্মাজান পূর্ণ-যৌবনা। ডাকলেন—আলী।

মোবারক শুধু মুহূর্তের জন্য আর একটু সংলগ্ন হয়ে বসতে চাইল আম্মাজানের পায়ের কাছে। আম্মাজান আবার ডাকলেন—আলী। বললেন, তোর বাপজী সফর করে বাড়িতে এলে, বারণ করবি আর সফরে যেতে। তুই বড় হয়েছিস। কথা বলতে পারিস।

চকচক করে উঠল আম্মাজানের নাকের নোলক, বেসর, নাক-ফুল—সব। গলার বিছাহারটা কত কাল থেকে যেন মলিন হয়ে আছে। দিনের পর দিন শুধু ওব প্রত্যাশা, আলীর বাপজীর সফর কবে শেষ হবে। কবে ফিরবে শামীনগড়ে। কবে বুকের ওপর বিছিয়ে থাকা বিছেহারটার্য় দুটো হাত চেপে বসবে, বলবে—তুই পথ-চেয়ে ছিলি বিবি! সমস্ত সফর তাই পাগলের মত কাটল।—সবুজ শাড়ির কাঁথাটা দুটো মুখের ওপর বিছিয়ে দিয়ে এক রাতে নিভৃতে বলেছিল মোবারকের তখন জন্ম হয় নি—বিবি তোর মিষ্টি মুখ শুধু আমায় টানে। দরিয়ার বুকে শুধু তোর মুখ দেখি। পাঁচ ওক্ত নামাজে তোর মিষ্টি মুখটাই শুধু চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

কেমন কবি কবি হয়ে কথা বলে আলীর বাপজী। আরো বলত, মুখ ঠোঁটের সংলগ্ন হয়ে বলত—বিবি।—ঠুন্ ঠুন্ করে খুন্তিটা বাজল কড়াইয়ে। মোবারক মায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—বাপজী কবে আসবেন আম্মাজান?

—মাস দুইতো হল তিনি সফরে গেছেন। শুধু চিঠি আসে, কিন্তু তাতে লেখা থাকে না তো তিনি কবে ফিরছেন। তুই এলে এবার বলবি—তোমায় আমি যেতে দেব না বাপজী! তুই বলিস, অন্তত তোর আম্মাজানের জন্য বলিস।

শীতের চাদরটা গা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল মোবারকের। হাতের খুন্তিটা কড়াইয়ে রাখল আম্মাজান। হাত বাড়িয়ে তুলে দিল চাদরটা। তারপর তুলে আনল মোবারককে কোলে। শামীনগড়ের নিস্তব্ধ রাতে নিবিড় হয়ে বসে রইল মা আর ছেলে উনুনের পাশে।

জন্ম হয়েছিল মোবারকের—শামীনগড়ের মাটিতে। বাপজীর ভীত সন্ত্রস্ত মন প্রশ্ন করেছিল ওঁর বাপজীকে, বাচ্চাটার জন্ম শামীনগড়ে না হয়ে অন্যত্র হলে হয় না?

মোবারকের নানা জসীমউদ্দীন সারেং বৃদ্ধ, অথর্ব। বলি-রেখায় মুখ শতেক ভাঁজে কুঞ্চিত। বারান্দায় বসে সারাদিন খুট খুট করেন আর গড়গড়ায় তামাক টানেন। প্রশ্ন শুনে তিনি চোখ দুটো লাল করে বলেছিলেন—বেটার কথা শোন। তারপর চুপ! আবার প্রশ্ন করলে আর দুটো কথা বলবেন, মোবারকের বাপজী তা জানতেন—তামাম দুনিয়া দেখলাম, শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি।

শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি মোবারকের নানা-সাহেবের কাছে। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হতে হবে। এ মাটি বনেদী।

এ গ্রামের শিশুদের স্বপ্ন উত্তর-মেরু, দক্ষিণ-মেরু, উত্তর-গোলার্ধ, দক্ষিণ-গোলার্ধ—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, পানামা, সুয়েজ। ওরা গল্প শোনে সফর শেষ করে আসা নাবিকদের কাছে বন্য দ্বীপপুঞ্জের, সাগরপারের দেশের—ইঞ্জিন আর ডেকের।

বাপজী তাই চেয়েছিলেন মোবারকেব জন্ম অন্যত্র হোক। শামীনগড়ের মাটিতে অভিশপ্ত নাবিক জীবনের বিষ মাখানো আছে। এখানকার আকাশে-বাতাসে সর্বত্র নাবিকের ডাক। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হয়ে জন্মাতে হয়। সমুদ্র তাদের টানে।

পুরুষানুক্রমে নাবিক বংশের ধারাকে চেয়েছিলেন বাপজী বদলাতে। এ বংশে যে নূতন মানুষটি আসছে সে যদি পুরুষ হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে জন্মায়, তবে সে নাবিক হবেই। বাপজী তা চান না। মোবারক সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মাক। অন্যত্র তার জন্ম হোক। যে হাজারো গুণাহ তার জীবনে দিন দিন যোগ হচ্ছে—মোবারক নাবিক হলে সে গুণাহের সম্মুখীন ওকেও হতে হবে। অন্যত্র জন্ম হলে সহজ সাধারণ পরিবেশে মোবারক গড়ে উঠবে সহজ সাধারণ মানুষের মত। হাজার গোণাগার অন্তত তাকে হতে হবে না।

খুক খুক করে কাসতে কাসতে ডেকেছিল বাপজীকে ওর নানা, এই বেটা মুরগী-চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি? বাচ্চা তোর এখানেই হবে। খোদাকে ডাক, বাচ্চাটা যেন ছেলে হয়ে জন্মায়। আর জন্মালেই যেন নাবিক হয়ে জন্মায়।

বৃদ্ধ অথর্ব অসহায় মানুষটার কাছে বাপজী দাঁড়িয়ে রইল স্থবির হয়ে। এক প্রশ্ন করতে এসে অনেক প্রশ্নের উত্তর শুনতে হল সেদিন বাপজীকে।

—সেই কবে! কোন এক আমলে!

খুক খুক করে কাসেন আর বলেন।

—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল তখন।

নানা-সাহেবের নানার বাপজীর ইতিহাস। তখনও কলের জাহাজ হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চলে কাঠের জাহাজে।

কাঠ চেরাই হতো কলকাতা বন্দরে, চিটাগাং বন্দরে। জাহাজ তৈরি করত দেশী মিস্ত্রীরা।

শামীনগড়ের নৌকো চলতো কর্ণফুলির বাঁওড়ে। লোনা জল ডিঙিয়ে নাও যেত সুন্দরবনে। কাঠ চেরাই করত কাঠ বয়ে আনত। জাহাজ তৈরি হত সে কাঠে।

মোবাবকেব নানা-সাহেব জসীমউদ্দিন সাবেং-এব অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিল সেই নাওয়েব মাঝি।

জসীমউদ্দিন সাবেং কাসতেই থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে দম নিয়ে বললেন, তাবপব ঠিক জানেন না কি কবে বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ণফুলিব নাওয়েব মাঝি থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব এক জাহাজেব ডেক-সাফাইয়েব কাজ থেকে পাল-খাটানোব কাজ পেয়েছিলেন।

ও কালটা প্রায় অস্পষ্ট। বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ ঠিক নজব কবতে পাবল না—বৃদ্ধ আর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহেব আমলটাকে। তবে বৃদ্ধেব চোখে স্পষ্ট এখনও প্রপিতামহেব আমল। অবশ্য সবই শোনা কাহিনী। যেমন করে গল্প বলতেন শীতেব কাঠেব আগুনে আম্মাজান—বংশেব, নাবিক বংশেব ইতিহাস মোবাবককে। তামাক দিতে, পান দিতে এসে এমন অনেক কাহিনী শুনতে হল আম্মাজানকে সাবেং জসীমউদ্দিনেব কাছ থেকে।

বলছেন জসীমউদ্দিন সাবেং। স্থবিব হযে দাঁডিযে আছে তখনও বাপজী। পানটা তামাকটা দিতে এসে আম্মাজানও শুনল।

জসীমউদ্দিন সাবেং-এব প্রপিতামহ সফব দিযে ফিবেই সব মোল্লা-মৌলবীদেব ডাকতেন। সিন্নি দিতেন। কোবান শবীফ পাঠ হত। সকলকে বলতেন—গুণাহ অনেক জমা না হলে দবিয়াব পানি কাউকে টানে না। আব হয কি, সেই গুণাহ বন্দরে ঠেকে ঠেকে হাজাবে গুণ বাডে।

খুব জোব দু মাস। তাবপব অস্পষ্ট হযে উঠতো ওব চোখ। অস্বস্তি ফুটে উঠতো সাবাটা মুখে। সমুদ্র যাকে একবাব টেনেছে তাকে আব ফেবানো যায় না। ফেরানো যায় না বলেই পুরুষানুক্রমিক জাহাজী গতি অক্ষুণ্ণ থাকল।'

জসিমউদ্দিন সাবেং-এব পিতামহের আমল।

নূতন কলেব জাহাজ হয়েছে বিলেতে। পালেব জাহাজের দিন চুকল।

কলের জাহাজ হল বিলেতে। সমুদ্রতীবেব ছোট বন্দব ক্যামবেল টাউন থেকে স্কচ সাহেব গেলেন ইস্ট ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট অফিসে। তিনি বাণিজ্য কবতেন আমদানি-রপ্তানির। শা-যোয়ান মরদ। প্রথম থেকেই ঘুঘু ব্যবসায়ী।

ম্যাকেঞ্জী সাহেব তখন ভারতবর্ষে—গাজীপুরে। রীতিমত তামাক টানেন, গড়গড়ায়, দেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলায় জমা-খরচ রাখতে পর্যন্ত শিখে গেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া মার্চেণ্ট অফিস থেকে জানতে পারলেন তাঁর গ্রামের ম্যাকিনন ভারতবর্ষে

আসতে চাইছে ব্যবসায়ের খাতিরে। তাকে তিনি নিয়ে এলেন। অংশীদারী ব্যবসায় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলতে থাকলো।

ম্যাকিনন সাহেব কাজ নিলেন কাশীপুরে। চিনির কলের ম্যানেজার।

জসীমউদ্দিন সারেং-এর পিতামহের আমলেই এ দেশে এসেছিলেন ম্যাকিনন সাহেব। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজের সফর শেষ করে মাত্র কলকাতায় নেমেছেন পিতামহ। গঙ্গার উপকূলে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা সে আমলের লাইটারের মাঝি। লোকটা হেঁকে বলল—অ্যারা ব সাজাদ সারেং-এর ব্যাডা, ত্যাশে ফিরবা কি করতে? নূতন সাব্ আইল, নতুন জাহাজ কিনল, পুব দেশে রওয়নো হইল বইলা রে ব। আর একডা সফর দিয়া ত্যাও। ট্যায়া অনেক মিলব রে ব।

গঙ্গার উপকূলে সাজাদ সারেং-এর বেটা দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। তবে কি কলের জাহাজ এল এ দেশে? তিনিও হেঁকে বলেছিলেন—অ মিঞা এদিকডায় হোন ত, সফরে রইলাম পোরা দুইডা বছর, ত্যাশের খবর কি আর রাখি কি কও? কলের জাহাজ অইল রে ব এ ত্যাশে?

—কথাডা কি জান-আউনের কথা আছে। তবে অহন পর্যন্ত আইয়ে ন। তুমি ত, রে ব্যাডা বিলাত গ্যাছিলা। কলের জাহাজ কেমনডা ত্যাখচ?

—মিঞা ভাই এ কথা আর কইও না। নিজের চক্ষে না পরখ করলে অ কথ বোঝানের নারে ব। তামাম দুনিয়া তুইরা খ্যান কলের জাহাজডা। ইঞ্জিনডার যেমন তরিবৎ, ত্যামন কেরামতি। খোদার মালোম সাহেব গো মাথায় এ বুদ্ধিডা খ্যালল ক্যান কইরা। চলনের সময় রে 'ব কেবল ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ করে।—বলে হু হু করে হেসে উঠল জসীমউদ্দীন সারেং-এর নানা-সাহেব।

দুজনই শেষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে গঙ্গার উপকূলে। আকাশ-পাতাল ভাবল। রাজার দেশ, রাজার মত বুদ্ধি। দুনিয়া জুড়ে ওদের বাদশাহী, দুনিয় জুড়ে ওদের প্রতিপত্তি, সে প্রতিপত্তি রাখতে হলে এমন কলের জাহাজ না হলেই বা চলে কি করে? জসীমউদ্দিন সারেং-এর নানা-সাহেব, সাজাদ সারেং-এর বেটা নূতন স্বপ্ন দেখল গঙ্গার উপকূলে দাঁড়িয়ে। কলের জাহাজ আসবে এ দেশে। সেই জাহাজের সে জাহাজী হবে, ঝক্কর ঝক্কর শব্দ হবে কেরামতি ইঞ্জিনটার। কান পেতে সে শুনবে। দেশে গিয়ে দুটো শক্ত হাত সবার সামনে তুলে ধরে বলবে—সাহেবদের কলের ইঞ্জিন আমি এ দুহাতে ঠেলে চালাই।

কোম্পানির জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরি। গাজীপুরের ম্যাকেঞ্জী সাহেব যাচ্ছেন

দক্ষিণ দেশে। সে দেশে যাবার জন্য তিনি কলের জাহাজ কিনবেন। প্রথম থেকে পরিচয় থাকলে ম্যাকেঞ্জী সাহেব নিশ্চয়ই কলের জাহাজ ঠেলার ভার তাকে দেবেন।

ম্যাকনিন, ম্যাকেঞ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠার আমল। সন ১৮৪৭। পূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত জলপথে তখন কোন বাণিজ্য-জাহাজ চলত না। ম্যাকেঞ্জী সাহেব বিচক্ষণ লোক, বিস্তৃত জলপথকে তিনিই প্রথম বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবহারে আনলেন। কিছু পালের জাহাজ কিনলেন। সে জাহাজ চলতে থাকলো পূর্ব ভারতের জলপথ জুড়ে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তিনি তাদের বিশেষ সহায়তা পেলেন।

সেই জাহাজেই কিছুদিন কাজ করেছিল এই হারাম জসীমউদ্দিন সারেং-এর নানা—সাজাদ সারেং-এর বেটা। গড়গড়ায় তামাক টানতে গিয়ে আবার তিনি ক'বার খক্ খক্ করে কাসলেন।

১৮৫৩ সালে এ দেশে কলের জাহাজ এল। ম্যাকেঞ্জী সাহেব কিনে আনলেন সে জাহাজ। নূতন জাহাজ—নূতন নাম, 'অরোরা'। সাজাদ সারেং-এর বেটা সে জাহাজে কাজ পেল। কয়লাওয়ালার কাজ। বাংকার থেকে ঠেলে ঠেলে কয়লা নিয়ে আসত গাড়ি করে! সাহেব ফায়ারম্যানদের পায়ের কাছে ম্যাডিসীন-কার উল্টে দিয়ে বলত—ল্যাও সাহেব, বায়লটে ঢোকাও।

দক্ষিণ দেশে (অস্টেলিয়া) তখন লোক আসতে শুরু করেছে। সে দেশের মাটিত কেবল সোনা ছড়িয়ে আছে—লোকে বলে। জাহাজ যাচ্ছে পশ্চিম দেশ থেকে, সঙ্গে লোক যাচ্ছে। তারা আর ফিরবে না। ঘর বাড়ি তৈরি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেবে। তাল তাল সোনা বিদেশে পাঠিয়ে ওরা নাকি ফেঁপে উঠছে।

নূতন দেশ। নূতন জমি। কি হয়, কি না-হয় তখনও পরখ করা হয় নি। খেতে হবে, শুতে হবে, পরতে হবে। দরকার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের।—পশ্চিম হতে আসে। যাতায়াত খরচ ওদের বেশী, দাম বেশী দিয়ে তাই কিনতে হয়। ম্যাকেঞ্জী সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনি এবার মোকা পেলেন। 'অরোরা' জাহাজে খাবার থেকে আরম্ভ করে সাবান পর্যন্ত নিয়ে রওয়ানা হলেন দক্ষিণ দেশের দিকে। ম্যাকনিন সাহেবকে বলে গেলেন ফেরবার পথে জাহাজ বোঝাই তাল-তাল সোনা নিয়ে ফিরবেন।

এদিকে নানী আমার ঘরে বসে দিন গুণছেন, কবে ওঁর খসম ফিরবে। পাঁচ বছর হয়েছে কর্ণফুলির বাঁওড়ে বদনা হাতে বাক্স মাথায় চলে গেছে খসম। চিঠিপত্তরের রেওয়াজ নেই সেকালে—তাই চিঠি পায় নি। বিদেশ থেকে লোক ঘরে এলে তার মুখে কিছু খবর আসে। সেই খবরে নানী জানলেন কলের জাহাজে কাজ পেয়েছেন নানা। নানীর মুখ ভারি খুশী হয়ে উঠেছিল সেদিন, সে খবরে।

আর এক রাত। নানীর চোখে ঘুম নেই! কর্ণফুলির বাঁওড়ে লগার খট্ খট্ শব্দ কানে আসছে। চোখ বুজে পড়ে আছে নানী। ঠিক তখন দরজার খট্ খট্ শব্দ পেলেন। নানীর বয়েস কম। যোয়ান বিবি। বাপজী আমার কম বয়সের। রক্ত ওর তাই ছলাৎ করে উঠল। নানা-সাহেব হয়তো ফিরছেন সফর শেষ করে। কর্ণফুলি বাঁওড়ে লগার যে খট্ খট্ শব্দ পেলেন, সেই নাও করেই হয়তো ফিরছেন। ঝড়ের বেগে উঠে দাঁড়ালেন। রেড়ীর তেলের প্রদীপটাতে আগুন ধরিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন প্রতিবেশী—কলকাতা লাইটারের মাঝি। তিনিই খবরটা দিয়েছিলেন। কেপহোর গেবো আইলে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবেছে। সলিল সমাধি হয়েছে 'অরোরা'র। (১৮৫৬, পনেরো মে)। রবার্ট ম্যাকেঞ্জী ডুবেছে। সাজাদ সারেং-এর বেটা ডুবী হয়েছে।

সে আমল আর এ আমল অনেক তফাত। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস নিলেন জসীমউদ্দিন সারেং। ডুবল ডুবলই! আর কোন খোঁজ খবর নেওয়া হল না। নানীর আবার নিকা হল।

শামীনগড়ের মাটিতে তখন নাবিকের ডাক উঠেছে। গাঁয়ের যোয়ানরা খবর পেল কলকাতায় কলের জাহাজ আসছে হবেক-রকমের। ম্যাকিনন সাহেব আনিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জী সাহেব ডুবেছে, 'অরোরা' ডুবেছে, তাল তাল সোনা ডুবেছে—ম্যাকিনন সাহেব কেয়ার করে না। উঠতে গেলে পড়তে হয়, এ তো দুনিয়াদারীর কথা। এক জাহাজ ডুবেছে, দু জাহাজ কিনলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাক হাঁকলেন। জাহাজ যাওয়া-আসা করবে বর্মা মুল্লুকে—মেল জাহাজ!

কর্ণফুলির বাঁওড়ের বুক চিরে চাটগাঁয়ের ভাঙন পেরিয়ে শামীনগড়ের যোয়ানরা ছুটল নাও করে-কলের জাহাজে কাজ করতে, বাপজীও তাদের সঙ্গে ছুটলেন। এ হাবামের তখন জন্ম হয়েছে।

—তুই মুরগীচোরের বাচ্চা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস্? ইমান তোর সায় দেয় না? ইজ্জত তোর নেই? জাহাজ ডুবীতে নানাজী মরলেন, হারামের বাচ্চা তোর বাপজীর কি জাহাজডুবি হয়েছে? জসীমউদ্দিন সারেং কি মরল? তবে? আমার বাপজী তো কেয়ারই করলেন না। নানাজী মরল, বাপজী ছুটলেন। ম্যাকিনন সাহেব তখন জাহাজের কোম্পানি খুলেছেন—বি. আই. কোম্পানি। বাপজী গিয়ে বলল, সাজ্জাদ সারেং-এর বেটা, বাপজীর বাপ 'অরোরা'র কয়লাওয়ালা ছিল। সাহেব পুরানো খাতা খুললেন, কি দেখলেন, তারপর বললেন—ঠিক আছে, তোমার নাম কোম্পানির ঘরে লিখা হইল। আর তুই বেটা বেইমানের পুত, তোর বাপজী মরল না, তুই মরলি না জাহাজডুবিতে, আর বলছিস কিনা তোর বিবির বাচ্চাটার জন্ম

ভিনগাঁয়ে হোক! মর মর! ভাগ বেটা আমার কাছ থেকে। আমার বাপজীতো শেষকালটাতে এডেনেব এদিকটাতে পানি ডাকাতের হাতে জান খোয়াল। কৈ সে জন্য তো জসীমউদ্দিন সারেং ঘরে বসে থাকল না, বিবির আঁচল ধরে তো প্যান্ প্যান করল না?

বিগত দিনের খবরগুলি ক্লান্ত হয়ে ঝিমোচ্ছে মোবারকের মগজের বিভিন্ন অলিগলিতে। আর একটু সে সরে দাঁড়াল। লাইফ-বোটের রাডারটা ওর দিকে যেন তেরছা, চেয়ে আছে। দুপা পিছিয়ে ভব করল এনামেল-বং-কবা রেলিং-এর রডটাতে। উইংসের আলো তেমনি নির্জীব, নিস্তেজ—নীল সমুদ্র-সোনালী বঙের ছায়া ফেলে যাচ্ছে। যেমন উনুনের কাঠের আগুনটা খুব সোনালী হয়ে উঠলে আম্মাজান আর একটু দূরে সরে বসতেন, দেওয়ালের ওপর ঠেস দিয়ে বসে বলতেন—তাই আলী তোর জন্ম হল শামীনগড়ে। তারপর তিন বৎসর তোব বাপজীর সাক্ষাৎ নেই। সফবে গেছেন, তাই তোকে নিয়েই পড়ে থাকতে হল। তোকে নিয়েই আমার সময় কাটে। শেষে একদিন তিনি ফেরেন সফর থেকে। কর্ণফুলিব বাঁওড থেকে হেঁটে আসেন। মাথায় পেটি, হাতে চকচকে পেতলেব বদনা। সফর দিয়ে এসেছেন, কত জিনিস আনলেন তোর আর আমার জন্য। তিনি এসেও মোল্লা-মৌলবীদের ডাকতেন। দাওয়াত দিতেন দরবেশ ফকিরদের গরীব গরবাদের। খয়রাত করতেন মসজিদে মাদ্রাসাতে। হদিস নিতেন তাদের কাছ থেকে। ডেকের কাঠে কাঠে গুণাহ। হারামজাতেবা হারাম খেয়ে মানুষ। না-পাক লোকদের সঙ্গে মিশে থাকতে হয়। তাই বলেন সফরে আর ফিরছেন না। সাত পুরুষের জমি আছে, ভিটে আছে, মোবারক আছে, আর বিবি আছে। সুখের সংসার, বন্দরের কসবীদের হাতে আর নাকাল হতে হবে না। বিদেশ ভুঁইয়ে থাকলে, নোনা পানির ঢেউ গুণলে ওদের কাছে না গিয়েও থাকা যায় না। তাই গুণাহ হাজার গুণে বাড়ে।

ভাগ্যিস্ তোর নানাজী সে সময়ে বেঁচে নেই। প্রায় দুটো মাস। শেষে এক সময় কেমন যেন মনমরা হয়ে যেতেন বাপজী। বারান্দায় এসে চুপচাপ কেবল বসে থাকতেন দেখতেন শামীনগড়ের মাথার ওপরের আকাশকে, মেঘকে। এরাও সেখানে যাবে যে দেশ থেকে বাপজী সফর দিয়ে এলেন। তখন কিছু কটা পিংলা চোখ ভাসতে থাকে আকাশের গায়ে। তারা হয়তো এখন অন্য জাহাজীর অপেক্ষায় আছে। অর্কিড আর পাইনের নীচে অপেক্ষা করছে চুপি চুপি।

আকাশের গায়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে বাপজীর চোখদুটো আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

কানের ওপর তখন আওয়াজ উঠছে গত সফরের সতেরো-কুড়ি রুপোর কাঁচা টাকার। কিন্তু ভুল ভাঙলো বিবি এসে সামনে দাঁড়াতেই। বিবির হাতের চুড়ি বাজছে ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজে।

আম্মাজান সে সময়ে খুব সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারতেন বাপজীর সামনে। কারণ সব সফর শেষে বাপজীর এমন আড়ষ্ট চোখ। দেখে দেখে আম্মাজানের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চিনতে পারলেন এ দুটো চোখে কিসের প্রত্যাশা। কেন বাপজীর চোখে এত অবসাদ। আম্মাজান আরো কাছে গিয়ে বলতেন, আপনাকে আজ খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

বাপজী কোন রকমে চোখদুটো তুলে ধরতেন আম্মাজানের মুখের দিকে। শেষে জবাব দিতেন, বিবি তুই কিছু মনে করিস না, আমি সফরে যাব! বিবি, দুনিয়াটা এখানে আজকাল আমার খুব ছোট ঠেকছে। এ তো আজও বোঝলাম না কেন এমন হল। বিদেশে গেলে দেশ আমায় টানে, দেশে এলে বিদেশ টানে। সারেং বলেন, জাহাজের টাংকীর পানি যে একবার খেল, নোনা জলের ঢেউ যে একবার দেখল, ঘর তাকে কিছুতেই বাঁধতে পারে না, দরিয়া ওকে টানবেই। তাই সফরে আবার যাচ্ছি, আলীকে তুই দেখিস। খবরদার সফরের কথা কিন্তু ওকে শোনাবি না! জাহাজের গল্প কিন্তু ওকে বলবি না। তবে কিন্তু আমার মত ওকেও জাহাজী হতে হবে— হাজার গোণাগার হতে হবে।

পুরো চার মাস বাদেই বাপজী ফিরলেন সফর করে। খুব কম সফর, এমন কম সফর বাপজীর জীবনে প্রথম।

মোবারকের শরীর যেমন আজ নোনাতে খেয়েছে, রুগ্ন অসহায় যেমন সে আজ— বাপজী এসেছিলেন সেদিন ঠিক এই চেহারা নিয়ে। হাতের ওপর ঘড়িটা সাপের মত প্যাঁচ খেয়ে আছে। আম্মাজান ঘড়িটা দেখে ভূত দেখার মত ভয় পেয়েছিলেন। ঘড়িটার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তিকর টিক্ টিক্।

আম্মাজান হাতের ওপর ঝুঁকে দেখলেন—কলটার ভিতর কি কোন জীন পাখী হয়ে আছে? কিচ্ কিচ্ শব্দ করছে একটানা! ওটা বুঝি কাঁচের ওপর ধাক্কা খেয়ে টিক্ টিক্ কানের পর্দায় ভাসছে। মোবারক আলীও সে দিন ঝুঁকে দেখছিল ঘড়িটা। বাপের আমল থেকে যেটা আজও বেজে চলেছে। শুধু মাঝে মাঝে ওয়াচের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই হয়।

বাপজী বসেছিলেন তক্তপোশে—রুগ্ন, অসহায় চোখ। খুব নিচু গলায় বলেছিলেন বিবি আমার বিছানা দে।

'অজু করবেন না? নমাজ পড়বেন না?'

'না, বিছানা দে।'

আম্মাজান তক্তপোশের ওপর বিছিয়ে দিলেন নীল শাড়ির কাঁথাটা। মোরগের পালক দিয়ে তৈরি বালিশটা রাখলেন শিয়রে। গায়ের কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন দড়িতে। শেষে একটা ভিজা গামছা দিয়ে পা মুছে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বললেন, ইবলিশটাকে খুলে ফেলুন। শামু ওঝাকে ডাকাছ, শরীরটা আপনাব খুব খারাপ হয়ে গেল।

বাপজী শুধু বললেন, না।

তিনি চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন তক্তপোশে। দেখছিলেন টিনের চালের দিকে। অপলক কিছু দেখছিলেন যেন।

আম্মাজান এক সময়ে ডেকেও সাড়া পেলেন না, বুঝি ঘুমিয়ে গেছেন। শেষে বাধ্য হয়ে আম্মাজান হাতের প্যাঁচ-খাওয়া ইবলিশটাকে খুলতে গেলেন। কিন্তু কি কবে যে ওটা হাতে এঁটে রয়েছে তার হদিশ পেলেন না। অনেক এদিক ওদিক টেনে এতটুকু ঢিলে ঢালা করতে পারলেন না। চোখে পড়ল কাটারীটা—তক্তপোশেব নীচে। হাতে নিলেন, কচ কচ কবে কাটলেন ইবলিশের লেজটাকে। ইবলিশটা কিন্তু এতটুকু দমল না। অস্বস্তিকর শব্দটা তখনও চলছে। প্রায় মাঝরাতেব অন্ধকারে শামীন-গড়ের কুকুবগুলি ঘেউ ঘেউ কবে চিৎকাব কবে উঠল। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ওপারে সমতল ভূমির বুকে নন্দনপুর গ্রাম—আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। রোমান-ক্যাথলিক চার্চের ঘড়ির ঘণ্টা বাজলো ঢং—ঢং—এগারো বার বাজলো।

ঘণ্টার আওয়াজে বাপজী ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। নীল কাঁথাব বিছানাব ওপর বসে কি হাতড়ালেন। হাতের দিকে চেয়ে দেখলেন ঘড়িটা নেই। ডাকলেন, বিবি! ঘড়িটা কৈ? আমার ঘড়ি!

আম্মাজানের চোখে হাল্কা ঘুমের আমেজ ছিল মাত্র, তাই সহজেই ভেঙে গেল আম্মাজানের ঘুম।—ইবলিশটা! আছে। পেটিতে রেখেছি।

—দে দে, শিগগির দে।

আম্মাজান নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইবলিশটা! ইবলিশটা দিয়ে কি হয়? কি হবে! মাঝরাতে তিনি এ-সব কি বলছেন! সফর থেকে এসে এমন কেন হয়ে গেলেন?

শিয়রের পাশেই কুপি। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে আগুন জিয়ানো গন্ধক মেশানো পাটকাঠি, দেশী দেশলাই আছে শিয়রে। এক গোছা। এক গোছা থেকে

অন্ধকারে একটা বেছে নিলেন। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে গুঁজে আগুন জ্বালালেন, কুপি ধরালেন। ইবলিশটাকে বাপজীর হাতে দিয়ে শেষে যেন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আম্মাজান, কিন্তু বাপজী দাঁড়িয়ে থাকলেন দরজার ওপর। ঘড়িটা আম্মাজানের চোখের সামনে ঝুলিয়ে বললেন, ঘড়ির ফিতাটা এমন হল কি ক'রে?

আম্মাজানের গলা কেমন ফ্যাস ফ্যাস করতে থাকল। বাপজীর চোখে অবিশ্বাস—অনুতাপের যেন শেষ নেই! তাই আম্মাজানের গলা দিয়ে দু কাঠের ভিতর তার চালনার মত ক' বার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল কিন্তু কি বললেন তা প্রকাশ পেল না। শেষে বাপজী নামলেন উঠোনে। উন্মুক্ত আকাশতলে দুহাত প্রসারিত করে চিৎকার করে যেন কেঁদে উঠলেন—খোদা হাফেজ।

ভয়ে আম্মাজান ডাকলো মোবারককে—মোবারক ওঠ, তোর বাপজী কোথায় যাচ্ছে—ডাক বাপজী করে।

মোবারক বারান্দায় এসে ডাকলো—বাপজী।

উঠোনেব ওপাশের আতাবেডার পাশ থেকে শুধু সেই এক শব্দ খোদা হাফেজ! বিবি ভয় পাস নে—বারোটায় ঠিক ফিরবো। মবু আমার বাপজী ভালতো, শুয়ে থাকগে। আমি এলাম বলে।—খোদা হাফেজ!

উন্মুক্ত আকাশ। নীল সমুদ্র। মাঝ রাতের অন্ধকার চিরে জাহাজটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছে। ফরোয়ার্ড দিকের মাস্টের আলোটা পর্যন্ত মনে হয় ঝিমিয়ে পড়ছে। হয়তো সে দিকে যে নাবিক এখন প্রহরী আছে, তার চোখে ঘুমের আঁচ।

গুঁড়ি গুঁড়ি অন্ধকারে একটা ছায়া টলতে টলতে ডেকের উপর দিয়ে আসছে। মাস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজল। হয়তো তিন নম্বর ওয়াচের সুখানী ব্রীজে যাচ্ছে পরী দিতে। কিন্তু সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে মানুষটার যেন খুব কষ্ট। দুহাতের কনুইতে ভর করে লোকটা কোন রকমে বোট-ডেকে উঠে এল। তারপর আবার কি খুঁজল। তারপর এক এক করে অনেক ক'টা শব্দ ধাক্কা খেল ওর কানে—খোদা হাফেজ।

সেই মানুষটা জলের ট্যাঙ্কটার সামনে এসে হেঁকে ডাকল—মোবারক!

—খোদা হাফেজ!

—মোবারক!

—কে ? শেখর ? এ অন্ধকারে তুই কেন এলি আবার ডেকে ?

শেখর ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল,—তোর চারটা আটটা পরী। এখন বাজে বারোটা। এ মাঝরাতে রাডারের পাশে দাঁড়িয়ে কি বকছিস অন্ধকারে—খোদা হাফেজ, খোদা হাফেজ বলে। কেন এমন করছিস ? কি হয়েছে তোর ?

—কিছুতো হয় নি। এমনিতেই একটু খোদার কাছে মোনাজাত করছিলাম। কিন্তু তুই অন্ধকারে এলি, সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠলি, জাহাজটা দুলছে—যদি পড়ে যেতিস ? হাতদুটো তো বুকের সঙ্গে বাঁধা।

—সে চিন্তা কি তোর আছে ? থাকলে কি তুই ওপরে আসতে পারতিস ?

শেখর মোবারকের আরো নিকটবর্তী হতে চাইলে মোবারক বাধা দিল, —দেওয়ানী আজকে খুব বেড়েছে, এদিকে আসিস নে। উল্টে কিন্তু নীচে পড়ে যাবি।

শেখর চার্ট-রুমের নীচে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, এদিকটায় উঠে আয় তবে। ফোকশালে চল।

মোবারক চার্ট-রুমেব এদিকটায় এসে শেখবের হাত ধরে ফোকশালের দিকে যেতে থাকল। শেখর তখন বলল, লিলিকে ছেড়ে এসে তুই খুব বেশী ভেঙে পড়ছিস।

মোবারক ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল শেখরকে। দুটো কম্বল ওর শরীরের ওপর ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়ে বলল—সব আধুনিকতার ওপরে মানুষের মনে সংস্কার বলে একটি পদার্থ আছে, যাকে আমরা অতি আধুনিকতা দিয়েও ঠেকাতে পারি না। সেই সংস্কারে বাধে এমন কোন কাজ করলেই আমাদের মনে একটা দুরন্ত অনুতাপ গুমরে ওঠে, ভেতর থেকে একটা জ্বালা অনুভব করি। কেমন সাধুভাষায় কথা বলে যেতে থাকল মোবারক।

ফোকশালের স্তিমিত আলোটা জ্বলছে। ঘরটাকে কেন্দ্র করে গুমরে গুমরে মরছে পাইপের নরম হাওয়া। শেখরের চোখে তখন ঘুমের আঁচ। বিড় বিড় করে বকছে মোবারক। যে সারাটা সফরে অত্যন্ত কম কথা বলেছে সে আজ খুব বেশী বকছে। ঘড়িটা আগের মতই ঝুলছে বাঙ্কের এক কোণে। মোবারকের চোখ দুটো সেদিকেই নিবদ্ধ।

শেখর পাশ ফিরে বলল- বিড় বিড় করে আর তোকে বকতে হবে না, এখন ঘুমো। তিনটা না বাজতেই আবার টার্ণ্ হবে।

মোবারক চুপ হয়ে গেল। কম্বলটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শেখর সুইচ টিপে স্তিমিত আলোটাকে অন্ধকার করে দিয়ে বলল, বেচারা।

ভোরের সমুদ্র। কুয়াশা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড় নেই—তাই দেওয়ানী চুপ। ভোরের প্রসন্ন হলুদ আলো ঠিকরে পড়ছে ডেকে ডেকে।

সেই আগের মতই সমুদ্রের বুক চিরে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে জাহাজ। বারো-তেরো নটের, কয়লার আর ব্যাঙ্ক লাইনের পুরনো জাহাজ 'সিউল বাংক' চলেছে নিজের খুশি মত। নোনা জলের বুকে ছক্ ছক্ করে শব্দ তুলছে প্রপেলারটা।

ক্রু গ্যালীর সামনে থেকে দু নম্বর পরীওয়ালার দল চলে গেছে। ডেকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মোবারক—ক্লান্ত, চোখদুটো লাল। মাথায় টুপিটা—র‍্যাগ-টানা ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মোবারক আফটার পিকে উঠেই গ্যালীর ভিতর ঢুকে গেল, গরম জলের টব নামিয়ে নিল উনুনের ওপর থেকে। বাথরুমের ভিতর রাখল টবটা। সাবান নিয়ে এল, চান করল।

'পরী' ভাঙার সঙ্গে বাথরুমে একটা গণ্ডগোল চলে। ট্যাণ্ডেল, ডংকীম্যান, গ্রীজার, ফায়ারম্যান, ট্রিমার হৈ চৈ করে স্নান করে। গরম জলে সাবানে ছাইয়ে-ঢাকা শরীর ধুয়ে নেয়, জাহাজীরা শেষে এক শানকী খানা খায়। এক ওক্ত নমাজ পড়ে, তারপর আবার কম্বলটা টেনে দিয়ে আল্লা আল্লা বলে বাংকের উপর অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

মোবারক চান শেষ করে ফোকশাল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, শেখর দু থালায় ভাত নিয়ে বসে আছে। একটা থালা টেনে নিল মোবারক। বসতে বসতে বলল, খাইয়ে দিতে হবে না, নিজেই আজ চামচ দিয়ে খেতে পারবি?

শেখর চুপ করে থাকল। শুধু আহত হাতটা দিয়ে চামচের ডগায় কোন রকমে ডেলা ডেলা ভাতগুলি উল্টে পাল্টে দেখছে।

মোবারক নুনের টিনটা এনে দু থালায় একটু একটু করে রাখল। এদিক-ওদিক আর চাইল না। দ্বিতীয় বার আর কোন প্রশ্নও করল না শেখরকে। ডালের টিন থেকে দু হাতা ডাল নিয়ে সমস্তটা ভাত মেখে নিল। ক্ষুধায় ঢোক ঢোক জল আর ভাত গিলতে থাকল। কিন্তু এক সময় চোখ তুলতেই দেখল, শেখর উঠে যাচ্ছে।—খেলি না? না খেয়ে উঠে যাচ্ছিস যে? তা বললেই পারিস, না খাইয়ে দিলে খেতে পারব না?

—খেতে পারব না বলেই তো তোর আশায় বসে আছি।

—কিন্তু আমার যে খুব ক্ষিধে! তুই বুঝিস তো 'পরী' শেষ করে এলে কতটা কষ্ট হয়? কেমন ক্ষিদে লাগে? শরীরটা কেমন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

শেখর কেন জানি আর একটাও কথা বলতে পারল না। চুপচাপ সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। মোবারক তেমনি আবার বলল, তুই বস, আমি হাতটা ধুয়ে আসি। তোকে খাইয়ে দিয়ে আমি খাব। আমার অত্যন্ত ক্ষিদে লাগায় ভুলেই গেছিলাম যে তোরও ক্ষিদে লাগতে পারে।

মোবারক উঠতে চাইলে শেখর বাধা দিয়ে বলল—তুই খেয়ে নে, ততক্ষণ আমি বসি। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে আমায় খাইয়ে দিবি। আজকাল নিজের দিকটাই খুব বেশি করে ভাবছি মোবারক। জাহাজ শুনলাম সিডনী হয়ে হোমে যাচ্ছে। হোমে গেলে নিশ্চয়ই কলম্বোতে আমাদের পে অফ্ করবে।

মোবারক আবো দু ডেলা ভাত মুখে পুরে বলল, তুই আমার চাইতে অনেক বেশি অসহায় এ জাহাজে। আব তাই নিজেব দিকটা আজকাল খুব বেশি করে ভাবছিস।

—কেন, এত দিন ত এমন ভাবি নি।

—ভাবতে দিই নি বলে ভাবিস নি। কিন্তু এখন নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত হযে পডেছি যে তোকে দেখবার আমার সময় হয় না। আর তুই আমার উপর আজকাল কথায় কথায় রাগ করিস।

শেখর শুধু 'হুঁ' কবে একটা আওয়াজ করল। তাবপব চুপ করে দেখল মোবারক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে খাচ্ছে।

মোবারক আবার বলল—দেশের জন্যে তোর মন কাঁদে? হাজাব হাজার মাইল দূরে তোর মাকে আত্মীয়স্বজনকে আজকাল খুব বেশী মনে পড়ছে তাই না শেখব? এই লম্বা সফরে নিশ্চয়ই তোব মনে হচ্চে দেশে কুলিগিরি করে খাওয়া অনেক গুণে ভাল, কারণ সেখানে সারাদিন খাটুনির পব মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে দু দণ্ড মিশে থাকা যায়। জীবনধারণের পক্ষে এ যে কতদূব প্রয়োজন, তুই নিশ্চয়ই আজকাল খুব বেশী অনুভব করছিস?

দেশের কথা মনে হলেই দীর্ঘ সফরটা ভীষণ খারাপ লাগে শেখরের। সমুদ্রেব নোনা জলে উঁকি দিয়ে অনুভব করে এই জলটাই তার দেশেব মাটির সঙ্গে মিশে আছে, অথচ সে আজ কতদূরে!

শেখর মোবারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শেষে নিজে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। তার শঙ্করপুর গ্রামটা চোখের ওপর ভাসছে। মা বাবা, মায়েব কথাই, মায়ের ছবিই খুব বেশী করে উঁকি দিচ্ছে। জাহাজে উঠবার আগে মায়ের দুটো ঝাপসা চোখ বিদায়ের সময় কেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সব এক এক করে চোখের উপর ভাসছে।

শেখর চোখ খুলে বলল—তোর আম্মাজান নিশ্চয়ই কেঁদেছিলেন, না রে ?

চুপ করে রইল মোবারক। ওর বুকের ভিতর তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পাক খেয়ে মরছে। তবু ঢক ঢক করে কাঁচের গ্লাস থেকে গলায় জল ঢেলে বলল—আম্মাজান ? আম্মাজান আমার থেকেও নেই শেখর।

মোবারক চোখ নামিয়ে আনলে শেখর ওর দিকে চেয়ে অনুভব করল আম্মাজান সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে না। আঠারো মাস সফরে এমন বিবর্ণ চোখ সে অনেকবার দেখেছে। একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েই এমন আনমনা হয়ে গেছে বহুবার মোবারক। কিন্তু আজ এ অতি অপ্রত্যাশিত। মোবারক গত রাতের মত বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছে আবার। মনে মনে শেখরের অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হল। আম্মাজানকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই নিবিড় স্নেহের অন্তরালে কোন ঝড় উঠেছিল, সে ঝড়ে ওকে শামীনগড় থেকে উপড়ে এনে জাহাজের ডেকে ফেলে রেখেছে। অথচ সব বলেও আম্মাজান সম্বন্ধে মোবারক চুপ করে থাকে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতেই বাকী থালাটা খেয়ে নিল মোবারক। হাত ধুয়ে নিল বাথরুম থেকে। শেখরকে খাইয়ে দিল। এঁটো বাসন ধুয়ে আনল। শেষে মেসরুমের লকারে কাচের গ্লাস আর থালা দুটো রেখে তরতর করে নেমে গেল ফোকশালে। ফোকশালে ঢুকে কম্বল দুটো মাথার ওপর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শেখর ফোকশালে গিয়ে ঢুকল না। কারণ পরী কিংবা ডে-ম্যানের বালাই ওর নেই। হাতে ঘা বলে কাজ থেকে ওর ছুটি। কেবল সাড়ে বারোটায় একবার মেজো মালোমের কাছে হাতে ওষুধ লাগাতে যেতে হয়। তারপর সারাদিন ছুটি। সারাদিন একঘেয়ে সমুদ্র-দর্শন।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করল অনেকক্ষণ। তারপর ব্রীজের দিকে চাইতেই দেখল তিন নম্বর মালোম নেমে আসছেন।

নেমে আসতেই শেখর প্রশ্ন করল—আমাদের জাহাজ, স্যার, নিশ্চয়ই সিডনী হয়ে হোমে ফিরবে। কলম্বোতে আমাদের নিশ্চয়ই নামিয়ে দেওয়া হবে ?

তিন নম্বর মালোম টুইন-ডেক পার হয়ে যাবার সময় বললেন, ঠিক নেই। মনে হয় সিডনী থেকে পুরনো লোহা নিয়ে জাহাজ জাপানে যাবে।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করছিল অনেকক্ষণ শুধু এই খবরটা জানবার জন্য। আঠারো মাস সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ওর অনুভূতি যেন মরতে বসেছে। শুধু একটা খবরের প্রত্যাশা ওর জীবনে। তার দেশ, তার বাড়ির খবর। তার ঘরে সে কবে ফিরবে ? কিন্তু সে অনুভূতি আজ যেন বিবশ জরাগ্রস্ত। ঠিক মত দেশের মানুষদের

ভাবতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে সেই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হল যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে জাহাজ। কোন্ এক আদ্যিকালে জাহাজের সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠেছিল আজ পর্যন্ত সে সিঁড়িতে পা দেওয়াই আছে। আম-জামের ছায়া কেবল কোন এক রাতের স্বপ্ন! ভাই বোন কোনো এক দেশের রাজকন্যা রাজকুমার। ওর পক্ষীরাজ ঘোড়া পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে কিন্তু আম, জাম, নারকেলের ছায়ায় আর-একবারের জন্যে হারিয়ে যেতে চাইছে না।

আজকাল শেখরের স্বভাব হয়ে গেছে সারেং কিংবা ট্যাণ্ডেলকে দেখলেই প্রশ্ন করে জানতে চায় জাহাজের পরবর্তী যাত্রা সম্বন্ধে তারা কোন খবর রাখে কি না! কিন্তু তারা হেসে সে প্রশ্নের জবাব দেয়—যারে, সফর যত বাড়বে টাকা তত বাড়বে। দেশে গেলেই তো হয়ে গেল।

শেখর ওদের বিদ্রূপ বোঝে, কটাক্ষ বোঝে। তবু বেহায়ার মত শুধু এক প্রশ্ন —জাহাজ কবে ফিরবে দেশে। কিন্তু তিন নম্বরের কথায় শেখরের চোখদুটো জ্বলে উঠল। তিন নম্বর সমস্ত খুঁটিনাটি খবর রাখে। তার খবর হক খবর। সে খবরের ভিতর জাল-জুয়াচুরি-বিদ্রূপ-কটাক্ষ-মিথ্যা-ফেরেববাজির প্রশ্ন নেই। সুতরাং জাহাজ জাপানে যাবেই। তারপর হয়তো চীনে, শেষে হয়তো একদিন সিউল ব্যাঙ্ক বে অফ্ বিসকের প্রচণ্ড ঝড়ে তীব্র দেওয়ানীর হিকায় ডুববে। দেশের লোক শুধু টেলিগ্রাম পাবে —ব্যাঙ্ক লাইন কোম্পানির সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজ ঝড়ের ভিতর হারিয়ে গেছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। নাবিক-জীবনের পাওনা এইখানেই শেষ। এইখানেই বিরতি।

এই দীর্ঘ সফরে জাহাজটা কতবার কত ঝড়ের সম্মুখীন হল। কতবার দেখা গেছে বুড়ো ক্যাপ্টেন চার্ট-রুমের মোটা কাচের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন। জাহাজের ঈশ্বর, দুনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন—আমার জাহাজকে বাঁচাও।

নীচে ইঞ্জিন রুমে টেলিগ্রামের অ্যাস্টার্ন অ্যাহেডের সামনে টেবিলের উপর ভর করে থাকেন সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার। কান পেতে শোনেন ইঞ্জিনের কোন বেখাপ্পা আওয়াজ উঠছে কি-না। প্রচণ্ড ঝড়ের বুকে 'আগিল' আর 'পিছিলের' দুরন্ত ওঠা-নামাতে শঙ্কিত হয়ে শুধু একটা প্রচণ্ড ভাঙনের প্রত্যাশা করেন। মৃত্যুর সঙ্গে মনে মনে বোঝাপড়া করেন। হিসাব করেন এত বড় শরীরটা হাঙরে খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে, অথবা সমস্ত জাহাজটা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গেলে দম আটকে মরতে ওদের কতক্ষণ সময় নেবে। আর বাড়ির কথা মনে হলে ছোট মেয়ে কনীর ঢলঢলে মুখ, কচি কচি হাতের সমুদ্রতীরের বিদায় সম্ভাষণ শুধু মনে পড়ে। ইঞ্জিনের গরম হাওয়ায় চোখের জলটা

বের হয়ে আবার শুকিয়ে যায়। ইঞ্জিনটা বেখাপ্পা শব্দ তুলছে—সিলিণ্ডারটা বুঝি উড়ে যাবে।

ফোকশালে ফোকশালে তখন চিৎকার ওঠে—আল্লা।···সারেং কোন রকমে টলতে টলতে মেসরুমে এসে ভাণ্ডারীকে ডাকে—সব ফেলে নীচে যাও, নীচে যাও ভাণ্ডারী। দেওয়ানী, দেওয়ানী খুব জোর উঠছে। পাগলী খেপে গেছে। খানা পাকাতে হবে না, নীচে গিয়ে আগে জান বাঁচাও।

সারেং-এর চিৎকারই শুধু ভাণ্ডারীর কানে পৌছয় কিন্তু শব্দগুলি স্পষ্ট হয় না। তবু ভাণ্ডারী নিজের জান বাঁচাবার জন্য নীচে ছোটে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বাঙ্কের রড ধরে উপুড় হয়ে থাকে।

সে-সময় টানেল পথ খুলে দেওয়া হয়। ইঞ্জিন-রুম জাহাজীরা সে পথে ওঠা-নামা করে তখন। তাদের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ঝড় যত ওঠে উঠুক—ইঞ্জিন চালু রাখতেই হবে। লাল দাগে স্টীম গেজের কালো কাঁটা থর থর করে কাঁপবেই। কাজেই ফায়ারম্যানদের টল্‌তে টল্‌তে শাবল নিয়ে কেবল কয়লাব ওপর পড়ে থাকতে হয়। কারণ বয়লারের ফার্নেসে শাবল হাঁকড়াতে হবেই। কিন্তু অস্থির পা দুটোর ওপর কোন রকমেই শরীরটা ভর করে থাকতে চায় না। শুধু সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়তে চায়। তবু চোখ দুটোর সহজ স্বচ্ছ অনুসন্ধানের দৃষ্টি, স্টীম গেজের বুকে—স্টীম উঠছে কি নামছে। কয়লা হাঁকড়াবে কি হাঁকড়াবে না। অস্থির পা দুটো আর চলবে কি চলবে না।

শেখর চোখের ওপর দেওয়ানী দেখল অনেকবার। ঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন, কুয়াশায় জাহাজের বেশীর ভাগ সফর। লিমন বে, আর বে অব্ বিসকের দেওয়ানীর কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। সেই বিনিদ্র রাতের কাহিনী পরিবার-পরিজনদের বললে তারা নিশ্চয়ই আর জাহাজী হতে দেবে না।

একটা ঠক ঠক আওয়াজে শেখর ফিরে চাইল। উইণ্ড-মেসিনের নীচে ফাইভার —ফিফ্‌থ্ এঞ্জিনিয়ার। নাইন-সিক্সটিফিফ্‌থ্ স্পেনার দিয়ে ঢিলে স্ট্রেপারের মুখ আঁটছে। চার 'ফল্কা' পার হয়ে পাঁচ নম্বর 'ফল্কা'র সামনে আসতেই ফাইভার ডাকলেন —শেখর!

শেখর দাঁড়াল না। সোজা চলে এল পিছিলে—গ্যালীর সামনে ইচ্ছা করেই ও দাঁড়ায় নি। কারণ ফিফ্‌থ্ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ সেকেণ্ডের ফাইভার; বাঙালী ক্রিশ্চিয়ান এবং জাহাজের অফিসার র‍্যাঙ্কে বলে বাঙালী সাধারণ জাহাজীদের অত্যন্ত করুণার চোখে দেখেন। জাহাজীদের ভিতর থাকা-খাওয়ার দুঃখ নিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ উঠলে তিনি কৃত্রিম দুঃখ করে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসেন। মুখ টিপে হাসেন এইজন্য

যে, তোমরা আর কি পেতে চাও বাপু! অনেক পেয়েছ। কোম্পানি তোমাদের অনেক সুখ-সুবিধা দিয়েছে। দেশে থাকলে লাঙল বইতে, ধান পেতে আধ খোরাকী, রোজ পেতে পাঁচ সিকা, খেতে পেতে শুকনো মাছপোড়া আর ভাত। আর জাহাজে এসে তিন টাকা হতে দশ টাকা পর্যন্ত রোজ, দুবেলা গোস্ত, ভাত, চর্বি ভাজা রুটি, চা-দুধ-চিনি। আর কি চাই! অথচ তিনি অত্যন্ত বিনীত হয়ে বিদ্রোহের সময় বাঙালী জাহাজীদের মুখোমুখী বলেন—অনুচিত। কোম্পানির অনুচিত!—কেউ যদি জাহাজীদের মধ্যে বলল, দেখুন না স্যাব, পাঁচ মাসের আগের গোস্ত। গোস্তে পোকা পড়েছে। নিজের চোখে দেখা। এ পেল্লাই খাটুনির পর তৃপ্তি করে দু মুঠো ভাত যদি মুখে না দিতে পারি, কত বড কষ্টের কথা বলুন? পাঁচ নম্বর সাব উত্তর দেন—ঠিক, ঠিক! তোমরা জানাও মাস্টারকে। জানাও কোম্পানিকে। লণ্ডনেব ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের কাছে রিপোর্ট দাও।—কিন্তু সেকেণ্ড থার্ড যদি ফাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে চায়—কি ব্যাপার? তখন ওর সুর পালটে যায়—আরে, ও বাগারগুলো চিরদিনই বিদ্রোহ কবে আসছে, বাকি দিনও করবে। ওসব কুকুরের হট-টেম্পার কোম্পানির দেখলে কি চলে?

নীচে ফোকশালে ঢুকে শেখব দেখল মোবারক ঘুমোয় নি। কম্বলের ফাঁকে পিট পিট করে চেয়ে আছে। শেখরকে দেখছে। শেখর নিজের বাঙ্কের উপর বসে বাঙ্কেতে হেলান দিয়ে বলল, কি বে ঘুম আসছে না? লিলি নিশ্চয়ই চোখে জেগে আছে?

শরীর থেকে দু হাতে কম্বলটা ঠেলে দিল মোবারক। উঠে বসল বাঙ্কে। তারপব চোখদুটোর উপর বিনীত প্রলেপ ঠেলে দিয়ে বলল—সমুদ্রমানুষদের জীবনটাই ঝড আর জলে‍র মধ্যে শেখর। লিলির মত মেযেরা সে ঝড আর জলের কাছে কতটুকু? চোখের ঘুমটাকে লিলির মত মেয়েরা কেডে নেয় না, কেড়ে নেয় জীবনের ক্ষুদ্র সংস্কার, ক্ষুদ্র গুণাহ্‌। লিলি যদি সাধারণ ওক্ আর পাইনেব তলায় নিশীথের বন্দর-অভিসারিকার মত আসত, তাহলে কোন অনুশোচনাই ছিল না। কিন্তু সে এসেছে আমার জীবনের একটা বিশেষ দিক নিয়ে, সমাজের বুকে বাস করতে গেলেও যে দিকটা অত্যন্ত ক্ষতিকর, অত্যন্ত গুণাহ্‌গার। আর সমুদ্রের বুকে—বন্দরে · বন্দরে। আর ভাবতে পারি না শেখর। দোজ্‌খেও বুঝি আমার স্থান হবে না। খোদা হাফেজ!

মুহূর্তের ভিতর শেখর স্তব্ধ হয়ে গেল। নির্বাক হয়ে থাকল। খোদা হাফেজ বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখল মোবারকের চোখ থেকে ঝর ঝর করে নোনা জল ঝরছে।

—আমার গুণাহ্‌ হাজার গুণাহ্‌ শেখর। বাপজীর গুণাহ্‌ অনেক কম। আরো কম।

শেখর বালিশ টেনে বালিশের ওপর দুটো কনুই ভর করে একটু সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, আমার কিন্তু মোবারক সমুদ্রের ঝড় জলটাকেই বেশী ঠেকছে। আগওয়ালার কঠোর পরিশ্রমকে ভয় পেয়েছি। মন আমার দেশের জন্য কাঁদে। রাতে শুয়ে শুয়ে দেশের কত বিচিত্র কথা ভাবি। কত কল্পলোকের কল্পনা করি।

—ওটা বেশীদিন থাকে না। দু-চার সফর বাদে নূতন নাবিক-জীবনে সমুদ্র আর জাহাজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তখন দেখবি আমার নাবিক-বংশের ইতিহাসের মত তোর ইতিহাসের ধীরে ধীরে একটা বিকৃত দিকের ভিত্তি স্থাপন করছে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরে, সব নাবিকেব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাই বুঝেছি। সেখানে সমুদ্রের ঝড জল নয়, দেশের আম-জাম-নারকেল ছায়ার স্বপ্ন নয়, পচা গোস্তের খানাপিনা নিয়ে বিদ্রোহ নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর একটা ক্ষুদ্র আপত্তি নিয়ে। যা কোন দিন ভাবিস নি অথচ নাবিক বলেই এটা অবশ্য পাওনা। যেমন আমাব বাপজী কার্ডিফ বন্দরে ফ্লাওআর গার্লের সঙ্গে যে ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেবাব বাপজীর বিদ্রোহ ঝড-জলের ওপর বা খানাপিনার ওপর নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর। ঘৃণা নিজের দেহটাকে ঘিরে, নিজের ব্যক্তিগত বুদ্ধিটাকে ঘিরে, 'খোদা হাফেজ' করে করে যে গুণাহের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। ঘড়িটা যে কাহিনীর স্বাক্ষী হয়ে মোবারকের হাতে আজও ঝুলছে।

শামীনগড—মোবারকের জন্মভূমি।

শামীনগডের শডক—বাপজীর এগারোটা থেকে বারোটার পরিভ্রমণের পথ।

টিনকাঠের বারান্দায় আম্মাজান উন্মুখ। বাপজীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন। কখন অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেছে মানুষটা—এখনও ফিরছেন না। এখনও আতা-বেড়ার ওপারে শামীনগড়ের পথে পায়ের শব্দ ওঠছে না। অন্ধকার উঠোনে সেইজন্য নেমে এলেন আম্মাজান।

আম্মাজানের পায়ের সংলগ্ন হয়ে হাটছে মোবারক। আতাবেড়ার পাশে এসে হঠাৎ দুজনই থামল। দুজনই আতাবেডার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল—ক্রমশঃ একটি শব্দ শামীনগড়ের সড়ক ধরে তেঁতুল তলার অন্ধকার পার হয়ে গ্রাম্য পথের দিকে ওঠে আসছে কি-না।

অনেকক্ষণ হল রোমান ক্যাথলিক চার্চে বারোটা বাজার শব্দ উঠেছে। কিন্তু বাপজী ফিরছেন না বলে আতাবেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন আম্মাজান। সড়কের

ওপারে অশ্বত্থগাছের নীচে মসজিদ থেকে আজান ওঠছে তখন। আর সেই ছন্দোবদ্ধ জ্যোতির্ময় সুরের সঙ্গে পায়ের আওয়াজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

আম্মাজানের উন্মুখ মন স্বাভাবিক হয়ে এল।

মোবারক ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বললেন, চল ঘরে চল। তোর বাপজী ফিরছেন।

উঠোন পার হয়ে এল তারা। তারপর বারান্দায়। বারান্দায় ওঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন আম্মাজান। মোবারক ঘরের ভিতর ঢুকে তক্তপোষের উপর আলোয়ান জড়িয়ে বসে থাকল।

বাপজীও ঘরের আলো লক্ষ্য করে বারান্দায় ওঠে আসলেন। মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন আম্মাজানের। আম্মা নির্বাক। বাপজীর চোখে বিস্ময়!—তুই বিবি এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? বলেছি তো বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরব। শুয়ে থাকলেই পারতি। খোদা হাফেজ! ভিতরে চল, হুঃ হুঃ ভিতরে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব এখন।

চৌকাঠ থেকে নড়লেন না আম্মাজান। কোন আওয়াজ করলেন না তিনি। এক ফাঁকে বাপজী ঘরের ভিতর ঢুকে কুলুঙ্গী থেকে নিলেন কুপিটা। ডালা খুলে পেটির ভিতর সযত্নে রাখলেন ঘড়িটা। সহজ হয়ে দাড়ালেন এবং আবার চীৎকার করে ডাকলেন, খোদা হাফেজ! তারপর বারান্দার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলেন, ঘরে আয় বিবি। আয় না! আমার উপর রাগ করলি তুই। রাগ করবি। রাগ করার অধিকার তোর আছে। মবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, মবু তুই ডাক না তোর আম্মাকে। ভিতরে আসতে বল।

মবু ডাকল, আম্মা ভিতরে এস।

কিন্তু আম্মাজান যখন ভিতরে ঢুকলেন তখন বাপ আর বেটা বুঝলে তিনি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। ভেজা-ভেজা চোখদুটো তখনও তার সাক্ষী হয়ে কুপির আলোতে জল জল করছে। বাপজী তার বলিষ্ঠ বুকে দুটো হাত জড়িয়ে রাখলেন। বললেন, বিবি তুই কাঁদলি! কিন্তু আমি যে দিনরাত ধরে মনের ভিতর কেঁদে চলেছি সে তো তুই দেখতে পেলি না!

আম্মাজান আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলেন। বললেন, কি হয়েছে আপনার? এমন হয়ে গেছেন কেন?

—এমন হয়ে গেছি কেন? বাপজীর চোখে মুখে এক ঝলক খড়ের আগুন যেন দাউ দাউ জলে উঠল। এমন না হয়ে উপায়ই বা কি ছিল! সমুদ্র-পাজরে জাহাজের

পোর্ট-হোল দিয়ে যে বীভৎস চীৎকারটা গলে পড়ে নোনা জলে হারিয়ে গেল, যার সাক্ষী কেউ ছিল না শুধু ঘড়িটা বাদে, যে গুণাহের হাত থেকে বাঁচতে দেশে ছুটে আসতে হল, রাত এগারো থেকে বারোটা খোদা হাফেজ বলতে হল, তবু পোড়-খাওয়া জীবনটা যখন ঝিমিয়ে পড়ল না, অনুতাপ আর অনুশোচনা যখন বেড়ে চলেছে তখন এমন না হয়ে উপায়ই বা ছিল কি ?

বাপজী বললেন, তোকে আমি সব বলব। দুদিন সবুর কর, সময় দে—এমন করে ভেঙ্গে পড়িস না। এত সহজে ভেঙ্গে পড়লে বাকী জীবনটা চলবে কি করে!

আম্মাজান তক্তপোষের কাছে এসে নীল ডুরে শাড়ীর কাঁথাটা ঝেড়ে দিলেন। হাতে কুপিটা নিয়ে বাপজীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপজীও একটু সরে এলেন আম্মাজানের কাছে। মবু ঘুমিয়ে আছে ভেবে আম্মাজানের চকচকে পরিপুষ্ট মুখটা কুপির আলোতে তুলে ধরলেন—নোলক, নাকফুল, বেসর সব একসঙ্গে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছে—ঠোঁট-ওষ্ঠ ঝড়ের পরে পরিষ্কার আকাশের মত। মাসের পর মাস ধরে যে নির্বাক অনভিব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জমে ছিল তাই যেন আজ এই সহসা মধু যামিনীতে আম্মজানের চোখে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাপজীও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাত থেকে কুপিটা পড়ে গেল মাটিতে। আলো গেল নিভে। উত্তপ্ত নিশ্বাসগুলো আছাড় খেয়ে পড়ল দেয়ালে দেয়ালে। আর সেই সময় বাপজী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন—খোদা হাফেজ।

শামীনগড়ের সড়ক কর্ণফুলির বাঁওড় পার হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে। মগের মুল্লুকে কোথায় যেয়ে পথটা হারিয়ে গেছে শামীনগড়ের মানুষেরা তার খবর রাখে না। খবর রাখার প্রয়োজন হয় না। বাপজী তাই এই সড়কের হদিস রাখেন মসজিদ পার হয়ে কর্ণফুলির পুল পর্যন্ত। রাত এগারোটা থেকে বারোটা বাপজী মসজিদ পার হয়ে পুল পর্যন্ত হাঁটেন। ফেরেন আবার রাতের অন্ধকারেই। বাড়ীর মসজিদ অতিক্রম করে উঠোনে যেয়ে ঢোকেন। বিবি অপেক্ষা করে থাকে। বিবির চোখ তখন ভার হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে বলেন তিনি, তোকে সব বলব, সময় আসুক, তুই আমায় সময় দে।

এমনি করে প্রতিদিন রাত বারোটার পর ঘড়িটার সঙ্গে বাপজীর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমনি রাত বারোটা বাজার শব্দ মোবারক গভীর আগ্রহের সঙ্গে শোনে। ঠোঁটদুটো তখন ওর শুকনো হয়ে ওঠে। চোখদুটো সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এবং এই বারোটা বাজার আগে সে ডেকে উঠবে। পায়চারী করবে অফিসার গ্যালীর পশ্চিমের বাট পর্যন্ত। বারোটা বাজলে আকাশের দিকে দু হাত প্রসারিত করে মবু সবার অলক্ষ্যে ডাকবে—খোদা হাফেজ। সেই শামীনগড়ের সড়কের বাপজীর মত।

মোবারক বসেছিল ফোঁকশালে—নিজের বাংকে। দু হাঁটু ভেঙে মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল হাঁটুর ভিতর। পাশের বাংকে ঘুমিয়ে রয়েছে শেখর। কেবিনের ও পাশের পথ ধরে কেউ সন্তর্পণে উপরে ওঠে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তেলওয়ালা হবে দু নম্বর পরীর। শেষ বারের মত ওর ওয়াচের তেল স্টিয়ারিং ইঞ্জিনে দিয়ে গেল। ডেকে গেল—যাদের পরবর্তী পরী দিতে হবে তাদের।

পোর্ট-হোল খোলা। কাচের ফাঁক দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। ফুরফুরে হাওয়ায় শেখরের চুল উড়ছে। শেখরের অনাড়ম্বর সরল সহজ মুখের প্রতি চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

মিষ্টি মিষ্টি মুখ—দুনিয়ার সুখের খবরটাই শুধু জানা আছে চোখদুটোয়। সে চোখে সে আম্মাজানকে অনুভব করতে পারে।

সে এখনও বাংকের উপর বসে রয়েছে। ভাবছে অনেক কথা। অনেক কালের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি।

যাদের পরীতে যাবার কথা শেষ রাতে, তারা এক এক করে ওঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। সতর্ক রেখে সে একটু আড়াল দিয়ে বসল সকলের।

ওদের পায়ের শব্দ ক্রুগ্যালীর সামনে মিলিয়ে গেল। ইঞ্জিন-রুম থেকে ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দ কাচের ঘুলঘুলি গলে ফোঁকশালের ভিতর ঢুকছে।

সেই শব্দ সাপের মত বেয়ে বেয়ে ওর শরীরের উপর যেন ওঠে আসছে। কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা। কি যেন ভাবতে ভাবতে চোখদুটো অন্ধকার হয়ে এল। আলো গেল নিভে। আম্মাজান যেন কাঁদছেন আর বলছেন, বাপজী আর ফ্লাওয়ার গার্লের কথা, ঘড়ি আর বাপজীর দোস্ত রহমৎ মিঞার কথা—

১৯৩৫ সালের অনেক টুকরো ঘটনা। যোগ দিলে অনেক হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশনে বাপজী তখছ ছোট ট্যাণ্ডেল্।

ক্লান্ত আর অনেক আপশোসে গুমরে-মরা মনটা চেয়ে থাকল ঘড়িটার প্রতি। উন্মনা হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে গড়াগড়ি খেল মনটা। আম্মাজানের নালিশ শুনল। তিনি বলেছিলেন, তোর বাপজী সে রাতেই চলে গেল।

বে অফ্ বিসকের ঝড় খেয়ে এগিয়ে চলছিল জাহাজ—বাপজীর জাহাজ, বাপজী সে জাহাজে ছোট ট্যাণ্ডেল্।

বাপজী আর রহমৎ মিঞা থাকতেন এক ফোঁকশালে—পাশাপাশি বাংকে। জাহাজের তিনি ডংকীম্যান। কলকাতা বন্দরেই প্রথম পরিচয় এবং একটা সম্পর্কও

কি করে যেন দুজনের ভিতর বের হয়ে পড়েছিল। তারপর দুজন সালাম আলাইকুম আর ওয়ালেকুম সালামের ভিতর প্রথম পরিচয় থেকে ভাইসাব আর মিঞাসাব পর্যন্ত উঠেছিলেন।

ঝড়ের দরিয়ায় পোর্টহোল খোলা চলে না। ঝড়ের দরিয়ায় দুস্তি রাখাটাও ভয়ানক ব্যাপার। কেউ কাউকে সামলাতে পারে না। নিজেকে নিজে সামলাও, নিজেকে নিজে বাঁচাও। তবু যখন অত্যন্ত দেওয়ানীর জন্য বাংক থেকে উঠতে পারছিলেন না রহমৎ মিঞা, লকার থেকে খাবার তুলে এনে খেতে পারছিলেন না তখন বাপজী ধরে ধরে সব সাহায্য করেছিলেন। পেট ভরে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন দোস্তকে। গোটা সফর ধরে এমন করেই চালিয়ে এনেছেন—এমন করে দোস্তকে বিপদে-আপদে আগলে এসেছেন।

চিটাগাং আর নোয়াখালীর জাহাজীরা বে অফ্ বিসকে-কে বলে বয়া বিস্কুট। তারা আগে থেকেই জানে এখানে এলে ঝড় উঠবে—দুলবে জাহাজটা অত্যধিক। দুলে দুলে টানেল পথ চলতে হবে—ডেকপথে ইঞ্জিন-রুমে যাওয়া যাবে না। সুতরাং বাপজী অনেক তরিবত করে বুঝিয়েছিলেন দোস্তকে—আপনি দেওয়ানী ওঠলে কেন যে নোনাপানী খান না বুঝি না মিঞাসাব।

কম্বল ঠেলে কোনরকমে উঠে বসেন রহমৎ। বলেন, মেজাজে না ধরলে কি করি বলেন ভাইসাব।

বয়া বিস্কুটে ঝড় উঠবে জেনেই বাপজী কিছু কমলালেবু বেশী করে কিনে চিফ্-স্টুয়ার্টের কাছে জিম্মা রেখে ছিলেন রেফ্রিজিরেটারে রাখার জন্য। তিনি কিছু কমলালেবু ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন।

হাল্কা শীর্ণ চেহারা রহমৎ মিঞার। কাজ করে গোটা জীবন আর গোটা সফর ধরে কেবল টাকাই জমিয়েছেন একবার তাকিয়ে দেখেন নি কেমন হালত হয়েছে শরীরের। বাপজীর করুণা দোস্তের উপর ঐ দেহ দেখে। বলেছিলেন সেজন্য, গোটা সফরটা কাটাবেন কি করে ?

তিনি কমলার কোয়া ছাড়িয়ে দিলেন দোস্তকে। শরবৎ করে দিলেন। পেট ভরে খেতে দিলেন রুটি। কতকটা নোনাপানী চেখে বললেন, খেয়ে ফেলুন, শরীরটা হাল্কা হবে।

এক সকালে দরিয়ার বুক থেকে ঝড় বিদায় নিল। স্থির হয়ে এল সমুদ্র-ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউয়ে এখন ছোট ছোট পারপয়েজ মাছ। তারা ঢেউয়ের রূপালী পর্দায় খেলছে। সামনের ডেকে বাপজী হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সেখানে চার-টনী

ড্যারীকটা ভেঙ্গে পড়ে আছে। ঝড়ের বীভৎস গতির আঁচটা এতক্ষণে যেন আঁচ করতে পারলেন। ফোঁকশালে ফিরে এসে বললেন—আল্লার মেহেরবানী খুব মিঞা-সাব, জাহাজটা এ দফে আমাদের বেঁচে গেল।

এ দফে বেঁচে গেল বলেই কার্ডিফ বন্দরের এক সোনালী সকালে জাহাজটা এসে ভিড়ল। বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর রয়েছে লাইট-হাউস—আলো ফেলছিল রাতে।

জাহাজটা তখন নোঙ্গর করা। বাপজী মিঞাসাব তখন জাহাজ-ডেকে। লাইট-হাউসের আলোতে বার বার দুজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল।

কিন্তু এই সোনালী সকালে লাইট-হাউসের ঘরে আর আলো জ্বলছে না। রাতের উদ্দামতা ভোরের আলোয় সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাই লাইট-হাউসটা পাহাড়ের উপর শুধু মঠের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যেমন বাপজী এসেছিলেন এ বন্দরে, রহমৎ মিঞাও তেমনি এ বন্দরে দু বার এসে, কার্ডিফের রাউদ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং তার পাশের অপ্রশস্ত গলি, আর সেইজৎ মেয়েমানুষ সব দেখে গিয়েছিলেন। তিনি ড্রাই ডকের পাশ দিয়ে অনেক বার হেঁটেছেন, অনেকবার মুখস্থও করেছেন সেই অপ্রশস্ত পথটা। তখনকার দিনে মেয়ে-মানুষগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত ওদের জন্য। এদের দেশে এই নাকি রীতি।

ভাইসাব আর মিঞাসাব দুজনে মিলে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। বন্দর আর শহরের ভগ্নাংশ দেখলেন। পুরানো স্মৃতি দু-একটা দুজনেরই মনে ভেসে উঠেছিল। কোন তেলওয়ালা রাতের অন্ধকারে জাহাজ থেকে পালাতে গিয়ে স্থানীয় হাতে ধরা পড়েছিল সে খবর জমাট হাসিতেই দোস্তকে দিলেন বাপজী। রহমৎ মিঞা দেখছেন তখন নীচের বীটে হাসিল কতখানি টেনে বাধা হচ্ছে। তারপর চোখ গেল আরো দূরে—অনেক দূরে, সেই অপ্রশস্ত পথ, ড্রাই ডক, পাশের ডকে যুদ্ধ জাহাজ। কিছুটা গেলে বাঁ দিকটায় কয়লার জেটি।

জাহাজ হোমে এলে একবার ড্রাই-ডক করা হয়। একবার সরফাই করা হয়। সরফাই করে দেখা হয় জাহাজটা আর সমুদ্রের ঢেউ কত দিন ভাঙ্গতে পারবে, বয়লারটা কতকাল আর নির্দিষ্ট স্টীম দিতে পারবে। সব দেখে একসময় এ জাহাজেরও রিপোর্ট গেল কোম্পানির ঘরে—জাহাজের মেরামত অনেক। বীট, প্লেট, একযষ্ট পাইপ থেকে ট্যাংকটপের উপর স্কাম বক্সটা পর্যন্ত। অর্থাৎ জাহাজটাকে ঘাটে অনেক দিন বসতে হবে।

তখনও সকাল হয় নি ভাল করে। ইংলিশ চ্যানেল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া সমস্ত

রাত ধরে বাক্সিয়াড়ী ভেঙে আছড়ে পড়ছে বন্দরটায়। কুয়াশা কিছু নেমেছিল, কিন্তু কেমন করে আবার তারা সমুদ্রের আর-এক দিগন্তে ভেসে গেছে। কার্ডিফ ক্যাসেল থেকে যে বাসটা বন্দরে আসে সে বাসটা পর্যন্ত আসে নি। মাত্র ধোবি মেয়েটা গাধার পিঠে কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে ইনডাস্ট্রিয়েল ড্রাই ডকের পাড় ধরে সামনের মাঠটার প্রতি এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ই কাঠের সিঁড়ি ধরে জেটিতে নেমেছিলেন বাপজী রহমৎ মিঞা এবং জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা। মাথায় মোট-ঘাট, হাতে তাদের পেতলের বদনা। গ্রীষ্মের সকাল—শীত কম। তবু জাহাজীরা মাথায় সকলে মাফলার এঁটে নিয়েছিল। একমাত্র বাপজী এবং বাপজীর অনুরোধে রহমৎ মিঞা মাথায় কেন্ট ক্যাপ টেনে বন্দরে নেমেছিলেন।

জেটিতে নেমে তিনি প্রথমেই দোস্তের হাত ধরে বললেন, সালাম আলাইকুম মিঞাসাহেব।

ওয়ালেকুম সালাম। সরাইখানায় গিয়ে খবর-টবর নেবেন।

—নসীব খারাপ।

—নসীব জবর খারাপ। নয় তো আপনি আর আমি দু সরাইখানায় পড়ব কেন।

কিন্তু কোম্পানির নির্দেশ তো আর খেলাপ করা চলে না। কোম্পানীর নির্দেশেই জাহাজীদের দুটো ভাগ হয়েছে। দুটো সরাইখানা ভাড়া হয়েছে ওদের থাকার জন্য।

মালপত্র কোম্পানির মোটরে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। বাপজী আর রহমৎ মিঞা অন্যান্য জাহাজীদের সঙ্গে ধোবি মাঠ পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন। যাঁরা কার্ডিফ ক্যাসেল পার হয়ে রেলপুলটার নীচের সরাইখানায় যাবেন তাঁরা পথের মোড়টায় এসে থামলেন। এখান থেকেই বাসে উঠতে হবে তাঁদের। সেজন্য বাপজী বাস স্টপেজে ওদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। কারণ এ দলে রয়েছে রহমৎ মিঞা। ভাবলেন, রহমৎ মিঞাকে বাসে তুলে দিয়ে তারপর তিনি ধোবি মাঠ অতিক্রম করবেন। ধোবি মাঠ অতিক্রম করেই তাঁদের সরাইখানা।

বাপজীর সঙ্গের জাহাজীরা তখন হেঁটে চলেছে সরাইখানাটার দিকে। বাপজী শুধু বাস স্ট্যাণ্ডে বন্দরের কালো সর্পিল পথটার উপর অপেক্ষা করেছিলেন রহমৎ মিঞা যতক্ষণ না বাসে উঠলেন এবং চলে গেলেন। বিদায়বেলায় দু হাত উপরে তুলে সালাম জানিয়েছিলেন বাপজী। শেষে একান্ত আনমনে যখন বন্দরের রুপালী সকাল অতিক্রম করছিলেন মাঠ পার হতে তখন দেখলেন বালুবেলার পথ ধরে একটি মাত্র ধোবি মেয়ে। গাধার পিঠে এক গাদা কাপড়। হেট হেট করছে—আর পিট পিট করে চাইছে মাঠের উপরে মানুষগুলোর দিকে। তাকে দেখে বাপজী ভাবছিলেন

আম্মাজানকে, বেটা মবুকে, কাঞ্চনের ডালকে। কাঞ্চন গাছটায় এখনও হয়তো ফুল ফুটেছে।

রাত্রি বেলায় বেটা আর বিবির কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কখন সকাল হল তিনি যেন সেদিন টের করতে পারেন নি। বাপজী ওয়াল ক্লকটার দিকে চোখ তুলে দেখছিলেন ক'টা বাজে। রহমৎ মিঞার সরাইখানাটা একবার ঘুরে এলে হত। মনটা যেন দোস্তের জন্য কেমন কেমন করছে! এক ফোঁকশালে থাকার অভ্যাসের ফল।

কি ভেবে এক সময় পাশের জানালাটায় চোখ তুলে দিলেন। কমার্শিয়াল ড্রাই-ডক পার হয়ে সাদা বর্ডারের জাহাজের কালো চিমনিটা আকাশমুখো হয়ে আছে। ইনডাস্ট্রিয়েল ড্রাই-ডকে রং সারা হচ্ছে যুদ্ধের জাহাজগুলোর। বন্দর ধরে কিছুটা দক্ষিণমুখো গেলে কয়লার জেটি—বাংকার নেওয়া হচ্ছে দুটো জাহাজে। বালুবেলা ধরে একটি মেয়ে এ দিকেই উঠে আসছে—এই পথে। ধোবি মেয়েটা বুঝি। প্রতি ভোরের পুনরাবৃত্তি।

হাতের কনুয়ে ঝুলছে ঝুড়ি। মেয়েটি আসছে এ দিকেই। এই সরাইখানাতেই। বাপজী তার ভুল বুঝতে পারলেন—কারণ মেয়েটা এতক্ষণে তার গাধা নিয়ে শহরমুখো চলেছে। এত দেশ এতবার ঘুরেও তিনি যেন বিদেশী মানুষদের চেহারার তফাৎটা ধরতে পারেন না।

শামীনগড়ের কথা ভেবে বাপজী আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটি গুঞ্জন উঠেছে তখন সরাইখানার সদর দরজায়। সেখানটায় ভিড় জমিয়েছে সব নাবিকেরা। একমাত্র বাপজী দেয়ালে ঠেস দিয়ে তখনও উন্মনা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে কিছুদিন থেকেই আবার শামীনগড়কে ভাবতে শুরু করেছেন। জাহাজের ডেক দরিয়ার নীল লোনা জল একঘেঁয়ে লাগছে। জল আর মাটির সব বৈচিত্র্য টিন কাঠের ঘরের কাছে হার মেনেছে। আবার তিনি ফিরে যেতে চান দেশে, বিবি আর মবুর বুকে মুখ লুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চান কিছুদিন।

সদর দরজার গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে এদিকে সরে আসছে।

বাপজী চোখ তুলে দেখলেন, নাবিকেরা সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে গুঞ্জন তুলেছে।

জাহাজীরা কেউ কেউ মেয়েটির ঝুড়ি থেকে ফুল তুলে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের গুচ্ছগুলো দেখতে দেখতে অনর্থক প্রশ্ন করলে অনেকে, কিন্তু দু-শিলিং দিয়ে কেউ একগুচ্ছ কিনে নিলে না।

মেয়েটি সরাইখানায় এসেছে ফুল বিক্রি করতে। ভোরের রোদ গায়ে মেখে

প্রতিদিন শহরের পাড়ায় পাড়ায় ফুল বিক্রি করতে বের হয়। আজ এসে গেছে বন্দরে, ঢুকে গেছে সরাইখানায়। নতুন মানুষের মুখ দেখে কৌতুক অনুভব করছে।

সরাইখানার দীর্ঘ মেঝের উপর দু সারিতে রাখা অনেক লোহার চিক। ফাঁক দিয়ে সবলরেখার মত একটি সংকীর্ণ পথ অন্য প্রান্তের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। পথের বাঁ পাশটা থেমেছে বাপজীর টেবিলের পায়ায় ছোট গোল চাকতিগুলোতে। সেই পথ ধরে আসছে মেয়েটা। সচকিত ভাব ওর চোখে মুখে। অন্য জাহাজীরা তার পিছনে। মেয়েটা সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে বলে ওরা খিল খিল করে হাসছে।

হাতের ইশারায় বাপজী ফ্লাওয়ার-গার্লকে ডাকলেন। অন্যান্য জাহাজী বন্ধুর আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মেয়েটি গরীব, ফুল বিক্রি করে সংসার চালায়। ফুলগুলি নিয়ে দেখি দেখি করে না দেখার ইচ্ছা ও না-কেনার ইচ্ছাকে আর তাদের অসভ্য ইঙ্গিতগুলিকে তিনি বরদাস্ত করতে পরেলেন না। তাই হাত তুলে ডাকলেন এবং কাছে এলে ঝুড়ি থেকে একগুচ্ছ ব্ল্যাক-প্রিন্স নিয়ে দাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন—কত ?

বাপজীর টেবিল ঘেঁসে সন্তর্পণে দাঁড়াল মেয়েটি। ব্ল্যাক-প্রিন্সের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ যেন দামের কথা চিন্তা করলে—কত দাম হতে পারে, কত দাম দিলে দুজনের কেউ ঠকবে না। তারপর বাপজীর প্রতি নরম নরম দুটো চোখ তুলে অকুণ্ঠ গলায় জবাব দিল—দু বব্‌।

দু বব্‌। এত কম ! বাপজী খুশী হলেন। দুটো বব্‌ মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন।

জাহাজীদের দিকে মুখ তুলে মেয়েটি হাত পেতে দুটো বব্‌ নিল এবং খুশী মুখে বাপজীকে অভিবাদন জানাল। তারপর এক অদ্ভুত নাচের ভঙ্গীতে ঘর থেকে বের হয়ে সদর দরজাটায় দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল নীচের পথের জনতাকে। শেষে বাঁ পাশের মদের দোকানটা অতিক্রম করে একটা সরু গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই গেল সরাইখানায় প্রথম রাত যাপনের পর প্রথম সকালের খবর। বিকেলে বাপজী একবার ভাবলেন—রহমৎ মিঞার সরাইখানায় যাবেন। মিঞা সাবের দিন বিলেতের হাওয়ায় কেমন গুজরান হচ্ছে দেখে আসবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না। সারেং সাব ডেকে পাঠিয়েছেন—একবার জাহাজে যেতে হবে। অন্ততঃ কয়েকটি রাতের জন্য একটি বয়লার চালু রাখতে হবে। সেজন্য বিকেলে গেলেন বাপজী জাহাজে, দুজন আগওয়ালা গেলেন সঙ্গে। ওদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে রাতেই তিনি ফিরেছিলেন সরাইখানায়।

পরদিন সকালে তেমনি নেচে নেচে এল মেয়েটি। ফুল বিক্রি করতে এসেছে ফুলওয়ালী। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে—ফুল চাই।

জাহাজীরা যে যার চকি থেকে উঁকি মারছে জানালা দিয়ে। কেউ কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজাটা পর্যন্ত গেছে। কিছু কিছু ফুল তারা হাতে তুলে নিয়ে গতকালের মত বলেছে, তোমার ফুল ভাল নয়।

বাপজী চকি থেকে ওঠেন নি। দেয়াল ঘেঁসে বসেছিলেন, বসেই থাকলেন! জানালা দিয়ে দেখছিলেন তিনি তখন অনেক দূরের একটি দেশ। সে দেশে তাঁর বেটা আর বিবি থাকে। বন্দরের কালো পিচ-ঢালা পথে যে মেয়েটি আসে এবং সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়—ফুল চাই, তাকে ভাবতে গিয়েই কেমন করে তিনি যেন আম্মাজানের কাছে চলে যান। আম্মাজানের দুটো ডাগর চোখের কথা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবেন!

মেয়েটি তখন সদর দরজা ধরে বাপজীর টেবিলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে তার এক কথা—ফুল চাই, ফুল দেব।

বাপজীর মুখ তুলে দেখলেন ফুলকন্যাকে। ফুলের সবুজ সহজ ছায়া নেমেছে ওর শরীরের আনাচে কানাচে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ গায়ে। মাথায় তার পালকের টুপি। ভিজে ভিজে ঠোঁটদুটোয় চলকে-পড়া হাসি। তাই বিবি আর বেটাকে রেখে-আসা মানুষটি কিছুতেই মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই ফ্লাওয়ার গার্ল টেবিলের পাশে সন্তর্পণে দাঁড়াতেই তিনি পুরো একটি ক্রাউন দিয়ে রেহাই পেলেন।

ফ্লাওয়ার-গার্ল জানে, এ বোয়ান জাহাজী যেন তার নিজের মানুষ। দরদ রয়েছে তার। অন্যান্য জাহাজীর মত নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন না প্রতিদিন। ফুল কিনবেন. ফুল কিনে পয়সা দেবেন।

মেয়েটি আবার চলে গেছে। সদর দরজা পার হয়ে সে সদর রাস্তায় নেমেছে। প্রথম ভোরের মত আজও মদের দোকানটা বাঁ পাশে রেখে একটা সরু গলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। বাপজীর চোখদুটো তখন জানালায়। দৃষ্টি তার অন্যত্র। বন্দরের প্রতি চোখ রেখেছেন তিনি, কত দিনে জাহাজটা মেরামত হবে, কত দিনে বয়া বিস্কুটের ঢেউ ভেঙে জিব্রালটার হয়ে দেশের মাটিতে পৌঁছবে। বেটা আর বিবির জন্য মনটা খুবই উন্মুখ। বিবিকে একটা খত দিতে হবে। মবুর জন্য দোয়া পাঠাতে হবে।

গোলাপটি তিনি হাতে নিলেন। নাকের কাছে নিয়ে গোলাপের গন্ধ নিলেন কি পাপড়িগুলোর ভিতর কোন কীট রয়েছে কিনা পরখ করলেন, বোঝা গেল না। তবু তিনি গোলাপটিকে ধরে রাখলেন দু আঙুলের ডগায় এবং সকলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সমস্ত মুখটিকে পাপড়িগুলোর ভিতর ডুবিয়ে দিতে চাইলেন। নিশ্বাস নিলেন জোরে জোরে। মাসের পর মাস সমুদ্র আর বন্দর দেখে যে দেহটা ঝিমিয়ে পড়েছিল,

সেই দেহে গোলাপের মিষ্টি গন্ধে একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল। জোরে জোরে আরো দুটো শ্বাস টানলেন সেজন্য। এবং এক সময়ে ফুলটিকে বুকের উপর চেপে ধরে পরবর্তী সকালের জন্য অপেক্ষা করলেন।

সকাল এল তেমনি। সমুদ্রের বুক মাড়িয়ে যে মনটা শুকনো হয়ে উঠেছে, যে হৃদয়ের কান্না গুমরে মরছে গোটা দেহটার ভিতরে, সেই মন আর হৃদয় দুটো চোখের উপর ভর দিয়ে ঝুলে আছে জানালায়—একটি সকালের জন্য, একটি ছায়া-শরীরের জন্য। উন্মুখ আর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সে কান্না—বিবির দুটো চোখ, বিবির মত একটি দেহ যার ছায়া-শরীরে, সেই বিদেশিনীর জন্য প্রতীক্ষা। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন বাপজী। বাসি গোলাপটি হাতে নিয়েছেন অন্যমনস্কভাবে। চোখের উপর তুলে ধরেছেন—দেখছেন বিবর্ণ রূপটি। জীবন আর যৌবনের বিবর্ণ গন্ধ পাচ্ছেন এখানটায় তিনি।

প্রতি ভোরেই এমন ঘটেছে। বাপজী প্রতীক্ষায় থাকতেন জানালার দুটো গরাদে মুখ রেখে, তাঁর উত্তর ত্রিশের উন্মত্ত যৌবন ফুলের সমারোহের সঙ্গে চলকে-পড়া একঝলক হাসির প্রত্যাশার হিসাব টেনেছে কত বার কত ভাবে, মেয়েটি এই বুঝি এল, এই বুঝি রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দেয়াল ঘেঁসে পা বাড়াল ধোবি মাঠের উপর।

ধোবি মাঠের ঘাসে ঘাসে নীল ফুল। সেই ফুলের উপর পায়ের ছাপ রেখে আসত ফ্লাওয়ার-গার্ল। ঝুড়িটা তখন কনুইয়ে তুলত। ধোবি মাঠের উপর পা রাখার আগে দূর থেকে একবার জানালার দিকে চেয়ে আড়-চোখে অনুভব করত জাহাজী মানুষটির উন্মনা চোখে কি জেগে রয়েছে। তারপর ফুলের বোঁটায় কামড় দিয়ে না দেখি না দেখি করে একসময়ে এসে থেমে পড়ত সরাইখানার সদর দরজায়। হাঁক দিয়ে দিয়ে ঢুকত—ফুল, ফুল চাই।

এ ফুল দেওয়া-নেওয়া বাপজীর আর থামল না। ফুল কিনলেন, মিঠে হাসি দেখলেন এবং একদিন রুজ-লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটে কামনার চিহ্ন দেখতে পেলেন। বাপজী জাহাজী। চরিত্রটা জাহাজীর মত। পাইনের ছায়া-জঙ্গলে একবার ডুব দিতে ইচ্ছা হল। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে প্রথম দিনের প্রথম আলাপ 'দাম কত'র পরে আর যে কোন আলাপই হয় নি। কামনার জ্বালা যতই উপচে পড়ুক—হাজার হলেও যে তিনি ভারতীয়। সুতরাং বলতে পারেন না প্রথম দর্শনেই অন্যান্য দেশের মানুষগুলোর মত—উড ইউ বি প্লিজড্‌......। কারণ সরম বলে একটি ছোট্ট কথা সব সময়ের জন্যই উত্যক্ত করে মারছে। তাছাড়া জাহাজী মানুষের জাহাজটা যেমন নিজের হয় না, চরিত্রটিও সে তেমন নিজের বলে দাবী করতে পারে না। বাইরের

নিয়ন ঝলসানো রঙে সে আনমনা হয়ে পড়বেই—তিনি তখন বাপজীই হোন আর সাধু সন্ত, ফকির দরবেশই হউন। বাপজী সে কথা কসম খেয়ে স্বীকার করেন।

স্বীকার করতেন তিনি সেই অশুভ লগ্নটির কথা। মেয়েটি এল, ফুল রাখল টেবিলে, শেষে হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে সরু গলিটায় ঢুকে গেল। টেবিলের উপর রাখা ছুটো শিলিং সেদিন ফুলকন্যা তুলে নেয় নি। প্রথম বিস্ময় মেনেছিলেন দেখে, পরে কি ভাবতে ভাবতে ভেবেছিলেন মেয়েটি হয়তো ভুল করেছে। কাল যখন আসবে তখন সংশোধন করে দিলেই চলবে। সেই জন্য তিনি আর বিশেষ করে অন্য কিছু ভাবলেন না। শুধু ফুলটি হাতে নিয়ে কি খবর রয়েছে ফুলের গন্ধটায় তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন। এবং একবার রহমৎ মিঞার সরাইখানায় বিকেলে গেলে কেমন হয় সে-কথা চিন্তা করে সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সদর দরজার সিঁড়িটাতে নেমে ভাবলেন, মার্কেটের দিকে যাবেন। কিছু কেনা-কাটা করে ফিরবার পথে ষ্টিওনওয়ের স্টেশনারী দোকানটায় ঢুকে মবু আর আম্মাজানের জন্য কিছু জিনিস পছন্দ করবেন। প্যান্টের পকেটে তিনি হাত রাখলেন, মাথাটা নুইয়ে সংক্ষিপ্ত ছুটো পা ফেললেন, এবং আবার কি মনে করে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল থেকে ফুলটি তুলে নিলেন। তারপব বাজার ফেরত রহমৎ মিঞার সরাইখানায় একবার ঢুকতে হবে। বলতে হবে দোসকে, বুঝলেন, এ ফুল রোজ একটি ফুলওয়ালী দিয়ে যায়। রূপের কথাটাও একবার চেখে চেখে বলবেন—দোস নিশ্চয়ই তোবা তোবা করে ছুটো কানে হাত দেবেন। বলবে, ভাইসাব ঘরে যে আপনার বিবি রয়েছে তার কথাটা মেহেরবানি করে মনে রাখবেন।

মবুর বাপজী তখন নিশ্চয়ই হাসবে। বিবি আর ফুলকন্যা? কোথায় কি! টেম্‌স্‌ আর কর্ণফুলি।

বাপজী প্রতীক্ষা করলেন বাসের জন্য। সামনের পথটার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিন্তু বাঁ পাশের গলিটার দিকে মাঝে মাঝেই চোখছুটোকে টেনে আনছেন—এ পথ ধরে মেয়েটি গেছে। ওর পায়ের শব্দ এখনও যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কান পাতলেন সন্তর্পণে। তারপর বুঝতে পারলেন একসময় ও মেয়ের পায়ের শব্দই ঘরের বাইরে সদর দরজার সিঁড়িটা পর্যন্ত তাকে বের করে এনেছে—ছু কদম পা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

মার্কেটে যাবার বাসটা আসতে দেরী দেখে বাঁ পাশের গলিটায় ঢুকে পড়লেন তিনি। পথটা এখানে মোড় নিয়েছে। মদের দোকানটায় ভীড় নেই। পথ থেকে মনে হচ্ছে দোকানটা বন্ধ। পাশের ঘর থেকে ছুটো ছোট মেয়ে রাস্তাটা অতিক্রম

করে অন্য একটা টালির ছাদ-ঘেরা বাড়ীতে ঢুকে গেল। তিনি চোখ তুলে দেখলেন। খুব আঁকা-বাঁকা পথ। দুকদম আগের মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না। আড়ালে আড়ালে যেন এখানকার মানুষেরা চলে, তিনি তাই আরো এগিয়ে গেলেন।

পথটা এখানে প্রশস্ত। ততটা যেন বাঁক খায়নি। দূরের মানুষ চোখে পড়ে। কাছের মানুষ আরো কাছে আসছে। বাপজী এখানে থামলেন। কিন্তু ফুলকন্যার কোনো চিহ্ন পেলেন না। গলির বাঁকে বাঁকে সে কোথায় হারিয়ে গেছে তখন। তাকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

পরে তিনি ফিরে এসেছিলেন সরাইখানায়। কোথাও বের হন নি বলে দুপুরটা কাটল অস্বস্তিতে। ঘুম এল না। বিছানায় পড়ে শুধু খানিক গড়াগড়ি দিলেন। মনটা ছটফট করছে। কেন এমন হয়! কিছু ফুলের বিনিময়ে রক্ত জল-করা টাকার অযথা খরচটা বিশেষ বিনিময় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আজকের শিলিং টেবিল থেকে তুলে না নেওয়ায় তিনি যেন বুকে ধ্বস নামার তীব্র বেদনা অনুভব করছেন। পাশ ফিরে শুলেন। জানালা দিয়ে চাইলেন আবার। এখন থেকে যুদ্ধ জাহাজগুলোই কেবল চোখে পড়ছে। ইন্‌ডাস্ট্রিয়েল ড্রাই-ডকে দুনম্বর জেটির জাহাজটায় দুজন সাহেব দুটো কামানের মুখে উঁকি দিয়ে ওর ভেতরটা যেন দেখছেন। বাপজী এবার আর একটু ঝুকে দাড়ালেন জানালায়। দেখলেন এবার বেলাভূমি আর কত দূর।

দূরের আকাশটা হঠাৎ মেঘে মেঘে ভার হয়ে এল। কালো ছায়া নেমেছে বেলা-ভূমির কিনারে। যে ঝড়ো হাওয়া আসছিল কিছুদিন আবার সেটা উঠতে শুরু করেছে। একঝলক হাওয়া বেলাভূমি থেকে নেমে জানালায় ঢুকেছে।

বাপজী আরও একটু এগোলেন। চোখদুটোতে ওর কেমন জ্বালা ধরেছে। মেয়েটার কথা মনে হলেই বুকে ধ্বস নামতে শুরু করে।

পাশের ফ্ল্যাটের জাহাজীরা এক এক করে চান শেষ করেছে। বাপজীকে কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, তবিয়ত কি ভাল না মিঞার? কেমন মন-মরা মন-মরা ঠেকছে?

বাপজী কেমন শুকনো হাসি হাসলেন। চোখ টানলেন মিরু শেখের দিকে চেয়ে। লোকটা তক্তপোশে উঠেছে। পা মুছে বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করছে কোরানশরীফটা। এক্ষুনি সে কোরানশরীফ পাঠ করতে বসে যাবে। সুর ধরে ধরে পড়বে। চোখে ঘুম আসতে চাইবে যখন দুপুরের খানা খেয়ে তখনও সে হেলে হেলে পড়বে। তারপর একসময় কখন অন্ধকারে বের হয়ে পড়বে—ফিরবে ঠিক ভোরে।

গলা পর্যন্ত টেনে আসবে। রাতের অন্ধকার আর কানাগলির বেশবাসে বেসামাল হয়ে, ঘরে এসে বিশ্রী ঢেঁকুর তুলবে।

বাপজী একবার গলাটা বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কি মনে করে কচ্ছপের মত গলাটা টেনে নিলেন আবার। একটি প্রশ্ন রয়েছে মনে। ওকে প্রশ্ন করে জানতে হয় কিছু—কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না। কি ভেবে শেষ পর্যন্ত চান করতে চলে গেলেন। একসঙ্গে খানা খাওয়ার কথা, পরে গেলে খানা মিলবে না।

খানা খাওয়ার পর তিনি বালিস টেনে শুয়ে পড়লেন। জাহাজের মেরামত এখনও হয় নি। ট্যাংক টপের প্লেটগুলো বদল করা হচ্ছে কারণ ছাই আর নোনা জলে প্লেটগুলো আর প্লেট নেই। প্লেটের রিবিট মারতে আরো প্রায় দশ দিন। জাহাজের মেজ সাব সে কথা বলেছেন। দশ দিন পর এ মাটি এ ঘাট ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। আবার হয়তো কত কাল বাদে। হয়তো সহস্র রজনী পরে তিনি তাঁর জাহাজ এ ঘাটে বাঁধবেন। তখন হয়তো ফুলকন্যার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিংবা যেমন করে প্রতি সকালে হেসে একটি ফুল দিয়ে যায় সে সকালে তা আর নাও দিতে পাবে।

আর মাত্র দশ দিন। কথাটাকে তিনি অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবলেন। ভাবলেন সমুদ্রের উপর প্রতি সকালের প্রতীক্ষাগুলো জাহাজের ঘুলঘুলি-ভরা জীবনের কাঁচগুলোতে ধাক্কা খেয়ে নিজের বাংকেই বার বার ফিরে আসবে। সমুদ্রের ঢেউগুলো কাঁচের জানালায় ধাকা মেরে হয়তো তাঁকে বার বার ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে—তবু সেই মিষ্টিমুখ আর ব্ল্যাকপ্রিন্সের রাজত্বকে তিনি যেন ভুলতে পারবেন না।

তিনি ভুলতে পারবেন না বলেই বুঝি সে দিনের দুপুরটায় ঘুম যেতে পারলেন না। বিকেলে তিনি সময় করে গেলেন কার্ডিফ ক্যাসেলের গা-ঘেঁষা রেলওয়ে ব্রীজের নীচের সরাইখানায়। দোসকে খবরটা না দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

যখন গেলেন—কার্ডিফ ক্যাসেলের কিনারে তখন হিমেল সন্ধ্যা নেমেছে। আলোর ফুলকি জ্বলছে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘরগুলোতে। বাপজীর তখন শীত শীত করছে। কোট টেনে তিনি ক্যাসেল-ঘেঁষা ফুটপাতে নেমে পড়লেন। উঁচু পাঁচিলটার দিকে চেয়ে ক্যাসেল ডাইনে ফেলে সামনের কটন স্ট্রীটে সংক্ষিপ্ত পা চালিয়ে দিলেন।

রাজা-বাদশার এ দেশ। এ মাটিতে রাজা-বাদশার গন্ধ। কত রাজা-বাদশা এ মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের রাজত্বে কতকাল ধরে সূর্যাস্ত যায় না—আঙুল গুণে গুণে হিসেব করতে চাইলেন যেন সব কিছু। সেই সুবাস রয়েছে ভোরে যে মেয়েটি আসে, হাসে, কথা বলে, ফুল দিয়ে দাম না নিয়ে চলে যায় সেই মেয়েটির শরীরে। বিবিকে যদি একথা যেয়ে বলতে পারে, বিবি হয়তো চোখের জল ফেলবে,

বলবে, ডাইনী! তবু মনের কোন এক প্রত্যন্তে বিবি বাপজীকে করুণা করতে করতে ভাববে—রাজা-বাদশার দেশের মেয়ে তার খসমকে পিয়ার করেছে। সে কম কথা নয়, সে অনেক কথা বিবির কাছে।

বাপজী কিন্তু রেলওয়ে ব্রীজের নীচের সরাইখানায় যেয়ে মিঞাকে পেলেন না। অন্যান্য জাহাজী ভাইদের প্রশ্ন করলেন সে-জন্য। তাদের কাছেই জানতে পারলেন, মিঞাজান গেছেন লিটন স্ট্রীটের এক বাড়ীতে। এক মেমসাব এসে নিয়ে গেছে।

খবর শুনে প্রীত হলেন কি দুঃখ পেলেন কার্ডিফ ক্যাসেলের পাঁচিল-ঘেঁষা রাতটা মাত্র তার সাক্ষী থাকল।

দুটো চোখ আর-একটি জানালা। একটি মাঠ আর তার নীলাভ ফুল। একটি ভোর আর-একটি মেয়ের জন্য একটি মানুষের প্রতীক্ষা। এই নিয়ে কার্ডিফ বন্দরের এক কোণে প্রতিদিনের একটি সকাল বেশ জমে উঠেছে।

কোনদিন প্রথম ধুবি মেয়েটি সে তার গাধাটাকে তাড়াতে তাড়াতে চলে যেত, কোনদিন ফুলকন্যা ঝুড়িটা হাতে প্রথম ধুবি মাঠটাকে অতিক্রম করে সরাইখানার সদর দরজায় এসে হাঁক দিত। সেই সকালে প্রথম এসেছিল ফুলকন্যা এবং বাপজী ইচ্ছা করেই জানালায় মুখ না রেখে অন্য দিকে দুটো চোখ তুলে বসেছিলেন। মনে মনে তিনি রাগ করেছেন। মেয়েটির সঙ্গে আজ মনকষা-কষি হবে। পর পর দু সকালে ফুল রেখে দাম না নিয়ে চলে যাওয়াটাকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকেন। হেসে যখন মেয়েটি তার স্পষ্ট সহজ ইংরেজীতে অভিবাদন করল তখন তিনি হেসে ফেললেন, তারপর কি ভেবে চুপ হয়ে যান—কিছু বলতে পারেন না—রাতের সব কল্পনাগুলো ঠোঁটের গোড়ায় এসে থেমে থাকে।

মেয়েটি সে তার সহজ ভঙ্গিতে প্রতি সকালের মত টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। ঝুড়ি থেকে দুটো ফুলের গুচ্ছ সন্তর্পণে রেখে দিতে দিতে আবার হাসল।

তিনি আর হাসলেন না। এমন কি অন্যান্য দিনের মত লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে কিছু অপ্রকাশের ইচ্ছাও রাখলেন না। বললেন, তিন দিনে ছ শিলিং। এই নাও—বলে শিলিং কটা হাতে দিতে গেলেন।

মেয়েটি টেবিলের উপর চোখ রেখে বলল, না থাক।

—কেন থাকবে?

—কেন থাকবে না?

বাপজী বললেন, দাম যদি নাও তবে ফুল নেব। দাম না নিলে তুমি আর ফুল দিও না।

বাপজীর বাঙালী মন, বাঙালী বুদ্ধি। তিনি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন যেন, কিন্তু মেয়েটির প্রতি চোখ তুলে আর বলতে পারলেন না।

ফুলকন্যা টেবিল থেকে আর-একটু দূরে সরে বললে, বাইরে আসবেন একটু।

এই প্রথম মেয়েটির সঙ্গে বাপজীর কথাপ্রসঙ্গে কথা হল। তিনি তার ডাকে বিমুগ্ধ হলেন। বাইরে বের হলেন গলার টাইটা টানতে টানতে।

গ্রীষ্মের ভোর হলেও শীত শীত করছে বাপজীর। বাইবে বের হয়ে কোটের বোতামগুলো টেনে দিলেন এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে।

ফুলকন্যা চোখের ইশারায় বাপজীকে পথ চলতে বলে .পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল। ওরা তখন বন্দরে পথটা অতিক্রম করে উত্তর দিকের খাড়া পাহাড়টার বেলাভূমিতে নেমে পড়েছে। এখানে এসে বাপজীই প্রথম কথা বললেন, তোমার নাম ?

উত্তর এল লাল লাল দুটো ঠোঁটের ফাঁক থেকে, রেনীল।

—বাঃ! বেশ নাম তো। কতকাল হল এই ফুল বেচে খাওয়া ?

—সে অনেক কাল। ছোট বয়েস থেকে। বাবা মা যখন মারা গেলেন তখন থেকে।

—এই বন্দরে আর একবার আমি এসেছিলাম। খুব অসংলগ্ন কথা বললেন বাপজী।

মেয়েটি উত্তরে বললে, কবে ?

—সে অনেক কাল আগে। জাহাজে তখন আমি কোল বয়ের কাজ করি।

ওরা হাঁটছে। পা [illegible]দের বালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। পা টেনে টেনে হাঁটছে তারা। বাপজী মেয়েটিকে বালির ভিতর থেকে পা টেনে তুলতে মাঝে মাঝে সাহায্য করছেন। অধিকাংশ সময় বাপজীর বলিষ্ঠ হাতটার উপর ভর করে মেয়েটি আলতো-ভাবে হেঁটে চলেছে।

খাড়া পাহাড়ের নীচে এসে ওরা দু জন বসল। বসল দুটো পা সামনের দিকে ছড়িয়ে। পাশের ঝুড়ি থেকে একটি লাল ফুল ছিঁড়ে বাপজীর কালো কোটে পরিয়ে দিয়ে মেয়েটি চেয়ে থাকল সমুদ্র যেখানে পাহাড়ের কিনারে বাঁক খেয়েছে সেদিকে।

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে বালিয়াড়ী থেকে বাপজী চেয়েছিলেন তখন কেমন অন্যমনস্কভাবে। চুলগুলি কপালে জড়িয়ে জড়িয়ে উড়ছে।

রেনীল বললে, তোমার নাম ?

—সৈয়দ মজিবুর রহমান।

—জাহাজে তোমায় কি কাজ করতে হয় ?

—ট্যাণ্ডেলের কাজ। জাহাজের ছোট ট্যাণ্ডল।

—কত কাল ধরে এ কাজ তোমায় করতে হচ্ছে ?

—সে কবে থেকে মনে নেই। তবু মনে আছে বাপজী প্রথম আমায় কলকাতা বন্দরে এনে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন কোল-বয়ের কাজ দিয়ে, সেদিন আমি দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখি নি।

—দেশে তোমার বিবি আছে ?

—হ্যাঁ আছে। বিবি বেটা দুইই আছে।

—কষ্ট হয় না তাদের জন্য ? বিবি জাহাজে আসতে বারণ করে না !

—করে।

সেই ধ্বসটা আবার নামতে শুরু করেছে বাপজীর বুকে। বিবি-বেটার কথা মনে হতেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। জোরে শ্বাস টানলেন। বি-বি—বে-টা! দুটো জীবন। অনেক দূরে থাকা বাপজীর আত্মার আত্মীয়। তারা জানি কেমন আছে ! আল্লাওয়ালা কেমন জানি রেখেছেন !

বাপজীর অন্যমনস্ক দৃষ্টির সঙ্গে রেনীলও দৃষ্টি মিলাল। দৃষ্টি মিলিয়ে সেও দেখছে জাহাজের চিমনীগুলোকে, লাল নীল বর্ডারের বিভিন্ন রঙের ফানেলগুলোকে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত জাহাজ এসেছে। কত জাহাজী এসেছে সঙ্গে। নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে এসেছে তারা। আর রেনীলকে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁক ধরে বেঁচে থাকতে হচ্ছে কতকাল থেকে। ফুল বেচে তার জীবনটা যে কিছুতেই চলছে না। তাই দুমাস আগে আজকের মানুষটির মত ইয়াকুব হোসেনকেও সে এনে এখানটায় বসিয়েছিল—কথা বলেছিল, গান গেয়েছিল, সুর মিলিয়ে মিলিয়ে শিস দিয়েছিল। সে মানুষটা সিঙ্গাপুরের, এ মানুষটি ভারতায়। দুজনের দুটো ধারা।

এ মানুষটি চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। আজকে এই পাহাড়ের নীচে বসে সেজন্য রেনীলের বলতে ভয় হল, একটা গান ধরব। অথবা অনুরোধ করতে সঙ্কুচিত হল, তোমার দেশের একটা গান ধরবে ?

বাপজী হঠাৎ ভয়ঙ্কর মানুষের মত রেনীলের কব্জিটা টিপে ধরলেন। ডাকিলেন—রেনীল ···!

রেনীল চোখ তুলে তাকাল।

বাপজী কিন্তু সেই চোখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। আমতা আমতা করে কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। সব কামনা বাসনা জলে-জলে নিবে গেল। অজ্ঞাতেই হাতটা নিজের কোলের উপর ঢলে পড়ল। এবং কিছুই ঘটে নি এমন ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—চারিদিকে চেয়ে চেয়ে কতকিছু দেখলেন—ছবির মত শহরটা—ছোট বড় কল কারখানা—কয়লার ওয়াগন। তারপর একসময় জামার নীচে হাত নিয়ে অনুভব করলেন তিনি দর দর করে ঘামছেন।

রেনীল সহজভাবেই বলল, তুমি রোজ আসবে এখানটায়। বসব, কথা বলব।

বাপজী গলায় স্প্রিং-টানা পুতুলের মত দু বার ঘাড়টা কাত করে সায় দিলেন মাত্র।

বালির ধ্বস আবার ভাঙ্গতে হচ্ছে দুজনকে। বাপজীর বুকের ভিতর থেকে কথাটাকে কিছুতেই ঠেলে বের করে দিতে পারছে না—রোজ আসবে এখানটায় সকালে। বসব, কথা বলব। কি হবে এখানে এসে বলতে পারলেন না। তিনি শুধু হাঁটলেন আর হাঁটলেন।

মোবারক শুধু ডেকের উপর হেঁটেই গেল। রাত এগারোটা থেকে বারাটা সে ডেক-পথ বার বার অতিক্রম করে। জাহাজের ডেক-জাহাজীরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে বোট-ডেকের উপর শুয়ে থাকে—সমুদ্রের জল দেখে, জলের নীচে ফসফরাসের আবর্তনের ভিতর একটি মুখ দেখার চেষ্টা করে সে তার আম্মাজান। ঘড়ির আবর্তনের ভিতর দেখে বাপজীকে। এখন ও শুনতে পায় সেই চীৎকার সেই ডাক—খোদা হাফেজ। বাপজী দু হাত উপরে তুলে শামীনগড়ের সড়ক ধরে হাঁটছেন। চিৎকার করছেন, খোদা হাফেজ। আম্মাজান বারান্দার উপর কান পেতে রয়েছেন।

শীতের রাত। ঘুম নেই চোখে আম্মাজানের। নীল কাঁথা জড়িয়ে বারান্দায় বসে রয়েছেন। নিবু নিবু হয়ে কুপিটা জ্বলছে। মবু মায়ের কোল ঘেষে উষ্ণ শরীরের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

সামনে উঠোনে অন্ধকার। পাশে দোচালা টিনের ঘরটা। বার-বাড়ীর উঠোনের পরে মসজিদ। তেঁতুল গাছটা আরো দূরে, দুটো ভুতুড়ে পেঁচা সেই কখন থেকে ডাকছে। সঙ্গে উঠোনের অন্ধকারটা হাত বাড়িয়ে টানছে যেন তাদের দুজনকে।

অনেকক্ষণ পর ফিরলেন বাপজী। ক্লান্ত। নির্বাক। সংক্ষিপ্ত পায়ে বারান্দার পৈঠা ধরে ঘরে ঢুকতে চাইলেন। তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। মবু এল পাশে পাশে। বাপজীকে ঘরে ঠেলে দিলেন আম্মাজান। শুইয়ে দিয়ে লেপটা টেনে

দিলেন। কুপটা রাখলেন কুলুঙ্গিতে। মবুর পা-টা মুছিয়ে দিয়ে পাশে শুইয়ে দিলেন এবং শিয়রে বসে রইলেন তিনি।

বাপজী হাত টানলেন আম্মাজানের। বললেন, ঘুমোবি না তুই! কেবল রাগ আর রাগ। কতকাল আর এমন রাগ করে থাকবি বল ত।

গত রাতের কাহিনীটা যা বলতে বলতে বাপজী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার জের টেনে বললেন আম্মাজান, শেষে কি হল?

—কি হবে? যা হবার তাই হল। খুন করলাম।

আম্মাজান সেই শুনে এতটুকু বিস্মিত হলেন না। কুলুঙ্গীতে রাখা দপ-দপ করে জ্বলা কুপিটার প্রতি চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বললেন, কবে? কাকে? কেন?

বাপজী বালিশের নীচ থেকে হাত-ঘড়িটা নিয়ে বিবির চোখের উপর ধরলেন। বললেন, এর জন্য। এই ইবলিশটা আমায় খুন করিয়েছে।

আম্মাজান সে তার নরম ঠাণ্ডা হাতটা বাপজীর কপালে লেপ্টে দিলেন। ঘড়িটার প্রতি চেয়ে থাকলেন তীক্ষ্ণভাবে। ঘড়ির ভিতরের কল কাঁটাকে নুয়ে নুয়ে দেখলেন। বাপজীর দু চোখের উপর মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন,—দাও না ইবলিশটাকে ফেলে দিয়ে আসি।

বাপজী চমকে উঠলেন।—এ কি বলছিস বিবি! এর জন্য এত বড় খুন-খারাপির্ট হল আর তুই বলছিস কি-না দিন ফেলে দিয়ে আসি। অমন কথা আর বলিস না, বলে তিনি পাশ ফিরে শুতে চাইলেন। এবং লেপটা দিয়ে ঢেকে দিলেন মুখটা।

আম্মাজান তখন বললেন, শোনো। লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাপজীর মুখের উপর আবার নুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। শোনো—পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা। কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

—এক গ্লাস পানি দিবি আমায়?

টিনের উপর শীতের কুয়াশা জমেছে। টিপ টিপ শব্দে শিশির ঘরের পাশের কালোজাম গাছটার পাতা থেকে ঝড়ছে। এমন আস্তে কথা বলছিলেন বাপজী, যে শিশিরের শব্দে আম্মাজান সে কথা শুনতে পায় নি।

—কি বললে?

—পানি। পানি দে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

তিনি তক্তপোশ থেকে নামলেন। গা থেকে মেঝের উপর [illegible]লেন নীল কাঁথাটা। তারপর আরো দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে কোণায়-রাখা মেটে কলসী থেকে জল ভরে খসমের দিকে তুলে ধরলেন—নাও।

ঢক ঢক করে এত সহজে জলটা খেয়ে ফেললেন যে আম্মাজান তক্তপোশে বসতে না বসতেই বাপজী গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন আবার—আর-এক গ্লাস।

—আপনার জ্বর আসছে? শীতে যে কাঁপছেন!

—খুব কাঁপছি। না কি—কাঁপছি না তো। বিবি তোর এমন কথা কেন? পানি দিতে বলছি তুই তাই দে। পানি দে। জ্বর আসল কি শীতে কাঁপছি এসব তো তোর দেখার দরকার নেই।

বাপজী সে তার দুটো চোখকে বালিশে ঢেকে আরো একটা কথা ভাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেমন অসহায় ভাবলেন নিজেকে। কিন্তু এ কথা তো বিবিকে বলা যায় না। বিবিও যে ভয়ে তবে কাঁপবে। পাশে মবুটা রয়েছে—ভয় পেয়ে নিশ্চয়ই সে চীৎকার করে উঠবে। তিনি সেজন্য বালিশ থেকে মাথাটা তুলে একটু সহজ হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। বিবির দিকে চেয়ে থাকলেন বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে।—আমি জ্বরে কি শীতে কাঁপছি না রে। বেশ আছি, ভাল আছি। আম্মাজানের হাতের পানিটা ঢক ঢক করে না খেয়ে আস্তে আস্তে খেলেন এবার। তারপর বিবিকে লেপের তলায় টেনে নিয়ে টিন-কাঠের ঘরের টাণ্ডা শীত থেকে উষ্ণ হতে চাইলেন। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, রেনীলটা তোর মতই ছেলেমানুষ ছিল রে বিবি। সারাটা সকাল লাইট-হাউসের নীচে বালিয়াড়ীর বালিতে পা ঢুকিয়ে বসে থাকত। তোর কথা বলত, মবুর কথা বলত। ঘরের আপন জনের মত জাহাজীর নিঃসঙ্গ জীবনটাকে সব দিক থেকে ভরে তোলার চেষ্টা করত। কিন্তু বিবির মত করে ত তাকে পেলাম না। যেমন তোকে পেয়েছি আজকের রাতে, যেমন করে তোকে পেতে চেয়েছি।

বিবির মুখের উপর গড়িয়ে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে দিলেন বাপজী। ভারি ভারি চোখদুটোর প্রতি মুখ নিয়ে তিনি কেমন একটি মিঠে শব্দ করলেন। বললেন, তোর মত কিন্তু রেনীল কথায় কথায় কাঁদতো না। কি করে হেসে জীবনটাকে পার করতে হয় তা জানে।

মবুটা ঘুমোতে পারছে না। ছটফট করছে এপাশ ওপাশ হচ্ছে। বাপজীর মনে হল এই প্রথম—মবুর বয়েস হয়েছে। আলাদা করে ওর জন্য কিংবা ও পাশের তক্তপোশটায় বিছানা করে দিতে বলবে বিবিকে। তিনি ডাকলেন—মবু ঘুমোলি?

কোন উত্তর এল না। চুপ চাপ হয়ে গেছে পাশের ছোট শরীরটা। আম্মাজান আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, ওকে ডেক না। ও ঘুমিয়ে আছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, তারপর কি হল? কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

—কোন কোন দিন বুঝলি বিবি আমি আর রেনীল ফ্রিওন ওয়ে থেকে বিটম স্ট্রীট

ধরে ঘুরে বেড়াতাম। রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিশ্চিন্তে এসে বসতাম লাইট-হাউসের গোড়ায়। গল্প হত সেখানে। তারপর আবার অনেক বেড়ানো, অনেক কথার ফুলঝুরি। ঠিক দুপুর হওয়ার আগে বলত, এবার তাহলে আসি। কাল ঠিক সকালে। কি ফুল আনব বল?

—যে ফুল চেয়েছি সে ফুলই সে সংগ্রহ করে এনেছে। আমার হয়ত ঘুম তখনো ভাঙে নি কিংবা কম্বলের তলায় তোর কথা চিন্তা করছি সে সময় সে আমার মুখের কম্বল টেনে বলেছে, বাপস্ ঘুম বটে একখানা। জাহাজী মানুষের অত ঘুমুতে নেই। কোনদিন গরম পানি আর তোয়ালে ঠিক-ঠাক করে রাখত। সরাইখানাতে দুজন একসঙ্গে চা খেয়ে তারপর বেড়াতে বের হতাম কোনদিন। আবার সেই বিটন স্ট্রীট, স্টীউন ওয়ে, কিংস এ্যাভিনু এবং কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশের প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যেতাম। ফিরে আসতে কোনদিন দুপুর গড়িয়ে যেত। এই ছিল কাজ আর ছিল অনেক অনর্থক এবং অহেতুক কথা—তুই, আমি, মবু, আমার দেশ শামীনগড়।

রেনীলকে এক দুপুরে বললাম, মবুর জন্য কিছু কিনতে হয়। বিবির জন্যও কিছু। সেই শুনে রেনীল অত্যন্ত খুসী হল। বললে, চল না আমি পছন্দ করে কিনব। স্টিওন ওয়ের লীডস্‌লের দোকানে সব পাবে। যা চাও, পাবে?

আমি শুনে খুসী হলাম, সে বলে খুসী হল। এবং দুজনে সেই দুপুরেই বন্দর থেকে বাস ধরে স্টীউন ওয়ের ভিতর ঢুকে গেলাম। সামনের থিয়েটার হলটা পার হয়ে বাঁদিকের একটা বাঁক ঘুরে একসিলেটরে মাটির নীচে নেমে গেলাম। মাটির নীচে যেন আর একটা শহর। রেনীল আমার হাত ধরে প্রথমে একবার সব দোকানটা ঘুরিয়ে দেখাল। কোথায় কি পাওয়া যায়, দাম কত হতে পারে বিবির জন্য কি মানাবে ভাল, মবুর বয়েস কত—দেখতে কেমন, কি জিনিস ওর পছন্দ, সব সো-কেস দেখতে দেখতে জেনে নিল।

তারপর কেনা কাটা। সে কিনল পছন্দ করে তোর আর আমার জন্য। আমার কাছে তোর আর মবুর গল্প শুনে শুনে ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। সে কিনে কিনে একবার শুধু বলত—বেশ মানাবে মবুকে, বেশ মানাবে ভাল বিবিকে। আমি খুসী খুসী হয়ে বলেছি, খুব পছন্দ হবে ওদের। তোমার কথা বিবিকে বলব। সে শুনে খুব খুসী হবে।

দোকানটা খুবই বড়। আমরা একসিলেটরে নীচে নেমে গিয়েছিলাম, এবং সব দেখে ও কিনে আসতে প্রায় চারঘণ্টার মত সময় লেগেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠছে। এমন সময় রেনীল দোকানে ঢোকার মুখের দরজায়

ঘড়ির সো-কেসটার সামনে থমকে দাঁড়াল। আমার প্রতি চেয়ে বললে, ঘড়ির এ রকমটা বেশ।

—ঘড়িটা ছোট। সো-কেসের এক কোণায় ভালমানুষের মত যেন চুপ করে বসে আছে এবং কতকাল থেকে দর্শকদের নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন করে খুব সন্তর্পণে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। গায়ে ঝুলানো দামের অঙ্কটি অত্যন্ত বেশী। রেনীল চোখ তুলে বললে, কোম্পানীর কয়েকটা মাত্র ঘড়ি ইংলণ্ডের মাটিতে আছে। কিন্তু কেউ কিনছে না। নতুন নিয়মের মেরামত বলে সাধারণ মানুষ কিনতে ভয় পাচ্ছে।

—তুমি কিনবে? হঠাৎ আমায় রেনীল প্রশ্ন করল।

—কার জন্য?

—কেন বিবির জন্য।

বাপজী এবার আম্মাজানকে আরো কাছে টেনে বললেন, জানিস আমি তখন হাসলাম। তুই যে ঘড়িই দেখিস নি। কিন্তু ওকে কিছুই বললাম না দরকার নেই, শুনে হয়ত শুধু হাসবে। সে তো জানে না তুই কেমন অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করিস। সে জানলে এমন কথা নিশ্চয়ই বলত না।

—বুঝলি বিবি মন আমার একটা কথা বললে শুধু—তোমার জন্য সে এত কেনা কাটা করল আর তাকে তুমি কিছু দিলে না। কিছু অন্তত দাও। কিছু দিয়ে ওকে খুসী কর। বাদশার দেশের মেয়েকে উপহার দিতে হয় কিছু। তাই যতটা হঠাৎ সে বলেছিল, তুমি কিনবে, ততটা হঠাৎই আমি সো-কেসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দাম দিয়ে ঘড়িটাকে কিনে নিলাম। এবং ওকে আরো অবাক করে দেওয়ার জন্য মুহূর্তে বাঁ হাতটা বুকের উপর টেনে নিয়ে ঘড়িটা কব্জিতে জড়িয়ে দিলাম। দুটো চোখ ওর খুসীতে টস টস করে উঠল। কিসের ইশারায় সে যেন আমাকে বিমুগ্ধ করে দিলে।

—বিবি তুই আমার বউ। তোর কাছে আমার গোপন রাখার কিচ্ছু নেই। গুণাহ অনেক করেছি—সে গুণাহের কথা তোকে বলতে পেরে গুণাহের আফশোস থেকে রেহাই পেয়েছি তেমনি। কিন্তু আমার হাজার গুণাহ—ঘড়িটাকে কেন্দ্র করে তারপর যে খুন-খারাপীটা হয়ে গেল।

রেনীল আমায় ধরে নিয়ে গেল সেই লাইট-হাউজের গোড়ায়, পাহাড়ের নীচে। ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত নেমে গেছে পাহাড়টা। একটা আবছা আলোর ছায়ায় আমরা বসে পড়েছিলাম। একটা সুযোগের প্রত্যাশায় আমি তখন উন্মুখ। অদ্ভুত

এক প্রতীক্ষায় আছি। কি যেন সব এলো-মেলোভাবে ভাবছি। হাতে ঘড়িটা ওর চক চক করছে। চক চক করছে ওর চোখ দুটো। মাঝে মাঝে আমার প্রতি মুখ বাড়িয়ে সেও প্রতীক্ষা করছে কিছুর।

—ভুল হল আমার সেখানেই। গুণাহ আমার সেজন্য। হঠাৎ আমার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে রেনীল, ছিঃ বিবিকে যেয়ে জবাব দেবে কি! জাহাজী বলে অমন পেটুক হতে আছে।

—কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। আমার সব সত্বা হারিয়ে গেছে তখন। আর কোন কথা না বলায় সে সব কিছু সহজ করে হাত ধরে টানল। বললে, চল স্টুডিওতে যাই। দুজনে এক সঙ্গে একটা ছবি তুলব। দেশে ফিরে বিবিকে আবার বলো না। বললে, বিবি তোমায় তালাক দেবে।

আমি কিছু বলতে পারি নি। সে কিন্তু অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে।

—বিবি তুই বুঝবি না সে রাতে আমার বুকে কি জ্বালা!

—বন্দর থেকে ছবিঘরটা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গেছি। কথা বলার যত দরকার সব রেনীলই বলেছিল। ওর পিছনে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন সে বলল কি অত ভাবছো? এত ভাবলে কিন্তু খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

—বিবিরে ভাবছিলাম ওর কথা। বিদেশিনীর চরিত্রের কথা।

এবার বাপজী নিশ্বাস নিলেন জোরে এবং পাশ ফিরতে বললেন, ছবিঘরে ছবি তোলা হল। আমার আর রেনীলের এক সঙ্গে ছবি।

বাপজী অযথা হেসে উঠলেন জোরে এবং নিজেই বললেন, আবার রাগ করলি আমি হাসলাম বলে! এমন জোরে হাসতে নেই—অত জোরে হাসলে মবু চীৎকার দিয়ে উঠবে, তুই ভয় পাস এ সব কথা আগে স্মরণ করিয়ে দিলেই পারিস; তবে আর এমন জোরে হাসতাম না। আস্তে—যেমন করে হাসলে তুই ভয় পাবি না, মবুর ঘুম ভাঙ্গবে না। আমি ঠিক বলি নি? তুই তো আজকাল কেবল ভাবিস আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। খোদা-হাফেজের ভিতর যে দোয়া আছে সে তো টের পাস না। তুই জানিস কেবল রাগ করতে আর চোখের জল ফেলতে।

জাহাজীরা উঠে আসছে সব। বারোটার ওয়াচ শেষ হল মাত্র। বারোটা থেকে চারটা আর একটা ওয়াচ রয়েছে। পরের ওয়াচে মোবারক। চার থেকে আটের পরীদার সে।

যারা ফানেলের শুঁড়ি ধরে ওঠে আসছিল তারা দেখল মোবারককে। দেখে কিছু

আজ বললে না। শুধু ভাবলে, মোবারক আলী—জাহাজের যোয়ান জাহাজীটা পাগল হয়ে গেছে। সে থাক তার ভাবে।

পিছিলে ওঠার সময় জাহাজীরা দেখলে শেখর আজও আহত হাতটা নিয়ে সিঁড়ি ধরে ওঠছে। ওঠাব সময় শরীর থেকে কম্বলটা আজও আবার পড়ে গেল। আহত হাত দুটো দিয়ে কোন রকমেই যেন কম্বলটা জড়িয়ে রাখতে পারে না। তাই পাশের জাহাজী কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দেবার সময় বললে, যেয়ে কি হবে! ওর মত ওকে থাকতে দাও। মেয়েটার জন্য ওর দিলটা ফেটে গেছে।

শেখর ভাবলে অন্য কিছু। প্রতিবারই মোবারককে ধরে সে নীচে নামিয়ে আনে। হাজার রকমের প্রশ্ন করে। বকে কখনও। নিজেই ধমক দেয়। কখনও উত্তর পায় না।—এমন অনেক কিছু হয়ে আসছে। তথাপি আজ পর্যন্ত ও জানল না প্রশান্ত মহাসাগরের এ—দিগের দরিয়াটা ওর জীবনে কোন সর্বনাশ টেনে এনেছে।

এখান থেকে "খোদা হাফেজ" শব্দটা অস্পষ্ট। ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে কথাটা এমন করে মিলে গেছে যে ব্রীজে যে অফিসার প্রহরী দেন তিনি পর্যন্ত শুনতে পান না। দেখতে পান না বোট-ডেকের লাইফ বোটের রাডাবের পাশে মানুষটা ঝুঁকে আছে—দূরের সমুদ্র দেখছে। রাতে ঘুম নেই মানুষটার। বোট-ডেকের উপর পায়চারী করতে করতে নিজেই কেবল কি বিড় বিড় করে বকে। আবার এমন সময় আসে যখন দেখা যায় মোবারক রীতিমত হাসে, কথা কয়, রাত এগারো থেকে চারটার কাহিনী ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

ডেকের উপর উঠে শেখর কোনরকমে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য কম্বলটা শরীরের উপর শক্ত করে ধরল। ঝড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে নুয়ে নুয়ে হাঁটল। আজ আবার দুলছে জাহাজটা। ঢেউগুলো পাক খাচ্ছে। মাস্টের আলোটা দুলছে বলে ওর ছায়াটা একবার বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শেখর চোখ রাখলো সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ভাবল, কত বিচিত্র এই জাহাজী জীবন। একদল জাহাজী নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে—এক দল এই রাতের গভীরেও কোরানশরীফ পাঠ করছে। একদল এখুনি বাথরুমে ঢুকবে তারপর খানা খাবে টিনের থালায় করে। সামনের ডেক কেবিনে আছেন পাঁচ নম্বর সাব। পরী তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পোর্টহোল ধরে চেয়ে আছেন তিনি। বুঝি দক্ষিণ আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। নক্ষত্রের ভিতর কোন মুখের ছবি হয়ত। হয়ত ভাবছেন অনেক দূরের ঘর বাড়ির কথা।

কম্বলটা আবার শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছিল বলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

চোখে জল তার। কেন এমন জল আসে! মোবারক বোঝে না তার কষ্ট হয় উঠে আসতে! আহত হাত দুটো এখনও যে নিরাময় হয়ে উঠে নি।

কোন রকমে টলতে টলতে শেখর নেমে দাঁড়াল বোট ডেকে ওঠার সিঁড়ির নীচে। নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল—মোবারক আর পারি না রে। এবার আয়। বারোটা কখন বেজে গেছে।

মোবারক নিঃশব্দে নেমে এলে শেখর বললে, এ ভাবে আর কতদিন?

মোবারক হাসল চোখ দুটো বুজে। সঙ্গে সঙ্গে বাপজীর জাহাজটার কথা আবার নূতন করে মনে পড়ল—আম্মাজান যে জাহাজের গল্প অনেকবার শুনিয়েছে।

আম্মাজান বলতেন, জাহাজের মেরামত হয়ে গেছে। ইনডাষ্ট্রিয়েল ড্রাই-ডকের ভিতর বড় বড় সিঁড়ি লাগিয়ে জাহাজের নীচে রং করে চলেছে ডক-শ্রমিকরা। প্রপেলারের নীচে দুজন মানুষ—সাদা রঙের উপর লাল রং লাগানোর জন্য বাড়িয়ে ধরেছে ব্রাসটা। সে সময় রেনীল আর বাপজী এসে দাঁড়ালেন ডকের পাড়ে। বললেন, এই আমার জাহাজ। এ জাহাজেই একদিন বিবির কাছে যেয়ে পৌছব।

রেনীলের চোখ দুটো ছল ছল করছে। বাপজী পিপের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার মত থাকলেন। পরে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে রেনীলের—বললেন, আবার আসব, আবার দেখতে পাব তোমায়।

ঘড়িটা একটু কাত করে দেখল রেনীল। যেন সব জানালে, পারে। কোন কথাই বললে না সে। যে মানুষটা রং লাগাচ্ছে তার দিকে চেয়ে থাকলে শুধু।

পরদিন সরাইখানা ছাড়তে হবে! জাহাজে মোট ঘাট নিয়ে উঠতে হবে ঠিক দশটায়। সবাইকে কিনার থেকেই সেদিনের মত খাওয়া সেরে আসতে হচ্ছে বলে রেনীল সকালে ওর লিটন স্ট্রীটের ছোট্ট বাসায় নিমন্ত্রণ জানালে বাপজীকে এবং সেই সকালে রেনীল সে তার ছিমছাম ঘরটিতে বাপজীকে বসিয়ে বললে, মজিবুর ঘরে ফিরছ—বিবিকে যেয়ে পাবে, মবুকে যেয়ে পাবে—কিন্তু আমার কথা।

—তোমার কথাও মনে থাকবে।

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল রেনীল। টেবিলের উপর কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে বসে থাকল। কোথায় যেন তার অপরাধ। কোথায় যেন তার কিসের কুণ্ঠা। কোথায় যেন কিছু প্রকাশের অনিচ্ছা।

বিদায়ের সময় রেনীল বাপজীর হাত টেনে নিয়ে হাতের আঙুলে একটি আংটি পরিয়ে দিলে। বললে, আমাকে এ ভাবেই সব দিতে হচ্ছে।

আঙুলটি চোখের উপর তুলে ধরলেন বাপজী। একটি নাম—রেনীল। একটি আংটি—মিনা করা, ঘরের নীলচে আলোয় চক্ চক্ করছে।

তারপর একই টেবিলে বসে দুজন খেল।

রেনীলের কণ্ঠে আবার সহজ স্বাভাবিক আলাপ।

বাপজী আরো কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রেনীল কিছুতেই ততদূর পর্যন্ত যায় নি।

বারান্দায় এসে বিদায় দেবার সময় মুখ ঘুরিয়ে নিল রেনীল।

স্পষ্ট দেখেছেন বাপজী, রেনীল তখন চোখের জল ফেলছে।

জানালার গরাদ দুটো সাক্ষী থাকল। বাপজী আর রেনীল। রেনীলের ছোট সহজ মন। দুটো গভীর চোখ তার—সব কিছু মিলে বিদায় বেলায় অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল পরিবেশটিকে। বাপজী সেজন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পা ফেলেছেন। লিটন স্ট্রীট থেকে রাউদ ইনজিনিয়ারিং কারখানা পর্যন্ত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে এসেছেন। থামলেন এসে প্রথম কারখানার সদর দরজার পাশে। বি-আই কোম্পানীর সাদা বর্ডারের চিমনি দেখলেন।

ড্রাই-ডকে জল এসে নামছে। টাগবোট এসে টানছে জাহাজটাকে।

ছুটে গেলেন বাপজী।

ডেক থেকে জাহাজীরা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিলে সেই ধরে উঠলেন বাপজী।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছে রহমৎ মিঞা। বাপজীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, এসে গেলেন! এসে গেলেন! ওঃ কি চিন্তাতেই না ফেলেছিলেন। আসুন এখন। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বুড়ো বাড়ীয়ালা দেখলে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে বারিক বলল, সেলাম-আলাই-কুম ট্যাণ্ডল সাহেব। তবিয়ত ঠিক আছে ত?

বাপজী হাত তুলে তুলে সকলকে অভিবাদন করলেন। নীচে নামলেন। এক সময়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাংকের উপর এলিয়ে পড়লেন। কি যেন ফেলে গেলেন এই বন্দরে। কার্ডিফ বন্দরের কানা গলির মোড়ে ছোট্ট ঘরটা তার একান্ত প্রিয়জনকে যেন বেঁধে রেখেছে।

দুটো পাহাড়ের ফাঁক ধরে নোনা জলের উপর নীল রং মেখে জাহাজটা সমুদ্রে পড়বে এমন সময় বাপজী এসে দাঁড়ালেন ডেকে। দূরে লাইট-হাউজ। গোড়ায় তার পাহাড় আর পাথর—'দ'-এর মত সিঁড়ি ধরে ধরে নীচে বালিয়াড়ীতে নেমেছে। ছোট সঙ্কীর্ণ জলা জঙ্গল, পাহাড় আর পাথর, কত দুপুরে ওদের সঙ্গে মসগুল হয়ে উঠেছে।

সে আর রেনীল এসে বসত—গল্প করত, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। রেলিং ধরে সব নূতন করে ভাবার চেষ্টা করলেন বাপজী।

ক্রমশ সরে যাচ্ছে পাহাড়টা। লাইট-হাউজের বালিয়াড়ীটা আড়াল পড়ে গেছে। বেট্‌ল-সিপের চিমনীগুলো চোখে পড়ছে না। দূরে সমস্ত শহরটা ক্রমশ সন্ধ্যায় আবছায়া অন্ধকারে হাজার আলো বুকে নিয়ে সমুদ্র তীরে ভেসে উঠেছে।

বাপজী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পিছন থেকে তখন কে যেন ডাকলো, ভাই সাব!

রহমৎ মিঞার গলা—ভাই সাব নীচে আসুন, খানা খাবেন।

ওয়ারপিন ড্রামটা পিছনে ফেলে বাপজী গিয়ে উঠলেন পিছিলে। আবার কার গলা শুনলেন। বারিক মিঞা বলছে, নসীব রহমৎ মিঞার। ঘরও পেল, ঘড়িও পেল। গ্যালি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে রহমতের ঘড়িটা দেখলা ট্যাণ্ডেল?

বাপজী উত্তর করলেন না। চোখ তুলে তাকালেন তিনি বারিকের প্রতি। বারিক এই বলে কি বলতে চায়, তিনি তার অর্থ বুঝতে চান।

রহমৎ মিঞা বারিককে বলল, দেখবে, দেখবে। ভাই সাবকে আর একান্তে পেলাম কখন।

দুজন হাত ধরাধরি করে নীচে নামলেন।

মিঞা সাবের মুখে প্রসন্ন হাসি। অনেক খবর আছে মিঞা সাবের। অনেক খবর তিনি দেবেন বাপজীকে।

দুজন পাশাপাশি বাংকে বসে প্রথম দুজন দুজনকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

হাতঘড়িটা হাতে থাকে না—থাকে বেশীরভাগ সময় বালিশের নীচে। আফশোস করল রহমৎ। সব সময় ঘড়িটা হাতে রাখতে পারে না বলে অনুতাপ তার।

শেষ পর্যন্ত বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করল ঘড়িটা। দুটো হাতে চেপে ধরে ঘড়িটা, কেমন অসলংগ্ন ভাবে বলে গেল—ঘড়িটা বকশিশ পেয়েছি। একটি মেয়ে দিয়েছে। লিটন স্ট্রীটে সে থাকে। ফুল কিনতে গিয়ে ভাব হল। তাই দিল—খুপসুরুত। আপনিও সরাইখানায় গেলেন না একবার যে দেখাব।

—বকশিশ। দাঁতে দাঁত চাপলেন বাপজী।

বকশিশ। বাপজীর দৃষ্টিগুলো একত্রে দপ দপ করে জ্বলে উঠল। তবু তাঁর অস্পষ্ট আওয়াজ। গলটা শুকনো। চোখের উত্তাপ নিভে আসছে। উত্তেজনায় থরো থরো করে কাঁপছে শরীর। —রেনীল! রেনীল! গলার অস্পষ্ট আওয়াজে তিনি বিস্ময়ে চকিত হলেন।

তারপর বাপজীর উত্তর ত্রিশের উষ্ণ যৌবন ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে চীৎকার করে উঠল, মিঞাসাব।

—ভাইসাব। উত্তর দিতে গিয়ে রহমতের মনটা খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। চোখ তুলতে পারলো না। দপ দপ্ করে কপালের শিরা উপশিরাগুলো উঠছে নামছে। কোন রকমে ফিস ফিস শব্দ করে বললে, বকশিশ নয় ভাইসাব! বকশিশ নয়, মিথ্যা-কথা বলেছি! লিটন স্ট্রীটের এক ফুলওয়ালির বাড়ীতে রাতে ফূর্তি করতাম। ফূর্তি করে একদিন ফিরছি ফুলওয়ালী বললে, ঘড়িটা কিনবেন, বড্ড বিপদে পড়েছি! কাল, কালই ত কিনলাম। আপনার কাছে জুটাবাত বলে কোন লাভ নাই। আপনি আমার দোস ভাইসাব।

দোস। দাঁতে দাঁত আবার চাপলেন তিনি।

বাপজী আর রহমৎ মিঞা। ডেক আর সিঁড়ি পথ। ফোকসাল আর বাংক। বাংকে বসে রহমৎ মিঞা ডাকল চলেন, খানা খেয়ে নি ভাইসাব।

তিনি উত্তর করলেন না। সিঁড়ি ধরে ছুটে গেলেন ডেকে। দু হাত উপরে তুলে এক আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে কিছু যেন বললেন।

জাহাজের জাহাজীরা অবাক হয়ে দেখছে বাপজী কেমন পাগলের মত ইতস্তত ডেকের উপর পায়চারি করছেন।

ডেকপথ অন্ধকার। ফোকসাল অন্ধকার। থেকে থেকে স্টিয়ারিং ইনজিন গর্জন করে উঠছে। অন্ধকার পথে বাপজী ডেক থেকে সন্তর্পণে এক সময় নেমে এলেন এবং কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন বাংকে।

সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে আবার। বে অফ্ বিসকে—ঝড়ের সমুদ্র। জাহাজ দুলছে। লোহার পাত দিয়ে আঁটা পোর্টহোলগুলো। বাইরের তীব্র গর্জন ফোকসালে তেমন ভয়ঙ্কর ভাবে গলে পড়তে পারছে না। এই ভয়ঙ্কর দোলানির ভিতরও নির্বিঘ্নে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে জাহাজীরা।

রাত তখন এগারটা। ডংকীম্যান এসে প্রহরীদের ডেকে গেছে। বাংকে বাংকে আওয়াজ তুলেছে—টাণ্টু। খুব আস্তে ডেকেছে। জোরে ডাকলে অন্য প্রহরীদের ঘুম ভাঙবে।

বাপজীর বাংকের পাশে আওয়াজ উঠল। চোখ বুজে ছিলেন, আওয়াজ শুনে চোখ মেলে তাকালেন। অন্ধকার ঘরে দেখলেন কেউ নেই। কেবল ডংকীম্যানের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে সেই শব্দ ডেকের দিকে পা বাড়িয়েছে।

উঠে আলো জাললেন বাপজী। মগ বাংকের নীচ থেকে টেনে বের করার সময়

দেখলেন রহমৎ মিঞা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হাত ঘড়িটা ঝুলছে ভাকের উপর। ঘুমের আগে বুঝি ভুলে গেছিল ঘড়িটা খুলে পেটিতে রাখতে হবে।

বাপজী কি ভেবে সতর্ক ভাবে চোখ বুলালেন চারিদিকে। ধীরে সংক্ষেপ দৃষ্টি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন খুব আস্তে। এসে দাঁড়ালেন রহমৎ মিঞার বাংকের ধারে। আলো নিভিয়ে দিলেন পা টিপে টিপে। আস্তে তুলে আনলেন ওর হাতটা নিজের হাতের উপর। শরীরটা শীতের রাতেও ঘামছে। শিস উঠছে দুটো কান থেকে। ফুলে ফুলে উঠছে হৃৎপিণ্ডটা। হাত দুটো কাঁপছে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গিয়ে। তবু খুলতে হবে—কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গেলেন।

রহমৎ মিঞা হঠাৎ ধর ফর করে উঠে বসল। অন্ধকারের ভিতর চীৎকার করে উঠল, চোর চোর! ভাই সাব জাগেন। আমার হাত ঘড়িটা ধরে কে যেন টানছে। ও ভাইসাব ওঠেন।

দেশলাইয়ের কাঠির মত নরম মানুষ রহমৎ মিঞা। শক্তি সামর্থ বিহীন মানুষের গলাটা কেবল ক্যাঁক ক্যাঁক করছে। সে আওয়াজ থামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এক হাতে মিঞার মুখ চেপে ধরলেন। চেপে ধরে চেষ্টা করলেন ঘড়িটা খুলতে।

সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ পেলেন বাপজী। কোন জাহাজী যেন ঠক ঠক পা ফেলে নীচে নেমে আসছে। জরাগ্রস্ত রুগীর মত বাপজীর হাত পা কিছুতেই আর স্থির থাকছে না। গলার ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজটা তখনও উঠছে। ভেজানো দরজার ফাকে গলে গলে পড়ছে। ভয়ে বাপজীর হাত দুটো অজান্তেই রহমৎ মিঞার গলার উপর চেপে বসল। ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজটা থামিয়ে দিতে হবে। কারণ জাহাজে সব অপরাধের ক্ষমা আছে, চুরির ক্ষমা নেই।

ঠক-ঠক আওয়াজটা ডেক-জাহাজীদের ফোকশালের দিকে চলে গেল। আর কোন আওয়াজ নেই। সব চুপ। শুধু থেকে থেকে তখনও গোঙানি উঠছে রহমৎ মিঞার গলা থেকে। বাপজী যন্ত্র চালিতের মত দাঁড়িয়ে আছে বাংকের পাশে।

এক সময়ে রহমৎ মিঞার গলা থেকে সে আওয়াজটা সম্পূর্ণ থেমে গেল।

বাপজীর হুঁশ ফিরতেই আলো জ্বাললেন। রহমৎ মিঞার নীল মুখটা বালিশের উপর কতকটা লালা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাপজী বুঝলেন রহমৎ মিঞার মৃত্যু হয়েছে। বুঝলেন তিনি খুনী। সমস্ত সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিগুলি এক এক করে মাথায় জেগে উঠল আবার। প্যাঁচ ঘুরিয়ে পোর্টহোলের কাঁচ খুললেন। বাংক থেকে তুলে আনলেন রহমৎ মিঞার নীল দেহটা। পোর্টহোলের কাচ খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন ব্রীজের উইংস থেকে কেউ কিছু দেখছে কিনা। তারপর পোর্টহোল গলিয়ে,

রহমত মিঞার পাতলা দেহটা সমুদ্রের অনন্ত নোনা জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডাকলেন, খোদা হাফেজ!

রহমৎ মিঞার গলা টিপে মারতে, ঘড়ি খুলতে পোর্ট হোল দিয়ে লোনাজলে ফেলে দিতে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল, কাজেই ঠিক পৌনে বারোটায় ডেকের উপর ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। টলতে টলতে উইন্‌চ্‌ মেসিনের কোণায় এসে উবুড় হয়ে পড়ে থাকলেন। কিন্তু ওয়াচের বারোটা বাজার সঙ্গেই তিনি যেন তাঁর আগের স্বভাব ফিরে পেলেন। উন্মুখ আকাশ তলে দু হাত প্রসারিত করে ডাকলেন —সেই এক ডাক—খোদা হাফেজ।

শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি কসম থাকল, আম্মাজানের কসম।

ইনজিন রুমের স্টোকহোলড্‌ তখন বিদ্রূপ করে মোবারককে। শ্লাইসটা টেনে নিতে হাতটা কাঁপছে তার। উইণ্ডসহোল দিয়ে হাওয়া বইছে না। মুঠো মুঠো শ্বাস টেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে মোবারকের। বুকটা কাঁপছে! চোখ দুটো জ্বলছে।

বয়লাবের ভিতর কত হাজার হাজার টন কয়লা পুরে চলেছে কত হাজার মাস ধরে। ফায়ার ব্রীজ থেকে নীচের জ্বলুনি কিছুই কমল না।

ছাইয়ের ভিতর আগুনটা চাপা থাকে বেশী। ঘুস ঘুস জ্বলতে থাকে। পোড়া ঘায়ের মত জ্বালা হয়। মোবারকের ফুসফুসটা সেই ঘায়ের মত জ্বালা করছে।

ধুতুরা ফুলের মত উইণ্ডসহোলের মুখটা। নীল নোনা জলের হাওয়া উইণ্ডসহোলের মুখটা আর বুঝি টানতে পারছে না। কয়লা মারতে কিংবা জ্বলন্ত কয়লা উলটে দিতে যখন মোবারকের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে তখনই সে উইণ্ডসহোলের বাতাস জোরে মুঠো মুঠো করে টেনে নেয় এবং ব্লাডারের মত ফুলিয়ে তোলে ফুসফুসটাকে। কিন্তু এই তিন রাত তিন দিনের প্রহরীগুলোতে সে আর মুঠো মুঠো বাতাস টেনে নিতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে শিকল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মোবারক। নীচ থেকে সে চাইল ত্রিশ ফুট উপরের ধুতুরা ফুলের মুখটাকে বাতাস মুখো করে দিতে।

শামীনগড়ে ধুতুরা ফুল খোঁপায় গুঁজে জৈনব খাতুন আসত হরিতকী গাছের নীচে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মবুর হাত ধরে বলত, পাহাড় চিরে হাওয়া আসছে এ সরু পথটায়। মবু সে তার বুকে জৈনবের মুখটা তখন টেনে ধরত। বলত সোহাগী সোহাগী কথা।

শামীনগড়ের ছবি ভাবছে আর শিকল ধরে টানছে মোবারক। ইদ্রিশ আকবরের

হাতে ব্যালচে। ওরা হুস্ হুস্ করে কয়লা হাকরাচ্ছে চুলোর ভিতর। চুলোয় কয়লায় ভরে উঠলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এক সময় দুজনই দুটো শাবলের উপর ভর করে বললে, "স্টীম যে নাইমা গেল মিঞা!"

হুঁশ হল মোবারকের। চমকে উঠল সে স্টীম গেজ্‌টা দেখে। তর তর স্টীম কোথায় নেমে গেল! দুনম্বর বয়লার কোম্পানীর পুষে রাখা কসবি তঞ্চকতা করতে সুরু করছে আবার। সেজন্য শক্ত মুঠোয় শাবল টেনে কয়লা হাকরাতে থাকলো বয়লারের ভিতর। বিরক্ত হয়ে বল্‌লে "কসবী।"

কাকে উদ্দেশ্য করে? জৈনব খাতুনতো তখন হরিতকী গাছের নীচে। বয়লারের স্টীমতো তখন তর তর করে উঠছে। ইদ্রিশ আকবর দুজন দুজনের প্রতি চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চোখ টেনে ইশারায় বলছে যেন—শুনছো, মিঞা যে সত্যি পাগল বনে গেল।

মোবারকের হাত এবং ব্যালচে ব্যথায় দুটোই যেন ককিয়ে কাঁদছে। তবু কয়লায় কালো করে তুলছে বয়লারের তিন চুলো। কবরের মত উঁচু হয়ে উঠছে ফায়ার ব্রীজের বুকটা। শেষে সেই কয়লা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচের প্লেটের উপর। ভিতরে আর এতটুকু জায়গা নেই। মোবারক ওদের মত শাবল তবু টানছে। কয়লা হাকরাচ্ছে। সেই দেখে ছুটে এসেছে আকবর। হাত ধরে বলেছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিঞার। শেষে চুলোর দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে হাওয়ার ভালব্‌গুলো উঁচিয়ে দিল সে।

মোবারক কেমন অবাক এবং বিস্ময় মানল আকবরের কথায়। আকবরের মত ছাপোষা লোক এ কথা বলতে সাহস করল!—উন্মাদ মোবারক। কি সব বলছে হাড় জিরজিরে লোকটা।

কেন আম্মাজানও তো বলতেন বাপজীকে, আপনি কি মবুর বাপ পাগল হয়ে গেছেন!

শামীনগড়ের সড়কটা তখন কেঁপে উঠত। খবরদার তুই অমন কথা বলবি না বিবি, বাপজী চীৎকার করে উঠতেন।

আম্মাজান সড়ক থেকে বাপজীকে ধরে ধরে উঠোন পর্যন্ত এনেছিলেন। দুজনই চুপ। মবু তখন তাদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। রাতের অন্ধকার চিরে ফিস ফিস করে একসময় বললেন আম্মাজান, মবুর বাপ আপনি আমায় খবরদার বলতে পারেন, কিন্তু শামীনগড়ের মানুষদের ত চুপ করাতে পারলেন না।

অন্ধকারের ভিতর দীর্ঘ মজবুত দেহটা আরো দীর্ঘতর হতে চাইল। তেঁতুল গাছ

এবং মসজিদের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাপজী প্রশ্ন করলেন, কেন তারা কি বলে ?

আম্মাজান ভয়ে ভয়ে বললেন, উঠোন থেকে ঘরে চলুন।

বল ওরা কি বলে ? বাপজী এতটুকু নডলেন না। মুখ পর্যন্ত তাই দেখে আতকে উঠছে।

না না আমি তেমন কথা বলতে পারব না।

তোকে বলতেই হবে মবুর মা। খুব দৃঢকণ্ঠে বাপজী এবার জবাব পেতে চাইলেন।

আম্মাজান একান্ত অসহায়। থর থর করে কাঁপছেন তিনি। তিনি বাপজীর সেই দৃঢ় এবং অনমনীয় মনোভাবকে কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাই ছুটে এসে বাপজীর বুকে মাথা ঠুকলেন ঠাস ঠাস করে। খোদার কসম মবুর বাপ আমায় আর সে কথা বলতে বলবেন না। আমায় মেরে ফেলুন গলা টিপে মেরে ফেলুন—বলে বাপজীর দুটো শক্ত হাত নিজের গলার কাছে টেনে আনলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে ঢলে পডলেন বাপজীর শরীরের উপর।

বাপজী তখন হেসেছিলেন। উন্মাদের মত শামীনগড়ের বুক আর কর্ণফুলির জল কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। রাতের অন্ধকারে যে পাখীগুলো নীরবে ঘুমোয় তারা পর্যন্ত ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, পাখা ঝাপটা দিয়ে হাসির ঢেউটাকে ডানার ভিতর টেনে আবার ঘুম যেতে চেয়েছিল।

তিনি উন্মাদের মত জাহাজী ঢং-এ হেসেছিলেন। বলেছিলেন, জানি তারা কি বলে।

তারপর আম্মাজানকে কাঁধে ফেলে, মবুকে এক হাতে টেনে ঘরে নিয়ে তুললেন। আম্মাজানকে নীল কাঁথার নীচে শুইয়ে দিয়ে সেদিন প্রথম কসম খেলেন, হাজার গুণাহের কথা তিনি বিবিকে বলবেন।

তারপরের ঘটনাগুলো মবু সব জানে। তক্তপোশে থেকে জানে, আম্মাজানের মুখ থেকে জানে।

তারপরের কাহিনীগুলো মোবারক চোখের উপর দেখেছে।

শুনেছে অনেক কথা। তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে শুনল—রহমৎ মিঞা, ঘড়ি আর ফুল বেচে খেত যে মেয়েটি সে মেয়েটির গল্প।

বাপজী তার হাজার গুণাহের কথা এক মাত্র আম্মাজানকেই বললেন। সেই গুণাহগারের গল্প শুনে আম্মাজান ভোরবেলায় দেখলেন—বাপজী একেবারে অন্য মানুষ। সাধারণ মানুষ। নাবিকের মত তিনি আবার পাহাড়ের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। চোখ দুটোয় নাবিকের ডাক উঠেছে।

ভোরবেলায় বাপজী বারান্দার কোণ থেকে প্রথম বদনাটা টেনে নিলেন সেদিন। জল ভরে চলে গেলেন মসজিদের দিকে। তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রামের মানুষদের সালাম জানালেন। তবি তবিয়ত কার কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন।

গ্রামের মানুষেরা অবাক হল, কেউ নাবিকের এমনি জীবনধারা ভেবে আদাব করে চলে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন বাপজী। তারপর অজু করে মসজিদ গেলেন অনেক দিন পর নামাজ পড়তে। দু হাঁটু ভেঙে নামাজ পড়ার সময় এক অদ্ভূত বুক ঠেলে ওঠা কান্নায় তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে দিলেন। আসমানের প্রতি দুহাত তুলে দোয়া মাগলেন—খোদা, মবু আর বিবিকে শান্তিতে রাখ।

নামাজ সেরে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভোরের আকাশে তখন এক দল কাক পাহাড় প্রান্তে ছুটে গেল। কামরাঙা গাছটায় এক দল টিয়া দোল খাচ্ছে। নীচে উঠোনে শালিখগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে খোদার মসজিদে আপনি মরজি মিশিয়ে দিচ্ছে। সফর শেষে বাপজী পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ আজ যেন এই প্রথম পেলেন। কেমন হাল্কা হয়ে তিনি তাই ছুটে ছুটে এলেন ঘরে। তারপর নিভৃতে বিবিকে বুকে টেনে বললেন, বিবি দরিয়া যে আবার আমায় টানছে, বিবি ভিতরে নাবিকের রক্ত আবার আমায় মোচড় দিচ্ছে।

সেই পুনরাবৃত্তি। যে পুনরাবৃত্তি বাপজী সফরের পর সফর করে আসছেন।

আম্মাজান সহজ ভাবে বললেন, আর কেন?

—কেন নয় তুই বল?

—বেটাকে সাদি দিন। বেটার বিবি ঘরে আনুন।

সাদি? মাথা নেড়ে বললেন বাপজী, দেব। ওর সঙ্গে জৈনবকে মানাবে ভাল। এ সফরটা ঘুরে আসি তার পরেই দেব। এক বেটার সাদি—টাকা পয়সার দরকার। বেটার বিবি ঘরে আনব সে কি আমার কম আনন্দের কথা। কিন্তু টাকা চাই—অনেক টাকা। গোটা শামীনগড়ের সমাজ দাওয়াত পাবে, সেখ, সৈয়দ সব মেমান আসবে—সে কি কম কথা।

মোবারক আলি আর জৈনব খাতুন। দুটো নাম। দুটো সবুজ মন হরিতকী গাছের নীচে যে ছোট্ট খেলাঘর পেতেছিল তাদেরি কথা হচ্ছিল আম্মাজান আর বাপজীর ভিতরে। মবু সেদিন বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়েছিল উঠোনের উপর। বলেছিল ওর কচি মনটা, খোদা তুমি সাক্ষী থাকলে।

খোদা সেদিন সাক্ষী ছিল নিশ্চয়ই। নতুবা উঠোনের উপর মবু আর জৈনবকে দেখে আম্মাজান আর বাপজী একসঙ্গে বলে উঠলেন যেন ঘর থেকে—দেখ, দেখ বিবি

কেমন মানিয়েছে দুজনকে। আম্মাজান ঠিক একই সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে গেছিলেন, যেন একটি মাত্র সঙ্গীত আল্লার কাছে নিবেদন করলেন।

সঙ্গীতের মতই শুনালো। মবু আর জৈনব শুনলো। লজ্জায় আর সরমে দুজনই কেমন নুয়ে পড়ল।

বাপজী নেমে এলেন উঠোনে।

লঘু সঙ্গীতের মত পা ফেলে বারান্দা থেকে নামলেন আম্মাজান। এবং দুজনকে দুজন কোলে নিয়ে মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

আম্মাজান বললেন, বেটা আমার ভাল। বেটার কোন দোষ নেই।

বাপজী বললেন, আমার জৈনব ভাল। জৈনবের উপর বেটা বড় অত্যাচার করে।

মবুর দিকে চেয়ে বললেন বাপজী, মবু তুই কিন্তু তোর বিবির উপর কথা বলবি না। যদি বলিস তবে সহর থেকে কিচ্ছু আনব না। বিবি যা বলে তাই শুনবি, তাই করবি, না শুনলে আল্লা তায়লা রাগ করবে।

আম্মাজান চোখের উপর দেখলেন যেন একটি দুরন্ত আরবী ঘোড়াকে শক্ত লাগামে টেনে ধরেছে ছোট্ট একটি মেয়ে। সে মেয়ে জৈনব খাতুন। একটি অভিশপ্ত নাবিক বংশকে রক্ষা করছে। সে জন্যই বুঝি আম্মাজান বাপজীর ক্লান্ত স্বরটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন, মবু কোনদিন জৈনবের কথার বার হবে না। তাই না বেটা।

আম্মাজান নিশ্বাস টানলেন জোরে। সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিতর কোথায় যেন নির্ভরতা রয়েছে। সে নির্ভরতা বুঝি মবুর উত্তরকালকে ঘরে বেঁধে রাখার আশ্বাস— শাহ্নীনগড়ের মাটিতে মোবারকের জীবন বন্ধনের আশ্বাস।

দুজনই খুসী হয়েছিল। আর নয়, কারণ অনেকদূর গড়িয়েছে। বাপজীর উত্তর-পুরুষ চাষী হোক এই বলে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মোনাজাত করেছিলেন সেদিন। আম্মাজান আকাশের দিকে চেয়ে নীরব ছিলেন তখন।

দুজনই আতাবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে জৈনব আর মোবারককে অনেক আদর সোহাগ করেছিলেন এবং সে কথার জের থেকেই বাপজী এক সময় বললেন, আজ রাত্রেই সব ঠিক-ঠাক করে রাখবি মবুর মা, কাল ভোরে আমি কর্ণফুলির বাঁওড়ে যাব।

আম্মাজানের ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

চোখে আবার সেই বিষন্নতার ছায়া নেমেছে আম্মাজানের। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে কেমন নুয়ে নুয়ে পড়লেন বুকের একটি অব্যক্ত বেদনায়। এতকাল পরেও মবুর বাপ বেদনার তীব্র আঁচটা ধরতে পারল না।

বাপজী বিকেলে গেলেন হরীনগঞ্জের হাটে। হাট থেকে ভাল মাছ আর ভাল সওদা করে ফিরলেন। দাওয়াত করলেন জৈনবের বাপজীকে। ঘর বেদের সঙ্গে তাই সৈয়দ বংশের মোকাবেলা হল রাতে। খেতে খেতে দুজন অর্থাৎ দুই বাপজী কথায় কথায় প্রাণখুলে হাসলেন। নূতন মেমানের সঙ্গে নূতনভাবে আলাপ হল। জৈনব খাতুন এ ঘরের বিবি হয়ে আসবে মোবারকের বাপজী ঘর বেদে ওঝা বংশকে কথা দিলেন।

সকলের খাওয়া শেষ করে নিজে দুমুঠো খেয়ে টিনকাঠের ঘরটায় যখন এসে ঢুকলেন আম্মাজান নীরবে, তখন দেখলেন বাপজী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছে। বুঝছেন, প্রতি সফরে যাওয়ার আগে বিষণ্নতার ছায়া যেমন করে বাপজীর উপর নেমে আসত এ সফরেও তাই এসেছে। আম্মাজান এই দেখে প্রতিবার যেমন কান্নাকাটি করেন আর পেটি সাজান, এবারেও তেমন চোখের জল ফেললেন আর পেটি সাজালেন। পেটির ভিতর থেকে টেনে টেনে সব বের করতে গিয়েই দেখলেন একটা আওটি পেটির এক কোণায় পড়ে আছে। আওটিটা মিনাই করা আর চকচকে। উপরে কাটি আঁকা বাঁকা রেখা।

কুপির আলোয় বাপজীর চোখের উপর সন্তর্পণে আওটিটা তুলে ধরলেন আম্মাজান।

বাপজী সহজভাবে বললেন, বেনীল আওটিটা দিয়েছিল আমায়। তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললেন, তুই রাখবি নাকি আওটিটা।

—না। আম্মাজান ঘাড় কাত করে অসম্মতি জানালেন।

হাতে নিলেন আওটিটা বাপজী! নিজের আঙুলে পরলেন। তা হলে আমারটা আমারি থাক। কলকাতায় গিয়ে বেনীলের নামটা পাল্টে নিজের নামটা লিখে নেব।

—আপনার হাত ঘড়িটা! আম্মাজান প্রশ্ন করলেন। দিন পেটির ভিতর রেখে দি।

ফিতা কেটে দেওয়া হাত ঘড়িটা মবুই বালিশের তলা থেকে টেনে এনে আম্মাজানের হাতে দিয়েছিল। আর মবুর মা দুজোড়া চোখকে আড়াল করে পেটিতে রাখার নাম করে নিজের আঁচলের এক কোণায় বেঁধে ফেললেন। বাপজী অন্যমনস্ক ছিলেন বলে লক্ষ্য করেন নি—কিন্তু নীল কাঁথার নীচ থেকে দুটো চোখ সে সব দেখে ফেলল। আম্মাজান তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না।

পরদিন সকালে শামীনগড়ের মানুষেরা জড় হল উঠোনে। প্রতি সফরের মত বাপজীকে তারা দোয়া জানাল। মবু আর আম্মাজানকে বিপদে আপদে দেখাশোনার

ভার নিল। তাদের দলে ছিল রসীদ চাচা। ভিন গাঁয়ের লোক। বাপজীর দূর কুটুম। সে এসেছিল মবুর বাপকে বলতে—সফর ফেরত তার জন্য যেন একটা জাহাজের চাকরি ঠিক করে আসে। গাঁয়ে গাঁয়ে গাওয়াল করে, পানসুপুরী বিক্রি করে আর পেট চালানো যাচ্ছে না।

সকলকে আদাব জানালেন বাপজী। রসীদ চাচাকে বললেন, এদিকটায় গাওয়াল করতে এলে তোর চাচিকে দেখে যাস। তার তল্লাস নিস। মবুটা বড় হয়ে উঠেছে —তাকে দেখিস।

আম্মাজান আতাবেড়ার এ পাশ থেকে সব শুনলেন। তিনি কেবল কাঁদলেন আর কাঁদলেন।

কর্ণফুলির বাঁওড় পর্যন্ত মবু গেল বাপজীর সঙ্গে। মাদুর আর পেতলের বদনাটা তার হাতে। সঙ্গে গেল গ্রামের কয়েকজন। তাদের মাথায় কারো বাপজীর পেটি, বিছানা, কেউ সঙ্গ দিয়ে চলেছে।

বাঁওড়ে নৌকো থাকে। মাঝি থাকে। লগি খুঁটির মত গোঁজা থাকে পাড়ে। খুঁটিতে নৌকার দড়ি বাঁধা। বাপজী সেই নৌকায় ওঠার আগে মবুকে আর একবার কোলে টেনে নিলেন, মুখ থেকে চিবোন পান এনে কিছুটা মবুর মুখে পুরে দিলেন। তারপর চাইলেন শামীনগড়ের দিকে দিকে। পাহাড় প্রান্তে চোখ গেল। নীচে মাঠ। সবুজ মাঠ। খেঁসারি কলাই গাছে নীলচে নীলচে ফুল। তারপর মবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আম্মার কথা শুনিস মবু। দেখিস তোর ব্যবহারে তিনি যেন দুঃখ না পান। আম্মা বড় ভাল। বলতে বলতে বাপজীর গলাটা ধরে এল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ মবুকে বুকে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে কেমন অসহায় আর ক্লান্ত স্বরে বললেন, মালিক গফুর! শেষে আল্লা আল্লা বলতে বলতে উঠে গেলেন নৌকায়।

নৌকাটা অনেকদূর পর্যন্ত গেল কর্ণফুলির বাঁওড় ধরে ধরে। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ বাপ আর বেটা দুজন দুজনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করল। এক সময়ে নৌকা বাঁওড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল। কিন্তু নৌকার মাস্তুলটা মবুর চোখের উপর তখনও ছায়া ফেলছে।

মবু ফিরে এল ঘরে। লোকজনও ফিরে এল শামীনগড়ে।

বাড়ীতে ঢুকে ডাকল মবু, আম্মা! আম্মা!

কোথাও থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল। দেখল আম্মাজান নীলকাঁথার নীচে বালিসের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। আবার সে ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বালিসের ভিতর মুখ রেখে আড়ষ্ট গলায় বললেন, তোর বাপজী চলে গেল মবু!

—জি আম্মা। মবু তক্তপোশে বসে আম্মার মুখের উপর মুখ রাখলে।

—তোকে কিছু বলে গেলেন?

—জি আম্মা।

—কি বলে গেলেন?

—বললেন, তুই তোর আম্মার কথা শুনবি, আম্মা বড ভাল।

—আমার কথা তুই শুনবি!

—জি।

—তবে বল, তুই তোর বাপের মত হবি না, নাবিক হবি না।

—না, নাবিক হব না।

—শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি কসম থাকল।

—তাই বাঁচব কসম খেলাম।

ডেকে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। হাত তুলে দেখালেন সকলকে।—ঐ যে পাহাড়। বিন্দু বিন্দু হয়ে আকাশ সীমানায় ভেসে উঠেছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা দেখল দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফেটে ওঠা একটা ঢিবি। আকাশের দিকে তার মুখ। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ—থবে থরে উপরের দিকে ওঠে গেছে। মাথায় তার কাঠের ক্রস বসানো। একদল সমুদ্র পাখী দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উডছে। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন।

মোবারক, শেখর জাহাজের সব জাহাজীরা শুনে শিউরে উঠল।

শিউরে উঠেছিলেন সেদিন আম্মাজানও, সমস্ত শামীনগড সে খবরে চুপ মেরে গেছে, সডকের ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে সন্তর্পণে সে দুর্ঘটনার খবর শুনতে শুনতে।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওই বুক ঠেলে ওঠা ঢিবিটাতে যদি মোবারকের জীবন-ইতিহাসের পাতা উল্টানো থেমে যেত তবে আজ অন্তত: আকবর ইদ্রিশ জাহাজের সব জাহাজীরা ওকে পাগল বলে হাসি মস্করা করতে সাহস পেত না। ঢিবিটা এবং

টিবির উপর ঐ কাঠের ক্রসটা আজও তার জীবনে জীবন্ত বিদ্রূপ তাই। হাজার গুণাহ্‌গারের একটি অতীত প্রতীক চিহ্ন।

অতীত প্রতীক চিহ্ন বাপজী শামীনগড় ছেড়ে চলে গেলেন। শেষবারের মত মোবারক কর্ণফুলির বাঁওড়ে দেখেছিল নৌকার মাস্তুলের শেষ ডগাটা। তারপর··?

তারপর কর্ণফুলি থেকে কলকাতা। কলকাতার বন্দরে কোম্পানীর জাহাজ, বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে একটি মাত্র চিঠি। তাতে জাহাজ ছাড়ার খবর। আম্মাজান আর মোবারকের দোয়া—কোন্ কোম্পানীর জাহাজ, কোথায় যাওয়া হবে। প্রতি সফরে কলকাতায় গিয়ে যেমনি একটি মাত্র চিঠি দেন তেমনি চিঠি।

আম্মাজান প্রতি বারের মত সেদিন নাকের নথ দুলিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মবুকে দেখালেন। বললেন, তোর বাপজীর খত। মুন্সীজীর কাছে যা—খতে কি লেখা আছে সব শুনে আসবি।

খুসী খুসী মন আম্মাজানের। মবুর মুখে তাই বার বার চুমু খান। মুখটাকে ছোপ-ছোপ লালে-লাল করে দেন। তিনি অনেক সোহাগ করলেন মবুকে। এবং এক সময় ওকে টেনে আনলেন বুকে। আম্মাজানের উষ্ণ স্পন্দন নাবিক বংশের উত্তরপুরুষকে শোনালেন। যেন বলতে চাইলেন, শুনে রাখ মবু এই স্পন্দনে কত ব্যর্থতার গ্লানি ডুবে আছে।

মবু শেষে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে আতাবেড়ার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল শামীন-গড়ের শেষ গড়ে। গেল সে মুন্সীর বাড়ী। ঝোপের নীচে উঁকি দিয়ে ডাকল, বাড়ী আছেন চাচা।

—কে? ভরাগলায় উত্তর করলেন চাচা।

—আমি মবু। খত আছে বাপজীর। মেহেরবাণী করে খতটা পড়ে দেবেন?

খড়ম পায়ে মুন্সী-চাচা ঝোপের পাশে এসে দাঁড়ালে। চশমার ফাঁক দিয়ে মবুকে দেখে বললেন, কিরে কদিনে বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছিস। বলে খতটা মবুর হাত থেকে নিয়ে নিজে একবার পড়লেন, পরে জোরে জোরে মবুকে শোনালেন।

মুন্সীজী জানেন খতটা একবার পড়ে দিলে মবু যাবে না। পড়তে হল তিন থেকে চারবার। সমস্ত খতটা সে হুবহু মুখস্থ করবে শুনে শুনে। বাড়ীতে পৌছে আম্মাকে মুখস্থ বলবে। বলার ভঙ্গী দেখে আম্মা বলবেন, মবু আমার মৌলভী হবে। মুন্সীজীর চাইতে বেশী পড়াওয়ালা আদমী হবে। মবুই আম্মার এসে সে সব কথা খত পড়াবার সময় মুন্সীজীকে বলেছে, সেই শুনে দাড়ি নেড়ে হেসেছেন তিনি।

সেখান থেকে মবু ছুটেছে জৈনবের বাড়ী। গড়ের মেঠোপথে উঁচু-নীচু ছোট-ছোট

ঠিপি মাড়িয়ে সে এল প্রথম সড়কটার উপর। সড়কের দুপাশে মাদার আর পলাশ গাছ। মুখ উঁচু করে সে চাইল একবার। পলাশ আর মাদারের ডালে ডালে ফুল। আকাশ প্রান্ত ধরে দুটো লালরঙের পাড় সড়ক ধরে কর্ণফুলির বাঁওড় পর্যন্ত চলে গেছে। গাঙ-শালিখেরা এসেছে তখন এদিকটার পলাশ ফুলের মধু খেতে। মধু খাচ্ছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডালের শাখা প্রশাখায়।

সড়কের উপর মবুও লাফাল অনেকক্ষণ। ঢিল ছুড়ে লাফাল। পাখা তাড়িয়ে লাফাল। তারপর মেজাজ মত গেল সে জৈনবের বাড়ী।

জৈনব উঠোনে। জৈনব খেলছে। উঠোনের উপর অনেক ঝাঁপি। ওর বাপ ঝাঁপি খুলছে। সাপ টেনে বের করছে জৈনব।

সাপগুলো ছোবল দিতে চায় জৈনবকে। সাপের অসহায় কেরামতিগুলোর দিকে চেয়ে সে হাসলো।—পাররি ছোবল দিতে। বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাসল খিল খিল করে।

মবুকে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জৈনব গেল ওর পাশে। হাত ধরে টানল। বললে, আয় আয়, দেখবি কত সাপ বাপজী পাহাড় থেকে ধরে এনেছে।

একটা সাপ ফোঁস করে উঠেছে মবুর মুখের সামনে।—নাম এর কাল কেউটে, এইটির নাম চন্দ্রবোড়া। চন্দন তিলক এ পাশের ঝাঁপিতে। দুধরাজ সাপ দেখবি? বলে জৈনব বাপজীর প্রতি চোখ তুলে তাকাল। ওটা খুলবি না। বাপজী জৈনবকে ধমকের স্বরে বললেন। উঠোনের উপর জৈনব আর মবু।

জৈনব ডাকে মবুকে, ও মাতব্বর মিঞা ওটা হাতে কি?

—বাপজানের খত। কলকাতা থেকে আম্মাকে খত দিয়েছে।

—বিদেশ-ভুঁই-এ থাকলে তুমি আমায় খত দেবা না?

—জরুর দেব।

শাড়ীটা পরেছে জৈনব প্যাচ দিয়ে দিয়ে। বুকের উপরটা খালি। ফাল্গুন মাস পড়েছে। শীত এখনও যায় নি। শীতে সাপগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এক এক করে ঝাঁপি তুলছে বাপজী ঘরের ভিতর। সন্ধ্যায় পাইকার আসবে সাপ কিনতে। তাই সাপগুলোকে বালতির জলে ধুয়ে সাফ সাফাই করে রেখেছে বাপ-বেটি মিলে।

হঠাৎ খেয়াল হল মবুর, আম্মাজান আতাবেড়ার পাশে বসে আছেন। চোখ দুটো বেড়ার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চন ফুলের গাছটাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। বাড়ীতে ঢোকার আগে প্রথম কাঞ্চন ডালের নীচে দিয়ে মাথাটা বাড়াবে মবু। আম্মা তা জানেন।

তাই কাঞ্চন ফুলের নীচের ফাঁকা পথটা অনেক প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশার প্রতীক। আম্মাজান প্রত্যাশায় আছেন মবু এক্ষুনি অনেক খবর নিয়ে আসবে বাপজীর।

মবু আতাবেড়ার ওপাশটায় চোখের উপর চিঠিটা রাখল বিজ্ঞের মত। আর অজ্ঞের মত কথাগুলি আওড়ে গেল। আম্মাজান তাই দেখে হি হি করে হাসলেন। হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কাছে এলে মবুর হাত ধরে বললেন, দুষ্টু ছেলে! তোর বাপজীর জাহাজ ছাড়তে আর মাত্র তিন দিন। এ তিন রাত আমরা ঘুমোব না কেমন?

—কেন ঘুমোব না?

—তোর বাপজীর কথা, বসে বসে ভাবব।

বেটা আর বিবি একটি সফর যাওয়া মানুষের জন্য মোনাজাত করবে।

—বেশ হবে না আম্মা?

—ভাল হবে। তোর বাপজী তবে দরিয়ার কোন ইবলিশের হাতে পড়বেন না। আল্লা ওর সব কশুর ক্ষমা করবেন। তিনি দুটো আঙুল ঠোঁটে ছুঁয়ে হাতটা মবুর চোখের উপর নাড়তে থাকলেন। মবু খপ করে একটি আঙুল ধরলে বললেন, বাপজীর তোর এবার ছ মাসের সফর। কি মজা।

দুটো আঙুলে দুটো সময় নির্দিষ্ট করে আম্মাজান প্রতি রাতে নীল কাঁথার নীচে এমন করতেন। যখন শামীনগড়ে সন্ধ্যা নেমে আসত পাহাড় অলিন্দে এই ছোট্ট গাঁয়ে যখন আজান দিত মসজিদে মৌলভী, তখন আম্মাজান নামাজ পড়তে বসতেন মবুকে পাশে নিয়ে। দুজন মিলে আল্লার কাছে অনেক মেহেরবাণীর জন্য দোয়া মাগতেন। তার খসম, তার পিয়ার, অনেক দূরের মানুষটির তবিয়তের জন্য অনেকক্ষণ মোনাজাত করতেন।

শামীনগড়ের এই টিনকাঠের ঘরটিতে এভাবে কতদিন গেল। কত প্রহর আপন মরজিতে কালের সঙ্গে মিলে গেল। কত জোনাকী জ্বলে আবার সড়কের ধারে নিভে গেল তবু আম্মাজানের প্রত্যাশার হাতছানি লেগেই থাকল চোখের অঙ্গনে।

রসীদ চাচা আসতেন গাওয়াল করতে। আতাবেড়ার ওপাশ থেকে হাঁকত, ভাবি এলাম। পান সুপারী রাখবে নাকি এস। মিঞা মাথার ঝাঁকা নামতো আর মুখের উপর গামছা ঘুরিয়ে বলত, ভাবি ভাইয়ার কোন খত এল?

আম্মাজান আতাবেড়ার এপাশে মবুর হাত ধরে বলতেন—কৈ না তো! কোন খত এল না তো। মিঞার কাছে কোন খবর আছে নাকি?

আম্মাজান কথা বলতেন মবুর কানে ফিস ফিস করে। মবু সেই কথাগুলি

কবিতার মত আওড়ে রসীদ চাচাকে শোনাত। অর্থাৎ কথা হত মবু আর রসীদ চাচার ভিতর। আম্মাজানের ফিস ফিস গলায় আওয়াজ উঠত মাত্র।

দণ্ডের সঙ্গে কত প্রহর এল। প্রহরের সঙ্গে দিন এল। দিনের সঙ্গে এল এবার মাস। মাস কালের সঙ্গে মিশে গেল। খত এল এবার দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। বাপজী গেছেন সেই এক কোন্ দেশে যেখানটায় তাল তাল সোনা নিয়ে আসার জন্য ওর পূর্ব পুরুষ গিয়েছিল কোন এক কোম্পানীর জাহাজে—কিন্তু ফিরে আসেন নি।

আম্মাজান হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মবু রে মবু।

মবু ডাকল, জি আম্মা। চোখে জল কেন? কাঁদছিস কেন আম্মা? তোর বাপজী এবার দক্ষিণ দরিয়ায় গেল, কি হবে!

—কি হবে? ফিরে আসবে সফর শেষে। তোর আর আমার জন্য চীজ নিয়ে আসবে অনেক।

খতে লেখা ছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুক ধরে আমাদের জাহাজ নিউজিলাণ্ডে যাচ্ছে বিবি। মাল খালাস করে জাহাজ সিডনী যাবে। তারপর দেশে ফিরবে। আমি আবার তোকে আর মবুকে দেখতে পাব। মবু নিশ্চয়ই আমার কথা আজকাল খুব বলে। এসেই কি হবে বলতো? বলতে পারলি না! বেটার সাদী হবে। অনেক টাকা এবার কোম্পানীর ঘরে পাওনা হবে। এক বেটার সাদি। কত লোক লস্কর! কত মেমান! কত দৌলত! আর অনেক দাওয়াত। জৈনব নিশ্চয়ই আর একটু বড হয়েছে। ওকে আমার দোয়া জানাবি। মালিক গফুর ভরসা। বলে খত শেষ করেছিলেন বাপজী।

এবার থেকে মবুর চোখের উপর আম্মাজানের আঙুল নাড়ানো আরো বেড়ে গেল। নীল কাঁথার নীচে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ এই রকম চলত আর বাপজীর বলা অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হত। আতাবেড়ার ওপাশটায় যদি কারো ডাক উঠত, আম্মাজান মবুকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতেন—কোন খবর যদি মানুষেরা নিয়ে আসে। যদি খবর দেয় মবুকে, কর্ণফুলির বাঁওড়ে তার বাপের নাও কেউ দেখে এসেছে।

কৈ কেউ তো কোন খবর দিল না। যারা এল তারা সকলেই জোত জমির কথা —হালচাষের কথা, দেশের কথা বলে মবুর কাছে বিদায় নিল। আতাবেড়ার এ পাশের কোন খবরই বয়ে আনল না তারা।

কত-পুরুষ আগে নানীও এমনি অপেক্ষা করতেন বিছানায় শুয়ে। তখন এ ঘর থেকেই বাঁওড়ে লগির শব্দ শোনা যেত। নানী কাঁথা থেকে শীতকালে মুখ বার করে রাখতেন। লগির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। যদি ক্রমশ দূরে সরে

যেত শব্দটা তিনি হতাশার চিহ্ন আঁকতেন মুখে। আর বুঝি এল না। ঘাটে বুঝি আর নাও বাঁধল না। শামীনগড়ের মানুষদের এখন অনেক হাঁটতে হয়। বাঁওডেব লগির শব্দ আর এ ঘরে এসে পৌঁছায় না।

আম্মাজানেব পাশেই শুয়ে থাকে মবু। ওর চোখে গভীর ঘুম। কুলুঙ্গী থেকে আম্মা কুপিটা মবুর মুখের উপর ধরতেন। সেই মুখে মবুর বাপজীকে অনুভব করাব চেষ্টা কবতেন। হিজল পাহাড়ের বাতাস তখন নেমে আসত জানালাটার উপব। সেই বাতাসে জানালা দবজা ঠক-ঠক কবে নডত। আম্মাজান চমকে উঠতেন। ডেকে তুলতেন তিনি তখন মবুকে। বলতেন মবু ওঠ, কে যেন বাইরে দরজা নাড়ছে।

তিনি ভাবতেন হযতো মবুব বাপজী। হযতো নিভৃতে এবং নীবব অন্ধকাবে তিনি এসে টিনকাঠের ঘবটায় চুপি চুপি উঠেছেন বিবিকে অবাক কবে দেবাব জন্যে। গেল সফরের আগেব সফরে তো তিনি তাই কবেছিলেন। অন্ধকারে দাঁড়িযে দরজায় চুপি চুপি নেড়েছিলেন। আম্মাজান যত ডাকছেন ভযে ভযে কে। কে। কে, বারান্দার ছায়াটা দেওযাল সংলগ্ন হয়ে চুপ করে ছিল। তারপর এক সময আম্মাজান চীৎকার করে উঠলে—তিনি বলেছিলেন, বিবি আমি বে আমি! দবজা খোল।

দরজা খুললে দেখতে পেয়েছিলেন বাপজীব দুটো দুষ্টমী ভরা চোখ। চোখে অনেক কালেব বিবিকে-বেটাকে না দেখার আবজি। শেষে আম্মাজান বাপজীব সংলগ্ন হয়ে তক্তপোশটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং দুজন একসঙ্গে মবুব মুখেব উপর ঠোঁট বেখেছিলেন। বাপজীর গলায় অনেক কথাব প্রকাশ তখন, কোম্পানীব আরজি আর খোদার মরজি কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ শুনি উড়োজাহাজে আমাদের আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসতে হবে। জাহাজ নাকি আর তাদের চলছে না।

আম্মাজান ভাবতেন এ সফরটাতেও যদি কিছু এমনি একটা হয়। একটা উড়োজাহাজ যদি বাপজীকে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেয়। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা তাই জমা হতে থাকল তাঁর দিনের পর দিন।

কিন্তু বাপজী তো ফিরছেন না!

শামীনগড়ে এল বৈশাখ মাস। ভর দুপুরে ঘাটে আম্মাজান জল আনতে গিয়ে কেমন আনমনা হয়ে কাঞ্চন গাছের ফুলগুলির দিকে চেয়ে থাকেন আর ঘরে ফিবে মবুকে বলেন, না একটা খত, না এসে পৌঁছাল। বাপজী তোর ভাবে কি বলত? জাহাজ ফিরতে দেরি হয় তো একটা খত লিখে দে দুলাইন। তা দিবি না পর্যন্ত। বাড়ীর লোকগুলির কি করে দিন কাটছে সে হিসেব পর্যন্ত রাখে না লোকটা।

হিঙ্গল পাহাড় আর মৌরী-পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যে আকাশটা শামীনগড় থেকে দেখা যায়, সেখানে কদিন থেকেই মেঘ জমতে সুরু করেছে। মেঘে মেঘে আকাশ দিন দিন কালো হয়ে উঠছে। শামীনগড়ের মানুষেরা ভাবল এবার জল ঝড় কিছু একটা হবেই। কাল বৈশাখী পাহাড় চিরে এদিকটায় নেমে আসবেই।

আম্মাজান কি ভেবে সেদিন জানালা দিয়ে সে আকাশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। জল ঝড়ের রাতে একা একা তাঁর বড্ড ভয়। মবুর উপর এখনও তিনি নির্ভর করতে পারছেন না।

সেই জল ঝড়ের দিন আবার এসে গেল।

বিকেলে ঘাট থেকে জল এনে মবুকে বললেন আম্মাজান, কোথাও যাসনে। দেখেছিস আসমানটা কেমন কালো করে আসছে!

সে রাতে আম্মাজান সকাল সকাল খেয়ে মবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেশলাই ঠিক করে বালিসের নীচে রাখলেন। কুলুঙ্গীতে কুপির সলতে তুলে ধরলেন উপরে। তারপর মোটা সলতেয় আগুন ধরিয়ে জল ঝড়ের রাতকে ঠেলে দিতে চাইলেন দূরে।

এমন রাতকেই আম্মাজানের ভয়; এমন রাতে তাঁর বুক ফেটে কান্না ওঠে। অভিমানে বাপজীকে তখন গালমন্দ দেন, বেইমানী আমার সঙ্গেই করলা মিঞা! তঞ্চকতা করে আমার জীবনটাকে মাটি করে দিলা।

ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মেঘে মেঘে ঢেউ দিচ্ছে আকাশে। দক্ষিণ সমুদ্র যেন ফুঁসে ফুঁসে শামীনগড়ের এই ছোট্ট টিনকাঠের ঘরকে পর্যন্ত গিলতে আসছে।

এক এক করে ঘরে জানালাগুলি বন্ধ করে দিলেন তিনি। শেষ জানালাটা বন্ধ করার সময় প্রশ্ন করলেন, তোর বাপজীর জাহাজ, ঝড়ের দরিয়ায় না বন্দরে?

মবু উত্তর করে নি। সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝড় বাদলের রাতে ওর চোখে ঘুমটা যেন বেশী করে আঠার মত লেগে থাকে।

বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ পেয়ে শেষে জানালাটা বন্ধ করলেন। তক্তপোশে ফিরতে না ফিরতেই অনুভব করলেন ঝড়ের বেগে টিন কাঠের ঘরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকের জানালার একটি কবাট ঠাস করে খুলে গেল। বর্শা ফলকের মত বৃষ্টির ছাট আর ঝড় এসে ঢুকছে ঘরে। বিছানা-পত্র ভিজিয়ে ভয়াবহ করে তুলেছে ঘরটাকে। আম্মাজান ডাকলেন, খোদা! ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেবার সময় দেখলেন মবু ভয়ে তক্তপোশের উপর বসে কাঁদছে।

জানালাটা বন্ধ করলেন! তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়ালেন আবার। মবুকে

জড়িয়ে ধরে বললেন, খোদাকে ডাক মবু। তিনি ছাড়া আমাদের আর কে আছেন।

ভীষণ শব্দ। ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। কড় কড় করে আকাশের অনেক রাক্ষুসে শব্দ আছড়ে পড়ছে শামীনগড়ের অনেক উঠোনে। দরজাটা কে যেন বাইরে থেকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি দরজাটার দিকে চেয়ে শঙ্কিত হলেন। এক্ষুনি হয়ত ওটা ওল্টে পড়বে। দরজার পাশে গিয়ে ভারি কিছু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা দরজাটা ভেঙ্গে পড়বে এক্ষুনি! সঙ্গে সঙ্গে টিনকাঠের শক্ত ঘরটা পাখীর মত উড়তে থাকবে আকাশে।

উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। দরজার কাছে এসে মানুষের শব্দ পেলেন। বারান্দায় পড়ে কোন মানুষ যেন গোঙাচ্ছে। কিন্তু মানুষটা কে, কোন মাঠে সে ঝড় পেয়েছে, এত বাড়ী থাকতে শামীনগড়ে এখানেই বা কেন, শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ের জন্য কিছুই ভিতর থেকে জানতে পারলেন না। তবু অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে দরজার উপর কান রাখলেন তিনি।

আঁতকে উঠলেন আম্মাজান। শুধু কয়েকটি শব্দের পুনরাবৃত্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মুখে।

আম্মাজান আড়ষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন, মবু এদিকটায় আয় রে বাপ। তারপর দুজনে দরজার উপর আবার কান রেখে সন্তর্পণে শুনলেন—বারান্দার, মানুষটি গোঙাতে গোঙাতে বলছে, দরজা খুলুন, আপনাদের টেলিগ্রাম।

দরজা খোলা হল। আম্মাজান আর মবু অন্ধকারে বারান্দার উপর হাতড়ে হাতড়ে বেড়ালেন লোকটাকে। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন দাওয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে মানুষটা। ঝড় আর শিলাবৃষ্টির আঘাতে মানুষটি আর উঠতে পারছে না। ওকে ধরে তুলে আনার সময় আবার শুনলেন আম্মাজান, আপনাদের টেলিগ্রাম। দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ ডুবির খবর আছে। মজিবর রহমান সে জাহাজের জাহাজী।

চোখে জল নেই আম্মার। শুধু কটি অস্পষ্ট শব্দ। সে শব্দ ঝড় জল রাতকে বিদ্রূপ করছে। তিনি দুটো হাত অবলম্বনের জন্য মবুর প্রতি বাড়ালেন—কিন্তু তার আগে গফুর মালিক এ কি করলে বলে, মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তারপর সমস্ত রাত ধরে ঝড় জলে নিঃঝুম হয়ে থাকল ঘরটা। শামীনগড় কোন খবরই রাখল না তার।

সকাল বেলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের কোলে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সব মানুষেরা জানল কর্ণফুলির বাঁওড়ে আর

বাপজীর নৌকোর লগির শব্দ উঠবে না। শামীনগড়ের জাহাজী জীবন থেকে একজন জাহাজী বিদায় নিল।

সব খবর শুনে শামীনগড়ের সমাজ চুপ মেরে গেছে।

শিউরে উঠেছিলেন বার বার আম্মাজান সেদিন।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক জাহাজ ডেকে মোবারক, শেখর, জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা আর এক ইতিহাস শুনে শিউরে উঠল।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা তখন দেখল দূরের একটা ঢিবি। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার ক্রস। দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে একদল সমুদ্র পাখী। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন, কথাগুলো বিবর্ণ। কথাগুলো জাহাজীদের ভয়াবহ দিনের কথা।

জাহাজীরা ডেকের উপর দাঁড়িয়েছে সরল রেখার মত করে। পাহাড়ের উপর কাঠের ক্রসটিকে দেখে ক্যাপ্টেন, বড় মালুম, মেঝ মালুম বুকের উপর ক্রস টানছে। বাইবেল থেকে একটি সঙ্গীতের সুর তুললেন কণ্ঠে। আর অন্যান্য ভারতীয় জাহাজীরা তাদের ধর্মীয় মতে ক্রসটাকে শ্রদ্ধা জানাল।

মুবারক চুপ করে সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বলছেন, বিশ বছর আগে কোম্পানীর জাহাজ ফিরছে নিউপ্লাই-মাউথ থেকে সিডনীতে। সিডনী থেকে জাহাজীরা যার যার দেশে ফিরবে বাড়ীতে বাড়ীতে তারা খত পাঠিয়ে দিয়েছে। চীজ কিনে জাহাজ বোঝাই করেছে বিবি বেটা মেমানদের জন্য। কিন্তু রাতের টাইফুনে কিসে কি হল। ভয়ে দিশেহারা হল সুখানী আর তিন নম্বর মালুম সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ ঢেউ দেখে আর গর্জন শুনে। ভুলপথে জাহাজ এসে ধাক্কা খেল ঐ পাহাড়টায়। পাহাড় তখন জলের নীচে। পাহাড় মাত্র গড়ে উঠছে। আঘাত খেয়ে জাহাজের নীচটা চিরে গেল। কাজেই কোন উপায় থাকল না জাহাজীদের বাঁচবার। লাইফ-বেল্ট পরে সবাই এসে উপরে জড় হল। লাইফ-বোট হাড়িয়া করতে গিয়ে অনেকে ছিটকে জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভীষণ ঝড়ের জন্য কিছুতেই বোট শেষ পর্যন্ত হাড়িয়া করা গেল না। একটা বোটের হাসিল ছিঁড়ে গেল। আর একটা বোট উল্টে কোথায় ভেসে গেল কোন জাহাজী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখল না। বেতার সংকেতে শুধু এক খবর জাহাজ ডুবছে। রেস্কু পাঠাবার মত সময় আর আফিসের হল না।

রাত তখন বারোটা।

জাহাজ ডুবির প্রায় দশবছর বাদে কোম্পানীর ক্যাপ্টেন সুপারিটেনডেন্ট এই পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখে গেলেন সেই পাহাড়টা সমুদ্রের উপর ধীরে ধীরে জাগছে। সবুজ শ্যামল প্রলেপ পড়ছে প্রবাল দ্বীপে। তিনি সেই মৃত জাহাজীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাহাড়ের উপর বেদী গড়লেন। একটি কাঠের ক্রস প্রতিষ্ঠা করলেন। ঝড়ের দরিয়ায় নির্ঝরের বাণী আহ্বান করলেন। আজও তাই কোন জাহাজী যখন এই পথ ধরে যায় তখন এই দ্বীপটির কাছে এসে সকলে হাত তুলে প্রার্থনা করে। প্রভু, জাহাজ আর জাহাজীদের শান্তি দাও।

জাহাজীরা সকলেই মিনিটকাল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর যে যার মত কাজে চলে গেল।

একমাত্র মোবারক ডেক ছেড়ে অন্যত্র গেল না।

শেখর নীচে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ডাকল, এবার চল।

মোবারক ডেক থেকে নেমে যাওয়ার সময় শেখরকে শুধু একটি প্রশ্ন করলে, সমুদ্র পাখীগুলো দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উড়ে উড়ে কাঁদছে কি আনন্দ করছে?

বিরক্ত হয়ে শেখর জবাব দিলে, কি করে বলব!

নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না। জৈনবের কসম।

কথাগুলি বড় বড় হরফে স্ক্রেপার করা বালকেডের উপর চক দিয়ে লিখল মোবারক।

'নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না'—পড়ে পড়ে সে হাসল।

সব বেইমান। বাপজী আম্মাজান। বেইমান জৈনব খাতুন।

চোখ ঢাকল মোবারক। দুটো হাত বাড়িয়ে বাংকের কাছে এল। বললে, দেখতো শেখর হাত দুটো আমার কোনদিন বেইমানী করেছে কিনা। বেইমানীর কোন চিহ্ন আছে কিনা।

শেখর বিস্মিত হল না। জাহাজের সব জাহাজীদের মত সেও বুঝি জেনে নিয়েছে মোবারক উন্মাদ। লিলিকে ছেড়ে এসে আরো উন্মাদ হয়ে গেল। কিন্তু সে অন্যান্য জাহাজীদের মত তাকে বিদ্রূপ করে না। সে চায় মোবারক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। সে যদি ঘুমোত।

শেখর আহত হাত দুটো নিয়েই উঠল কোনরকমে। মোবারকের হাত টেনে বললে, আয় ঘুমোবি। অমন বিড়বিড় করে আর বকিস না। স্বাভাবিক ভাবে দুটো কথা বল। ঘুমো। লিলিকে ভুলে যা, দেখবি মনটা অনেক হাল্কা হবে। আমার

হাত দুটোর দিকে চা। দেখ এর কত যন্ত্রণা! দয়া হয় না তোর। তার উপর তুই যদি দিন-দিন এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠিস তবে জাহাজে দিন আমার কি করে কাটে বল তো?

মোবারক চুপ করে থাকল। শেখর হাত টেনে আবার বলল, বালকেডের উপর ও কথাগুলো লিখলি কেন?

জৈনবের কসমের কথা মনে পড়ল তাই লিখলাম। নাবিক হও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না—জৈনব হরিতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কসম দিয়েছিল। বলে কেমন পাগলের মত আবার হেসে উঠল মোবারক।

কি দেখছে মোবারক পোর্টহোল দিয়ে! শেখর বিস্মিত হল! গলা বাড়াল ঘুলঘুলিতে। সন্তর্পণে দেখল সে পাহাড়টা। আবছা একটুকরো মেঘের মত এখনও আকাশ কিনারায় ভেসে আছে। কাঠের ক্রসটা কখন আড়াল পড়েছে পাহাড়ের।

শেখর কাঁচটা দিয়ে প্রথম ঘুলঘুলিটা বন্ধ করে দিল। লোহার চাকতিটা দিয়ে ঢেকে দিল কাঁচটা। বুকের উপর একটি আহত হাত ঝুলিয়ে সে এল তারপর মোবারকের কাছে। বললে, কারো বাপ বুঝি আর জাহাজ ডুবিতে মরে না?

মোবারক চাইল শেখরের প্রতি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কাঁচ দিয়ে ঘুলঘুলি বন্ধ করলেই কি আর বন্ধ হয়! শেখর কি ভেবেছে লোহার পাত দিয়ে মনের উৎপাত-গুলিকে বন্ধ করে দেবে! ঘুম যে আসে না—গুণাহ্ যে হাজার গুণাহ্, বাংকের পরতে পরতে যে সাপের অনেক ছোবল—শঙ্খচূড়টা জৈনবের ভালবাসার জীবন্ত ফসিল সেগুলিও কি শেখর একটা ভঙ্গুর কাঁচ দিয়ে চেপে দিতে চায়! আর বলতে চায়, ওসব কিছু না। ওসব তোর অনর্থক এবং অহেতুক মনের জট।

এই অনর্থক এবং অহেতুক মনের জটগুলি সে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বহুবার। কিন্তু বার বার তার অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। চেষ্টার সঙ্গে জটের বন্ধন বেড়েছে। অনুতাপ অনুশোচনায় বার বার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েছে বুকটা।

লিলির বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর অনুশোচনা হাজার গুণে বেড়েছে। জাহাজের সকলকে সে অবিশ্বাস করতে সুরু করেছে।

আর শেখরটা যেন কেমন। কেবল যখন তখন বলে, ঘুমো ঘুমো। কিন্তু সে ঘুমোতে পারছে কৈ। দুঃখ যে তার অনেক।

শেষ পর্যন্ত কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল মোবারক। প্রতিদিনের মত কনুইটা রাখল চোখের উপর। ব্যাংকের নীচে শীতে শঙ্খচূড়টা নিশ্চয়ই লজ্জায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।—লাজ আছে তবে জৈনবের। লজ্জাবতী আমার! আম্মাজানের মতই তুই বেইমান।

আম্মাজান তখন অনেক ফারাকে। জৈনব তুই খিল খিল করে হেসেছিলি হরিতকী গাছের নীচে। মনে তোর আগুন। যে আগুনটা কুদরত মিঞার কপালে শেষ কাঠালে একটা হেই করে ছেঁকা দিয়েছিল।

হঠাৎ পাশের বাংকটাকে উদ্দেশ্য করে বললে মোবারক, সাপে কাটা মড়া দেখেছিস শেখর ?

পাশের বাংকটা যেন বিরক্ত হল। উত্তর করলে, না।

—সাপের ছোবল খেয়েছিস ?

—না।

—মেয়ে মানুষের ছোবল ?

শেখর ধমক দিল মোবাবককে।' এসব কি হচ্ছে শুনি। এর নাম ঘুম! এ ভাবে মানুষ ঘুমোয়। কত আর জ্বালাবি বলত ? অহেতুক মনের জট নিয়ে নিজে জ্বলছিস, আমাকে জ্বালাচ্ছিস। এ কি তোর উচিত হল ? এত করে বলি ঘুমোতে আর তুই কম্বলের নীচে থেকে বলছিস, মেয়ে মানুষের ছোবল আমি খেয়েছি কিনা!

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মোবারকের মনটাকে কুবে কুরে খাচ্ছে। এক নিদারুণ উত্তাপ ওর মনের প্রকাশ কবার আগ্রহকে উত্তপ্ত কবে তুলছে। শেখর কেমন হৃদয়হীন। নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে সে কেমন বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু প্রকাশের আগ্রহটা যখন একান্ত ওকে উন্মাদ করে তোলে তখন খাপছাড়াভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ধমক খায় শেখরের, আর বাজে বকিস না। দুটো পায়ে পাড় এবার। ঘুমো, ঘুমো বলে—বালকেডের উপর কি কতকগুলো আঙুল দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা টানে। রেখাগুলো যেন আর কটা দিন আছে সফর শেষে ঘরে ফেরার হিসেব।

মোবারক বেহায়ার মত আবার বললে, এমন করে আমার বাপজীও দাগ টানতেন। হিসেব করতেন আর কতদিন বাকী কর্ণফুলির বাঁওড়ে নৌকা বাঁধার।

শেখর কোনই উত্তর করল না। মুখ ফেরাল মাত্র।

দুটো আরশোলা লকারটার নীচ থেকে বের হল এবং শঙ্খচূড়টা যে ব্যাগের ভিতর আছে তার ভিতর ঢুকে গেল।

—তাহলে তুই ঘুমোবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস ?

—ঘুম পেলে ঘুমোব। ছোবল তবে তুই মেয়ে মানুষের খাস নি ? কথাটার বাঁক ঘুরাল এবার।

শেখর বিরক্ত হল এবারও। বাংকের উপর সে উঠে বসল—এমন করবি তো ফোকসাল থেকে বের হয়ে যাব বলছি।

—বের হবি ? কেন ? আমি উন্মাদের মত কথা বলছি ! আকবর ইদ্রিশ তো আজ মুখের উপরই এ কথা বললে। তুনম্বর বয়লারটায় তখন কয়লা মারছিলাম তাই রক্ষে। ছাপোষা মানুষ, তার আবার এত সাহস।

—ওরা ঠিক বলেছে। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল শেখর। না ঘুমিয়ে সারাদিন ধরে বিড় বিড করলে ওরা বলবেই। ঘুমো—আগের মত চুপচাপ থাক, দেখি কার কত বুকের পাটা।

ওরা ঠিক বলেছে—মোবারক উন্মাদ। কথাগুলো কবার করে মোবারক মনে মনে আওড়াল। শেষে সে উঠে শেখরের বাংকের পাশে দাঁড়াল। বললে, তুই অসুস্থ। বেশী ওঠাবসা করিস না। শুয়ে পড। শেখরের আহত হাতটা বুকে নিয়ে আবার বললে মোবারক, আমি উন্মাদ নই। তবে তোর যখন ঘুম আসে না তখন ডেকে যাই আমি বরং।

নুয়ে নুয়ে চৌকাঠ অতিক্রম করার চেষ্টা করল মোবারক। ডেকে ওঠে যাওয়ার জন্য স্টোর-রুমের পাশে এসে দাঁডাল। মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার শেখরকে। বোবা চোখ তুটো ওর এতটুকু নডছে না। অপলক। স্থির। সে পা বাডাল তবু।

শেখরের সকরুণ কণ্ঠ শুনল সে আবার, উপরে যাসনে। ফিরে আয়। চারটে না বাজতেই আবার পরী। শুযে ঘুমো। আমার কথা রাখ। তুই ঘুমুলে আমি সত্যি খুব সুখী হব।

সুখী হবে ! সুখী হওয়ার মত এমন কি সম্পর্ক আমার সঙ্গে ! যারা সুখী হতে পারত তারা সুখী হয় নি। ইচ্ছে করে হয় নি। অন্য পথ ধরে তারা চলে গেল। মবুর কথা তখন তারা ভাবে নি। শামানগডের সডক, মাটি, হরিতকী গাছ, পলাশের লাল ফুল, মৌরী পাহাড়ের লালচে ঘাস পর্যন্ত ব্যথায় বিমর্ষ হয়েছিল সেদিন। অন্ধকার রাত। সে সময় সডক থেকে মাঠে এসে নামছে মোবারক।

—কে ! কে ডাকছে ?

—সারেং ডাকছে।

—কেন এমন সময় সারেং ডাকল !

—তা আমি কি করে বলব ? ইদ্রিশ কথাগুলোর জবাব দিল উদাসীন ভাবে যেন সে কোন খবর রাখে না।

মোবারককে আর নামতে হল না নীচে। সারেং তখন উঠে আসছে। সকলের
ক অপমান করল। অন্য কোন জাহাজীকে উদ্দেশ্য করে যেন
ষীম ওঠে নি। কেবল শাবলের পর শাবলই হাকড়ে গেছে।

না একবার স্লাইস, না একবার র‍্যাগ! পাগলামী করতে হয় দেশে ফিরে যেন করে পাগলামী করার জায়গা এ জাহাজ নয়। বেশী উৎপাত করলে বাড়ীওয়ালার কাে নালিশ যাবে।

অবাক হল মোবারক। চোখগুলো টাটাল। ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে থাকতে চীৎকার করে উঠল, সারেং সাব আমি পাগল! আপনিও আমায় পাগল বললেন তারপর লজ্জায় আর কোন দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। আস্তে আে ডেকপথ অতিক্রম করে সে বোট-ডেকে ওঠে গেল এবং মাথাটা দু হাঁটুতে গুঁজে বে পড়ল তিন নম্বর বোটের পাশে।

বুক বেয়ে উঠে এল এবার। জোর করে হাসিটা সে চেপে রেখেছে এতক্ষণ বেশী জোর করতে গিয়ে চোখ থেকে জল পড়ল। জল মুছল জামার আস্তিনে। চোখ তুলে তাকাল সে দূর থেকে দূরে—

একটি য়্যালবাট্রস নীল আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়ে নীল নোনা জলের গভীরে হারিয়ে গেল।

য়্যালবাট্রসের অন্য দলটা হাওয়ার উপর দুলে দুলে পাহাড়টার দিকে ছুটছে। পুরানো য়্যালবাট্রাসটা তখন বসে আছে কাঠের ক্রসটার উপর। চিঁ-হি চিঁ-হি করে কাঁদছে। সে কান্নার মানে একটি মাত্র নাবিক বুঝি জানে। জাহাজে বসে সে বুঝি এখনও দেখছে—নীল অসীম আকাশ আর অনন্ত দরিয়ায় সেই কান্নার মানে টিবি অতিক্রম করে—দূরে, অনেক দূরে, সেই চট্টগ্রামের এক পাহাড় অলিন্দের সড়ক ধরে হাঁটছে। মাথায় তার ঝুড়ি। গাওয়াল করতে বের হয়েছে। কাঞ্চন গাছের নীচে প্রতীক্ষায় উন্মনা দুটো চোখ। সে চোখ আম্মাজানের। পান সুপুরী বিক্রি করতে ভাবির কাছে আসছেন রসীদ চাচা। কাঞ্চনের ডালে আম্মাজান প্রতীক্ষায় ঝুকে আছেন।

ঝুমুনিয়া বিল থেকে ফিরছে মবু। হাতে তার এক জোড়া বালিহাস। কষ্ণা পেতে ধরে এনেছে। কাঞ্চনগাছটা পর্যন্ত এসেছে অন্যমনস্ক ভাবে। জৈনবের ডাগর ডাগর দুটো চোখ, পরিমিত বিস্ময় চোখে। ভাবছে সে চোখ দুটোর কথা। ভাবছে, বালিহাসের জোড়া চোখের উপর তুলে ধরবে। বলবে, দেখ দেখ কি ধরে আনলাম। তোর বাপজীর চাইতে কম আমায় করিতকর্মা ভাবিস না। তোর বাপজী ধরে আনে সাপ, ঝুমুনিয়া বিল থেকে আমি ধরে আনি ডাহুক আর হাস।

দাঁড়াল। আম্মাজান এখানে একা! কাঞ্চনফুলের ডালটায় দেখছেন এত সড়ক ধরে!

মবু পিছন থেকে ডাকল, আম্মা তুই এখানে।

থতমত খেলেন যেন আম্মাজান। গলায় সহজ স্বর আম্মাজানের। তুই কোথায় যাস বলতো। তারপর আবার সড়ক ধরে চাইলেন, বললেন, ওটা কে আসছে রে?

—রসীদ চাচা।

—আসছে যখন ডাকবি, বলবি ভিতরে বসতে। পানস্বপুরী দুইই রাখব। বলে তিনি ধীরে ধীরে আতাবেড়ার ওপাশটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথের উপর ছায়া ফেলে মানুষটা সড়ক ধরে তেঁতুল গাছের নীচে উঠে এল। ছায়াটা এখানে এসে ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর ক্রমশ পা পা করে উঠোনের উপর যেয়ে হাঁকল, চাই পান স্বপুরী। ভাবি এলাম গো। তোকে না দেখলে মনটা আমার ভেজে না। সোবান আল্লা, ওরে মবু বিলের খেতের নাড়া তোদের একটাও নেই। বাড়ীতে থাকিস নিজের জমি-জায়গাগুলোও একবার দেখেশুনে রাখতে পারিস না।

ভাবি আতাবেড়ার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বললে, আর ওর কথা বলবেন না মিঞা। সারাদিন কোথায় থাকে, কি করে ওই জানে। চারগণ্ডা পান দিন, দুগণ্ডা স্বপুরী। কাল চুন লাগবে খয়ের লাগবে। কাল আবার আসবেন।

কত কাল এলেন রসীদ চাচা! কত কাল তিনি আম্মাজানকে পানস্বপুরী দিলেন। খয়ের চুন দিলেন।

হিজল পাহাড়ের মাথায় কতবার চাঁদ উঠল—কতবার নিভে গেল। জাফরাণী রঙের ছায়া হরিতকী গাছের নীচে কতবার নেমে কতবার হারিয়ে গেল। দুটো ছায়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়েছে তখন। ফিস ফিস করে অনেক কথাবার্তা। কত অহেতুক আর অনর্থক কথা কেবল বলছে আর বলছে।

এমন করে কতদিন! এমন করে কতকাল!

চাঁদ আর চাঁদনী রাত। ফুল আর ফুলের সমারোহ। ধানের শীষের মত দুটো পাখী হাওয়ার উপর জীবনের অনেক প্রাচুর্য নিয়ে দোল খেয়েছে এ ভাবে।

কিন্তু একদিন। নীরব তখন হরিতকী গাছের ছায়াটা। খিল খিল হাসিতে ওপাশের জঙ্গলটা কেঁপে উঠল।

আর একদিন। হরিতকী গাছটা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদ নেই সেদিন হিজল পাহাড়ে। অনেকক্ষণ হল অন্ধকার হয়েছে হিজলের জঙ্গল। তারি ছায়া-অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোয় দেখেছিল জৈনবের মুখ মবু। মুখের উপর কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে।

ফিস ফিস কণ্ঠে প্রশ্ন, তুমি কি পাগল মাতব্বর মিঞা। মিঞা তুমি এটা বোঝ না রসীদ চাচার সঙ্গে আম্মাজানের কি সম্পর্ক! চোখের উপর দেখেও চুপ।

মবু সে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জৈনবের মুখ চেপে ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, চুপ চুপ। গুণাহ হবে, অমন কথা বলিস না।

হরিতকী গাছটায় ঠেস দিয়ে তবু জৈনব বলতে ছাড়ল না, মিঞা তুমি আমার মুখ চেপে ধরতে পার। কিন্তু শামীনগড়ের মুখে মাটির চাপ দিবে কি করে!

মবুর চোখদুটো কুঞ্চিত হল। কাছে টেনে নিল জৈনবকে। একটা হাত উপবের দিকে ছুড়ে বললে, কে আছে এমন? শামীনগডে কার এত হিম্মত আছে? বলতে হয় সামনে দাঁড়িয়ে বলুক চুপি চুপি বলবে কেন? তারপর ধীরে ধীরে কেমন উদাসীনের মত বলল মবু, বাপজী একটা খুন করে খোদা হাফেজ বলেছে। আমি শামীনগডের হাজার মানুষ খুন করেও যেমন মবু তেমনি থাকব। আম্মাজানের মুখের উপর কুৎসিত কলঙ্ক লেপ্টে দিলে বাপজীর বেটা তা সহ্য করবে কেন!

রসীদ চাচা আব আম্মাজান। কোথায় আর কি! কলঙ্ক! কুৎসিত কলঙ্ক। ভিখারীর মত দেখতে লোকটা, একপাল কাচ্চা বাচ্চা ঘরে। বিবি খন খন করে কথা কয়। পান সুপুরীর সঙ্গে আম্মাজানের সম্পর্ক। দেহ ও মনের সঙ্গে সম্পর্ক শামীন-গডের মাটি কসম খেয়ে বলুক।

ভীষণ গরম। এলোমেলো কতকগুলি চিন্তা। টুকরো টুকরো গরমের হাওয়া। কামরঙা গাছটা শির শির কবে কাঁপছে। ঘরের ভিতরে আম্মাজান। দুটো তক্তপোশ দুপাশে। সেই তক্তপোশ থেকে রাতের এক ফাঁকে নেমে এসেছে মবু। জৈনবের ঠাণ্ডা দেহটার উত্তাপ নিচ্ছে তখন।

হরিতকী গাছটা অতিক্রম করলে দুটো কাঁঠালী চাঁপার গাছ। দক্ষিণের হাওয়া বইছে। অনেক চাঁপা ঝরছে মাটিতে। অন্য রাতে সেগুলো জৈনব তুলে আনে। মবুর দুহাতে গুঁজে দেয়। কিন্তু আজ কেউ নড়ে দাঁড়াল না। চুপচাপ। কোথায় যেন দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে একটি ঝড়ের অঙ্কুর, একটি ব্যর্থতার অন্ধকার ধীরে ধীরে জন্মলাভ করছে।

জৈনব গলায় অদ্ভুত রকমের শব্দ করল একটা। গলটা টিপে ধরলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। খক খক করে কাসল। কাসতে কাসতে বললে, তোমার মনে কষ্ট দিলাম, কিন্তু কি করব। শামীনগড়ের বুকে বেঁচে থাকার জন্যই এ কথা বলছি। রসীদ চাচাকে তোমার বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিও। নইলে সাদী সম্বন্ধে বাপজী অমত করবেন।

তাই হবে জৈনব। তোর কথাই থাকবে। মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাটাকে সায় দিল মবু। এবার জৈনবকে ছেড়ে আরো পুবের দিকে সরে দাঁড়াল। কাঁঠালী চাঁপা গাছটার নীচে অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে গেল। বারান্দায় উঠে দরজা খুলল অত্যন্ত সন্তর্পণে। আম্মার বিছানার পাশে দাঁড়াল। কুকুরের মত ঘ্রাণ নিল আম্মার দেহ থেকে। নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হল এবার। এত অবিশ্বাস!

আম্মাজানের মুখে এত প্রশান্তি। এত কালের এত ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত এমন প্রশান্তি টেনে দিয়েছে মুখের উপর। কোন মালিন্য নেই—কোন কলঙ্ক নেই। তবু শামীনগড়ের মানুষেরা অসহায় মোবারককে, অসহায় আম্মাকে কোন এক ঘুলঘুলির জীবনে ঠেলে দিতে চায়। এত নিমকহারাম এই মাটি আর জল।

এই জল আর মাটি। কত আরাম আর বিরামের সুখস্বপ্ন এখানে। কত বিনিদ্র রাতে কত গল্প গড়ে উঠেছে। আম্মাজানের গল্প। পূর্ব-পুরুষের অনেক ইতিহাস উনুনের পাড়ে আম্মাজান মবুব সংলগ্ন হয়ে বলেছেন। দুটো জীবন অনেক ব্যর্থতার ভিতরও অনেক মসগুল ছিল।

রসীদ চাচা আর আম্মাজান। অবিশ্বাস আর কলঙ্ক। এই কথাগুলো মবু জৈনবের কাছেই নয় আরো কোথাও কোন পথচলা ইতিহাসের ইঙ্গিতে, কোন এক উপলব্ধির জগতে, যেন সে শুনতে পেয়েছে। তাই সে ফিরে গেল নিজের তক্তপোশে। বালিস টেনে মুখ গুঁজে দিল।

ভোরবেলা আম্মা প্রতিদিনের মত ডাকলেন উঠোন থেকে, ওরে মবু ওঠ। কত আর ঘুমোবি। সকাল কি তোর আর হয় না! মুন্সীপাড়ার ছেলেরা কখন মাঠে চলে গেছে। উঠে একবার মাঠে যা।

মবু সেদিন এ খাট থেকে ও খাট করে নি। খাট বদলে ঘুম যেতে চায়·নি। সোজা উঠে এসে বাঁশ থেকে লুঙ্গী টেনেছে। কাপড় পাল্টে উঠোনে নেমেছে। তারপর কামরাঙা গাছটার প্রতি দৃষ্টি তুলে অন্য কোন এক আসমানের কথা চিন্তা করেছে।

আম্মাজান পিছনে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মবুর পিঠে। বললেন, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। পান্তা খেয়ে মাঠে যা। গিয়ে দেখ লোকগুলি কাজ করছে কিনা। জমি-জিরাতগুলো তুই না দেখলে কে দেখবে বল। মবুর সামনে এলেন তিনি, কি রে চোখগুলি এমন লাল কেন? গোটারাত ধরে ঘুমুস নি বুঝি।

মবু উত্তর করলে না। কামরাঙা গাছ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে এনে আম্মাজানকে দেখল শুধু। তারপর চোখ দুটো মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিল।

আম্মাজান আবার প্রশ্ন করলেন, তুই আজকাল এমন অন্যমনস্ক থাকিস কেন রে।

এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলিস না। ডাকলে সাড়া দিস না—কি হয়েছে তোর ? আমি কি করেছি বলতো ! আমার আর কে আছে তুই ছাড়া ! আম্মাজান উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে আরো বলেছিলেন, ধান উঠুক, জৈনবের সঙ্গে তোর সাদী এ সালেই দেব।

মনের জমাট বাঁধা অন্ধকারগুলো চিরে সেই সকালে মবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল। এ যে সাদী সম্বন্ধের কথা নয়। বলেছিল, কি যে বলিস আম্মা। আমি কি তোর সেই বেটা। সাদির জন্য পাগল হবে তোর মবু !

—তবে কি হয়েছে খুলে বল। এমন চুপচাপ থাকলে আমার বড় ভয় হয়। সফরে যাওয়ার আগে তোর বাপজীও এমন হয়ে থাকতেন। আম্মাজানের কণ্ঠে অনেক অসহায়ের জিজ্ঞাসা সেদিন।

—না না তেমন কিছু নয়। সহজ প্রশ্নটাকে আড়াল করে বললে মবু, বাপ দাদা সাতপুরুষ নাবিক ছিল। আমার খুনে তো তারি ডাক আম্মা। তাই খুন যখন মোচড় দিয়ে ওঠে তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কিছু ভাবিস না আম্মা। দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। কসম যখন খেয়েছি তখন শামীনগড়ের মানুষ হয়েই বাঁচব !

—আচ্ছা আম্মা……। কি বলতে গিয়ে মবু এবার একেবারেই থেমে গেল। আর বললে না কিছু। আম্মাজান প্রতীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ। বেটা তার বলবে কিছু। কিন্তু মবু আর মাটি থেকে চোখ সরালো না। উঠোনের উপর দুজন পরস্পরের প্রতি এক নিদারুণ অবিশ্বাসের জন্ম চিহ্ন নিয়ে নির্বাক থাকল।

আম্মাজান মবুর হাত ধরে টানলেন। এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি ভয় হয় মবু। তুইও কি শেষ পর্যন্ত বাপের মত হবি ? যা, দুটো পান্তা খেয়ে মাঠে যা। ধানগুলো দেখেশুনে তোল। দেশের যে অবস্থা—কখন অকাল আসবে সে ভয়েই মরি।

মবু গিয়েছিল মাঠে। জমি জিরাত দেখার পরিবর্তে মনের ভিতর অবিশ্বাসের চিহ্নগুলোকে বার বার অনুসন্ধান করেছিল যদি সেখানে কোথাও আম্মাজানকে অন্ত মেয়ে মানুষের মত বিচার করা যায়।

কিন্তু……!

কিন্তু যে অনেক।

অনেকগুলো কিন্তুই মবুর মনের ভিতর পাক খেতে থাকল। শামীনগড়ের মানুষেরা তাই তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আর হাসি মসকরা করতে সাহস করল না। কোথায় একটি কিন্তু ধরবে মবু সেই ভয়ে তারাও যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলল।

মাঠে গিয়ে অস্থির এবং অসুস্থ দুইই হয়ে উঠল মন। অসময়ে বাড়ী ফেরার

জন্ত মন মেজাজ বেজায় তাগাদা দিল।. বাড়ী ফিরল সেজন্ত। উঠোনের উপর পা দিয়ে অনুভব করল আতাবেড়াটা কথা বলছে। ও পাশটায় উচ্চকিত হাসি। আম্মাজান আর রসীদ চাচা প্রাণ খুলে হাসছেন। অসুস্থ মনটা আরো অসুস্থ হয়ে উঠল। সে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে হাঁকল, কে ওখানটায় কে এমন করে হাসছে!

আতাবেড়ার পাশ থেকে আম্মাজান সহজ ভাবে বললেন, তোর রসীদ চাচারে মবু। আয় আয়। এত সকাল সকাল মাঠ থেকে ফিরলি আজ।

মবু উঠোন থেকে সোজা উঠে গেল টিনকাঠের ঘরটায়। ক্লান্ত দেহ আর মন নিয়ে এলিয়ে পড়ল তক্তপোশের উপর। মনের ভিতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—এ কি করলাম। আম্মাজানকে এমন কুৎসিত গালমন্দ দিলাম। খোদা একি সত্যি—আম্মাজান রসীদ চাচাকে নিকাহ করতে চান!

ঘরের ভিতর থেকে সে স্পষ্ট শুনল। রসীদ চাচা আম্মাজানকে ফিস ফিস করে বলছেন, ভাবি বিপদে আপদে কিন্তু ডাকিস। তারপর ঝুড়ি মাথায় গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

বিপদ! কিসের বিপদ! মবুর মত এমন যোয়ান বেটা থাকতে আম্মাজানের কি বিপদ। তা হলে রসীদ চাচা কি বলতে চায়, কি ভাবতে চায়।

আম্মাজান ঘরে ঢুকল। তক্তপোশ থেকে উঠে বসল মবু। বাঁ হাতটা ভর করল তক্তপোশের এক পাশে। পা দুটো নীচের মেঝেটা যেন স্পর্শ করতে পারছে না। আরো কাছে এলে মবু হঠাৎ প্রশ্ন করল, কিসের বিপদ আম্মা?

—আমার আবার বিপদ কিসের?

—এইমাত্র রসীদ চাচা যে বলে গেলেন।

আম্মাজান আবার হাসলেন। অত্যন্ত সরল সহজ হাসি। বললেন, এমনি কথার কথা। তোর চাচা বললে, ভাবি বিপদে আপদে ডাকিস। ভাইয়া থাকলেও আজ আর আমায় এ কথা বলতে হত না। আল্লার কাজ আল্লা করেছেন। কিন্তু আল্লার এ দুচোখ থাকতে তো তোদের দেখাশোনা না করে পারি না। দশজনে দশকথা বললেই কি আর শুনব।

—দশজনের দশকথা তিনি শুনবেন না কেন?

সেই কথায় আম্মাজানের মুখ থম থমে মেঘের মত ভারি হয়ে গেল। মবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি কি যেন অনুসন্ধান করলেন। কাঠের প্রজ্বলিত আগুনে যে মুখটা রক্তাভ হয়ে উঠত নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে শুনতে, এই মুখ সেই মুখ কিনা, আম্মাজানের পায়ে পায়ে যে আলি ঘুর ঘুর করত সেই মোবারক কিনা তিনি যেন

তাই হাতড়ে বেড়ালেন। তারপর যেমন সংলগ্ন হয়ে দুজন দুজনকে গল্প বলতেন তেমনি সংলগ্ন হয়ে বসলেন আম্মাজান মোবারকের পাশে। অত্যন্ত নরম কণ্ঠে শোনালেন তাকে, রসীদ তোর চাচা হয়।

আর কোন কথা হল না। মবুর মন এমন উৎক্ষিপ্ত কেন, ঝড়ো বাতাসের মত মাঝে মাঝে এমন চড়াস্বরে চীৎকার করছে কেন, অন্যমনস্ক হয়ে কি আকাশ পাতাল ভাবে—আম্মাজান সব কিছুরই ঢেঁড়া টানতে গিয়ে তিনি নিজেই যেন তার তলায় পড়ে পিষে যাচ্ছেন।

'রসীদ তোর চাচা হয়', এ কথার ভিতর কতটা দৃঢ়তা আছে মবু অনুভব করতে পেরে তখুনি ছুটল শামীনগড়ের পথ ধরে। আম্মাজান পাঁজদোয়ার দিয়ে ভিতর বাড়ীর উঠোনে নামার সময় দরজায় ঠেস দিয়ে ডাকলেন, ভর দুপুরে মবু যাস না, যাস না, আমার মাথা খাস! মবু ওরে তুই খাবি-দাবি না!

মবু তখন সকল শোনার বাইরে। সে শামীনগড়ের পথ ধরে-ধরে ছুটল। কোন প্রশ্ন কিংবা কোন জবাব দিল না—সে শুধু ছুটছে। চোখ দুটো কেবল কি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে নয়, মাঠের এক প্রান্তে একটি মেঠো পথ ধরে রসীদ তখন হন হন করে ছুটছে। মাথায় পানসুপুরীর ঝুড়িটা কাঁপছে যেন। রোদের তীব্র আঁচের ভিতর একটি সরু রেখা টেনে টেনে মবু কোন রকমে রসীদ মিঞার ঝাঁকাটা ধরে ফেলল। বলল, চাচা কোন দিন যদি শামীনগড়ের পথে দেখি তবে তোমার খুনে গোসল করব বলছি।

—মবু!

—রসীদ!

—ভাইয়া না থাকায় তুই এত বড় কথা বললি। আমি গরীব বলে তুই আমায় খুন করবি।

—গরীবের জন্য নয়, ইজ্জতের জন্য। বাপজীর বেটা যে এখনও বেঁচে আছে রসীদ।

তারপর দুজন নীরবে দুদিকে চলে গেল। যেন কিছুই হয় নি। সংসারের অনেকগুলি আবর্তনের ভিতর যেন আর একটি ঘূর্ণাবর্ত। উঠেই থেমে গেছে। যদি ওঠে আবার সেটা অন্য। সেটা নূতন করে উঠবে।

মবু মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। পাহাড়ের পীঠস্থানের পাশে সে কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসেছিল। তারপর সূর্যাস্তে সে যেন কোথায় কোন গ্রামে শুনতে পেল মসজিদে আজান। ডাহুকের ডাক, ঘুঘু পাখীর আর্তনাদে সে চমক খেল। এই

পাহাড়ের নীচেই কখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। ঘরে ফিরতে আজ অনেক দেরী। অনেক রাত হবে যখন সে শামীনগড়ে পৌঁছবে।

শামীনগড়ে পৌঁছে দেখল ঘরের দরজা খোলা। সন্তর্পণে আতাবেড়া অতিক্রম করে ভিতরের উঠোনে ঢুকল। মিটি মিটি করে প্রদীপ জ্বলছে রান্নাঘরে। দরজার একটা পাট ভেজানো। রান্নাঘরে আম্মাজান জেগে রয়েছেন।

এক পাট দরজার উপর ভর করে উঁকি দিল মবু। ঘুম ঘুম চোখে আম্মাজান ,লছেন। সামনে একটা টিনের থালায় খাবার ঢাকা। হাতে লাঠি। ঘুম ঘুম .চাখেও তিনি বেড়াল তাড়াচ্ছেন।

দরজা নড়ে উঠতেই আম্মাজান চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, কে? মবু, এসছিস মবু?

মবু অন্ধকারে চোরের মত দাঁড়িয়ে উত্তর করল, জি আম্মা!

—সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে মাঠে-মাঠে ঘুরলি, এত রাত করে ঘরে ফিরলি? আমায় কষ্ট দিয়ে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে।

মোবারক কোন উত্তর না করে খেতে বসল। থালাটা কাছে টেনে মুখ তুলে একবার আম্মার প্রতি তাকাল। তারপর খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, কত পান সুপুরী লাগে আম্মা?

—কত আর লাগবে। তোর রসীদ চাচাকে এক কাঠা ধান দেই—রোজকার পান তিনি সেই থেকেই দিয়ে যান।

—কাল আমি হাটে যাব ভাবছি। পান সুপুরী হাট থেকেই আনব ভাবছি। চাচা তোকে সরল মানুষ পেয়ে খুব ঠকাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে তো জানে না আম্মা, আমার মত বেটা তোর ঘরে আছে। জানলে নিশ্চয়ই এতটা ঠকাবার সাহস করত না।

—কিন্তু ভোরে তোর রসীদ চাচা এলে কি বলব?

—বলবি অনেকদিন সে ঠকিয়েছে, এখন থেকে তুই আর ঠকতে নারাজ।

—এমন কথা মানুষ মানুষকে বলতে পারে? তুই বলতে পারতিস? আম্মাজান এই প্রথম মবুর কাছে অসহায় বোধ করতে থাকলেন। মবু বড় হয়ে গেছে। বাপজীর মত মোটা গলায় আজ সেও শাসন করতে শিখেছে।

মোবারকের কথাগুলোর ভিতর কোথায় যেন এক বেসুরো আওয়াজ পেলেন আম্মাজান। ভেবে ভেবে অনেকক্ষণ নীরব থাকলেন তিনি। চোখ দুটো ভারি হয়ে এল না—এমন কি বুকে কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। তবু কেন জানি এক

অসহ্য যন্ত্রণা। এবং জীবনের হাজারো ব্যর্থতার গ্লানিগুলো অপমান হয়ে আজ হৃদয়ে বাজল। তিনি আর একবারের জন্য মুখ তুলে বলতে পারলেন না, মোবারক তোর গলার এই বেসুরা আওয়াজটা আতাবেড়ার এ পাশটায় একেবারে মিথ্যে। তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালাটায়। যেখানটায় দুপাহাড় চিরে একটি ঝড়ের সংকেত শুনেছিলেন তিনি।

এক এক করে দুদিন গেল। রসীদ চাচা আর এলেন না। আম্মাজান সে সম্বন্ধে মোবারককে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার শিথিল হয়ে উঠেছে। বন্ধনের দৃঢ় গিঁটগুলো ফসকা গেরোর মত মনে হচ্ছে। এক্ষুনি খুলে পড়বে! যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে।

মোবারকও কেমন আড়ালে আবডালে দিনগুলো কাটাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে বসে গল্প আর জমাতে পারছে না। কোথায় যেন তার কুণ্ঠা। দিন-দিন কি করে যেন আম্মাজানের প্রতি এক ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হয়ে উঠছে।

আম্মাজান তাই একদিন স্পষ্টই অনুভব করতে পারলেন শামীনগড়ে তিনি উচ্ছিষ্ট। শামীনগড়ের সমাজ তাঁর প্রতি আরো বিরূপ হয়ে উঠেছে আর মোবারকও দিন দিন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। অন্যমনস্ক ভাব ওর এখনও কাটল না। সে আম্মাজানের কাছে আর মুখ তুলে, কিংবা হেসে গল্প করছে না। কাজের কথা, জোত-জমির কথা বলছে না। চুপচাপ থাকে! অসময়ে খায়। কোনরকমে দিন গুজরান করছে। সে রাতে তিনি আবার জানালার ধারে দাঁড়ালেন। দুপাহাড়ের ফাঁকটাকে দেখলেন। আসমানে এক টুকরো কাস্তের মত চাঁদ। চাঁদে কালো কালো কলঙ্ক রেখা। জানালার দুগরাদে মুখ রেখে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন—আমি তবে খারাপ মেয়েমানুষ!

রাত গেল। ভোর হল। শামীনগড়ের জীবনে কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। মাঠে যারা যাবে তারা সার বেঁধে চলে গেছে। গৃহাগত নাবিকেরা হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে গড়ের পথ ধরে হাঁটল। বিবি বধূরা ঘাট থেকে জল এনে ঘরে ফিরছে। বাসন ধুয়ে যারা ঘাট থেকে ঘরে গেল তারা শুধু বললে, মবুর মা-টা কি! লজ্জা-সরমের বালাই নেই। রসীদটা আসে আর ওর সঙ্গে যত বেঢঙে আলাপ।

মবু ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াল। প্রতিদিনের মত আজও ঝুলানো বাঁশ থেকে লুঙি টানল। পরণের পোশাকটা বদলাল। উঠোনে নেমে নিমের ডালে দাঁতন করল। দেখল কামরাঙা গাছটা। গাছে ফুল এসেছে প্রচুর। তারপর কামরাঙা গাছের ফাঁক দিয়ে জাফরীকাটা আসমানের দিকে নজর দিয়ে ডাকলে, আম্মা।

কোন শব্দ নেই, জবাব নেই, আতাবেড়ার পাশ দিয়ে একটি নেড়ী কুকুর কি চাটচ্‌-চাটতে বের হয়ে গেল। উঠোন অতিক্রম করে কুকুরটা গেল পুকুরের দিকে।

মবু আবার ডাকল, আম্মা!

দুটো হুলো বেড়াল আতাবেড়ার উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ম্যাও ম্যাও শব্দ তুলে ডাকল কিছুক্ষণ। তারপর ওরা গেল জৈনবদের বাড়ীর দিকে।

মোবারক অন্যমনস্ক ভাবেই এল পাঁজদোয়ারে। দাঁতন ফেলে মুখ ধোয়ার সময় ডাকল, আম্মা, আম্মা!

কোন উত্তর নেই, নেই, ঘাটে গেল বুঝি! কাঞ্চনের ডালটা ধরে আম্মা উন্মুখ হয়ে নেই তো! আতাবেড়াটা পর্যন্ত হেঁটে এসে দেখল সেখানেও তিনি নেই।

এবারে মবু ছুটে-ছুটে এল ঘাটে। চীৎকার করে ডাকল, আম্মা! আম্মা!! আম্মা!!

ঘাটের জল পরিষ্কার। দুটো পুঁঠি মাছ জলের নীচে চিত হয়ে ডন খাচ্ছে; নাচছে। গত রাতের মবু আর আম্মার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সে ছুটে ছুটে গেল আবার। আম্মা কোথায় যান না। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত তিনি শামীনগড়ের কোন গড়ে একা পা বাড়ান না। জৈনবদের বাড়ীতে যাওয়ার সময় ডাকতেন মবুকে —চল মবু।—তিনি কোথায়, তিনি কোথায়!

ছুটে ছুটে মবু জৈনবদের বাড়ীতেও একবার গেল। খুব নিচু গলায় বললে, তোদের বাড়ী আম্মা, আম্মা এসেছেন?

বিস্ময়ে জৈনব বললে, কবে আসেন একা!

মোবারক হঠাৎ এবং এই প্রথম কেঁদে দিল নেঙটো ছেলের মত। বললে, আম্মা বাড়ীতে নেই, ঘাটে নেই, কোথাও নেই। জৈনব আমি কি করব, কাকে বলব, কোথায় খুঁজব।

জৈনবের চোখ দুটো বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল, মবু কি বলছিস তুই! আম্মা নেই!

—না নেই। আম্মা আমার এক ডাকে সাড়া দেন। আজ কত ডাকলাম, কতবার কতভাবে—কিন্তু আম্মা তো সাড়া দিলেন না।

মবু এবার গাছে-গাছে দেখল। মাঠে-মাঠে খুঁজে বেড়াল। শামীনগড়ের প্রতি ঘাটের পাড়ে-পাড়ে আম্মাজানের পায়ের ছাপ দেখার চেষ্টা করল। ফিস ফিস করে প্রতি ঘাটকে বলল, বল তুই বেইমানী করিস নি! আম্মাকে বুকে টেনে নিস নি।

ঘাটের জলে মাছের আওয়াজ হল। আর কোন জবাব নেই।

হু হু করে উঠল মবুর মন—তিনি বুঝি কোথাও নেই, কোথাও নেই।

ঘরে ফিরে এল মবু। উঠোনের উপর একান্ত ছেলেমানুষের মত গড়িয়ে পড়ল। কাঁদল গড়াগড়ি দিয়ে। কেঁদে এক কথা প্রকাশ করল শুধু, আম্মা—আম্মা—আম্মা। শামীনগড়ের মানুষেরা সেই দেখে ফিস ফিস করতে করতে পথে নেমে গেল।

কামরাঙা গাছটায় যে সবুজ টিয়ার দল কামরাঙা খেতে এসেছিল তারা বিকেলের পড়ন্ত রোদে উড়ে-উড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ধূপছায়া অন্ধকার পার হয়ে গুটি-গুটি যখন এল রাত্রি, তখন মবু নিজেকে আরো একা-একা অনুভব করল—তখনই সে দাঁড়াল গিয়ে হরিতকী গাছটার ছায়ায়। জৈনবকে ডেকে বললে, আম্মাকে খুঁজতে বের হলাম।

—কোথায় খুঁজবে?

—সম মেমানদের বাড়ী। রসীদ চাচার কাছে।

—আমি খবর পাব কি করে?

—পাবি। খবর তোকে দেব।

মবু ছুটল গড় থেকে গড়ে। মাঠ থেকে মাঠে। পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের ছায়ায়। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে সে এল প্রথম রসীদ চাচার বাড়ী। চাচার ভাঙা কুড়েতে ঢুকে গিয়ে ডাকল, আম্মা এখানটায় এসেছিস? আম্মা! রসীদ চাচার ছোট ছোট ছেলেগুলো ডাক শুনে বের হয়ে এল। বললে, ভাইয়া তুই!

কেমন পাগলের মত শুধাল, তোর বাপজী কোথায় রে?

—বাপজী ঘরে নেই। মাঠে গেছেন।

মাঠে গিয়ে মবু নাগাল পেল রসীদের। চীৎকার করে বলল, অ রসীদ মিঞা তোমার ঘরে আম্মা আছেন? বলো, ঠিক কথা বলো, নয়ত তোমার একদিন কি আমার একদিন।

রসীদ কাছাকাছি এসে বলল, কি বলছিস মবু! খবর কি তবে সত্যি—তোর আম্মা নিখোঁজ!

রসীদের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ মবুর চোখ দুটো মাটিতে নেমে এল। মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ধীরে ধীরে বললে, এ কি সর্বনাশ করলাম আমি আমার!

—মবু আমি তো আর শামীনগড়ে যাই নি।

—না না চাচা—সব ভুল সব ভুল। কিন্তু তাই বলে আমার এমন সাজা! চাচা আমি কোথায় যাব? আর কোথায় খুঁজব?

—চল দেখা যাক বলে রসীদও ওর সঙ্গ নিল, তারপর অনেক দূর—অনেক দূরত্বে। অনেক খোঁজ। অনেক অনুসন্ধান।

মবুর মামার ঘর বটের-কান্দি। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে মবু গেল। সব খুলে বলল। খবর দিল। মামা আর নানা বললেন, তোর সঙ্গে তোর আম্মা বেইমানী করেছে। মায় ঝিয়ে ঝগড়া হয়। বাপ বেটায় লাঠালাঠি হয়। তাই বলে রাতের অন্ধকারে ভেগে পড়া বেইমানী ছাড়া আর কি!

মামা বললেন, তোর ঐখানটায় কেউ নেই। কে তোকে দেখবে। এখন থেকে এখানটায় থাকবি।

মবু চুপ। কিছু বলল না। তবু কি দেখি-দেখি করে কতদিন এ দেশটায় কেটে গেল। বাড়ী তার আগলাচ্ছে জৈনব। জৈনব খাতুন।

কত আর আগলাবে। কতদিন আগলাবে। জৈনব তো উন্মুখ। কত প্রতীক্ষার রাত হয়ত ওর হরিতকী গাছটার নীচে কাটছে। এবার তাই যেতে হয়। এবার শেষ ফয়সালা করতে হয়। শামীনগড় আজ আবার তাকে ডাকছে। জৈনব তার আকর্ষণ। শামীনগড়ে বেচে থাকার একমাত্র উপকরণ। আম্মাজানের কাছে মোবারকের কসম—আজ সবটাই নির্ভর করছে জৈনবের উপর।

শামীনগড়ে যখন ফিরে এল মবু তখন আর এক অন্ধকার নেমেছে মসজিদের উপর। একটা কাক সে রাতের অন্ধকারে মসজিদের উপর পড়ে চীৎকার করছে। অন্ধকারে মবুর শরীরটা কণ্টকিত হয়ে উঠল। অনেক দূর থেকে সে হেঁটে এসেছে, শরীর ক্লান্ত। সমস্ত দিনের উপবাসে সে আর ভালভাবে পা ফেলতে পারছে না। শামীনগড়ের কোন মানুষের সঙ্গে পথে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। একবার তাই সে জানতে পারল না দেশের খবর, ঘাটের খবর, গড়ের খবর।

কিন্তু উঠোনের উপর দিয়ে পা টিপে টিপে যখন বারান্দায় গিয়ে উঠল, দেখল ঘরের দরজা খোলা, একদিকের পাল্লাটা খসে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে ঘরের অনেকগুলো আশ্চর্য রাত একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। হাতড়ে হাতড়ে বেড়াল মবু। কোথাও কিছু আছে কিনা দেখল। আম্মাজানের তক্তপোশটার উপর অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকল। অনুভব করল ঘরদোরগুলি বড্ড ফাঁকা। পাশের তক্তপোশটা নেই। অনেক কিছু নেই। যে যার মত নিজের নিজের ভেবে রাতের বেলায় সব তুলে নিয়ে গেছে। জৈনব নেমকহারাম। এত কাছাকাছি থেকেও ঘরদোরগুলি দেখে নি।

তারপর সে গেল হরিতকী গাছটার নীচে। আজকের মত এক মুঠো আহারের বন্দোবস্ত হয় কিনা সেই ভেবে ডাকল, জৈনব, ও জৈনব। একবার এসে দেখ আমি না এসেছি।

প্রথম কোন আওয়াজ এল না। পরে খুট করে একটি শব্দ হল। দরজা খোলার শব্দ। একটি ছায়া অন্ধকারকে আরো গভীর করে হরিতকী গাছটার নীচে নেমে আসছে।

খুব কাছাকাছি এল ছায়াটা। বলল, আমি জানি মবু তুই একদিন ফিরবি। তাই এতদিন ঘরে কান পেতে রেখেছি, কবে এসে তুই ডাকবি।

সহজ ভাবে জৈনব বলল, মামুর বাড়ী আম্মাকে পেলি ?

মবু যেমন কিছুই হয় নি এমনতর করে বলল, না কোথায় আর পেলাম। কোথায় যে আম্মা হারিয়ে গেল আজও বুঝতে পারছি না। আমি চলে যাওয়ার পর থানা পুলিশ হয়েছিল রে ?

—কে কার থানা পুলিশ করে—তুমিও যেমন !

—বড় খিদে পেয়েছে, একমুঠো খাবার দিবি ? যা হয় কিছু।

- দিচ্ছ—একটু দাঁড়া। বলে ঘরের দিকে ফিরতেই মবু ওর হাত ধরে ফেলল। এবং কতদিন আগে যেমন করে বুকে টানত তেমনি বুকে টেনে নিতে চাইল।

জৈনব দূরে সরে দাঁড়াল। হাত তুলে নিল। বললে, বুকে আর টানিস না। এখন আমি অন্যের বিবি। কুদরত মিঞার সঙ্গে সাদী হয়ে গেছে।

সামনের অন্ধকারটাকে কে যেন চিরে দিল, কি সংলগ্ন করে দিল ঠিক ঠাওর করা গেল না। কিন্তু মবু তখনও ঝিম মেরে আছে। ভয়ে চোখ বুজে গেছে। দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছে। তবু বলেছে, চীৎকার করে, কি বললি ! কি বললি জৈনব ?

পথটার উপর মবুর মাথাটা ঘুরতে থাকল। সমস্ত শামীনগড় যেন দুলছে। কাঁপছে। আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জৈনবের দেহটা খাতে পড়া ঘূর্ণাবর্তের মত চোখের উপর পাক খেতে থাকল !- এরা কে ? এরা কোন্ ইতিহাস ? এরা কোন ইতিহাসের বিবর্তনের কথা বলছে।

মবু শুধু বললে, একটা আলো দিবি ? .

—খাবি না ?

—না। একটা আলো দে।

জৈনব কুপি জ্বালিয়ে ফিরে এল আবার। নীরবে কাঁঠালী চাঁপার অন্ধকারটা পার হয়ে এল উঠোনে। ঘরে ঢুকল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোণায় পেল কাঠের বাক্স। খুঁজে খুঁজে দেখল কি আছে কি নেই। পেল শুধু নীচে সেই পুরানো আমলের ঘড়িটা আর কিছু নেই। ঘরটা ফাঁকা। শঙ্খচূড়ের ঝাঁপিটা ফাঁকা।

জৈনবের প্রতি এবার রাগ-রাগ হয়ে বলল, শঙ্খচূড়টাকেও বিদায় করেছিস ?

—বিদায় করি নি। আছে। আমার কাছেই রয়েছে। ঝাঁপিতে থাকলে ওটা মরে ভূত হয়ে থাকত।

তারপর আর কোন কথা নেই। ওরা আবার গেছে হরিতকীর গাছটার নীচে। কুপির আলোয় জৈনব গেছে শঙ্খচূড়টা আনতে।

সেদিন ওরা ছিল নিঃশব্দ। কাঞ্চন, কাঁঠালী চাঁপার গাছগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নীচে মবু চোরের মত প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আর ভাবতে পারছে না আম্মাজান আর জৈনব সম্বন্ধে। মনের ভিতর এক তুরন্ত ঝড়। শামীনগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঁচবে কি করে! ভোর হলে এ মুখ শামীনগড়ের সমাজকে আর দেখাবে কি ভাবে।

জৈনব শঙ্খচূড়ের ঝাঁপিটা নিয়ে এলে চোরের মতই ফিস ফিস করে বললে, আমার বাড়ীতে যাবি একবার? বাপজীর পেটিটা মাথায় তুলে দিবি।

জৈনব মবুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে থাকল। —তুই যত পারিস আমায় শাস্তি দে। ঘর ছেড়ে তবু তুই যাস না। আর কিছু বলতে পারল না—মাথা নীচু করে শুধু কাঁদল জৈনব।

—শামীনগড়ের মাটির সঙ্গে কি আর সম্পর্ক। তুই হাসতে হাসতে কুদরত মিঞার সঙ্গে ঘর করলি, আম্মাজান হাসতে হাসতে নিখোঁজ হলেন, আমি আজ কাঁদতে কাঁদতেই না হয় নাবিক হলাম। কি বলিস, কি বলিস জৈনব! বলে জৈনবের তুহাত ধরে মবু এমন পাগলের মত ঝাঁকি দিতে থাকল—মনে হল শুধু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেয়েটাকে খুন করবে। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটাকে বুকে চেপে মাথায় মুখ রেখে সে বললে, বাড়ীঘরটা আমার দেখিস। কুদরতকে বলিস, তোর বাপজীকে বলিস অন্ততঃ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে মসজিদে তিনি যেন একবার আজান দেন।

জৈনব মুখ তুলল না।

মবু আবার বললে, আজ আর বাধা দিস না। আমায় যেতেই হবে। সাত পুরুষের ধারাটা আমায় পাগল করে দিয়েছে।

জৈনব মুখ তুলে চাইলে মোবারকের দিকে। বললে, নাবিক হলে চরিত্র মন্দ হয়।

—মন্দ হবে না।

জৈনব সে তার বুকের উষ্ণ উত্তাপগুলো জড় করে প্রকাশ করল এবার, মাতব্বর

[illegible]ও কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না কসম থাকল।

[illegible]গড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক কসম ভেঙে আর এক কসম খেল,

[illegible] না করে বাঁচব কসম খেলাম।

আর সানডায়েল ক্লকে পুরানো কসম ভেঙ্গে নূতন কসম খেতে গিয়ে দেখল মোবারকের গুণাহ্। হাজার গুণাহ্। দেহটা না-পাক। নাবিক হব, চরিত্র মন্দ ন' করে বাঁচব—সে কসম আর থাকল না। বিশেষ করে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর সে বুঝে আসছে, জৈনব যত স্বার্থপর, বাপজী তার দ্বিগুণ। শেখর—বেজাত, অজাত, বে-শরীফের লোক। মোবারকের কথায় সে বিদ্রোহ করে। ওর ঘুম আসে না। আবার সেই বলে কিনা মবু ঘুমোলে তার ভাল লাগবে। ওসব কটাক্ষ। ওসব কটাক্ষ। ওসব বিদ্রূপ, চাচা আপন জান বাঁচা। আম্মাজান তাই নিখোঁজ হয়ে বাঁচলেন, বাপাজী বাঁচলেন জাহাজ ডুবি থেকে…আর শেখর! সে বাচল…। সে বেইমান। সে অজাত, বেজাত, কাফের।·· তোবা তোবা কি বকছি সব।…খোদ হাফেজ।

মোবারক আজকাল দেখে লিলি ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছায়ার মত ছবির মত বোট ডেকে, ফোকসালে, স্টোকোলে—সর্বত্র যেন লিলি তার সঙ্গ নেয়।

ফোকসালে আর ফল্কায় কতবার মোবারক অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চুপি চুপি বলেছে —এ ত কৌরী পাইনের গুঁড়ি নয়, পিকাকোরা পার্কও নয়, পাহাড়ের সান ডায়েল ক্লকটা এখানে নেই। এ সমুদ্র, এখানে এলে ডুবতে হবে। মরতে হবে…এমন করে এসে সব সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি বলছি ডুবে মরব।

হাত ঘড়িটার উপর একবার নজর দিল। কানের উপর রেখে দেখল। পরখ করল। আওয়াজ ঠিক উঠছে। আগের মত, ওয়াচেব সঙ্গে সময় মিলিয়ে উঠছে। লিলির ছায়াটা মন থেকে কিছুতেই সরছে না। মরছে না। বিবির মত, জৈনবের মত ঠোঁট টিপে হাসছে। বে-ইক্তারী রং তামাসা করছে। ভুলের মাশুল তুলছে। মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল মোবারক, শেখর ক্রু-গ্যালী পার হয়ে ডেক-পথে নেমে আসছে। সমস্ত শরীর কম্বলে জড়ানো। পাজামার নীচে পা দুটো খালি সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অবিন্যস্ত চুল কম্বল সব উড়ছে।

মোবারক তিন নম্বর বোটের আড়ালে আড়াল করল নিজেকে। আর কেন! আবার কেন!

সামনের ডেকে ডেক-জাহাজী ইয়াকুব রং করছে। রঙের টবটা কোমরে ঝুলছে ইয়াকুবের। মাস্টের উপর ঝুলে-ঝুলে রং করতে গিয়ে কিছু রং গড়িয়ে পড়েছে নীচে। আমলদার ধমকে উঠল মাস্টের গুঁড়ি থেকে, অঃ মিঞা রং পড়ছে—সাবধানে কাম কর। সেই সময় শেখর পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, নীচে চল মোবারক।

সে মুখ তুলল না। চোখ খুলে তাকাল না। মুখের উপর

শুধু বুকিয়ে আছে। যেন বলতে চায়, আর কেন, আবার কেন। দোহাই তোদের, একা একটু থাকতে দে।

শেখর আবার বলল, নীচে চল মোবারক।

এবার সে মুখ তুলে উত্তর করল, মেহেরবাণী করে এ হারামের জন্ত আর তকলিফ না করলেও চলবে। মাথা গরম হয়েছে আমার, বেশ হয়েছে ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ জানা। ওর কাছে ধরে নিয়ে চল। যা ইচ্ছে তাই কর। কিচ্ছু বলব না। বলে, নিজের হাত দুটো শেখরের প্রতি বাড়িয়ে ধরল।

শেখর ওর হাত ধরে বলল, নীচে চল। সেখানে তোর ভালর জন্য যা করতে হয় সব করব। চল। ও—ঠ।

মোবারক কিছুতেই উঠল না।

শেখর বাধ্য হয়ে মোবারকের পাশে বসল। স্কাইলাইটের কাচ দুটো খোলা। ফাঁক দিয়ে শব্দ আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ। ওদের ছোট ছোট কথার আওয়াজগুলো সে শব্দের ভিতর ডুবে যাচ্ছে।

—শেষ পর্যন্ত বাকী সফরটা না ঘুমিয়ে কাটাবি ঠিক করলি!

—না ঘুমিয়ে থাকতে পারলে মন্দ কি।...কথাগুলো আবার মাথা গরমের মত শোনাল না তো! পাশের জীবন্ত বিদ্রূপটার প্রতি চাইল আড় চোখে।

শেখর বললো, মরে যাবি যে।

যাক মাথা গরমের কথা বলে নি! তুই কি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাস! শেখরের শরীরটা উত্তপ্ত ঠেকল। কপালে, বুকে হাত দিয়ে বললে মোবারক, তোর শরীরটা গরম ঠেকছে। ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার আমাকে ভোগাবি ভাবছিস! নীচে যা। নয়ত আবার জ্বর আসবে।

—যাব। তুই যদি নীচে যাস তবে।

—নীচে যেয়ে কি হবে। ঘুম আমার আসবে না। জানিস নালিশ আমার পর্বত প্রমাণ। গুণাহ আমার হাজার গুণাহ।

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় গায়ের কম্বলটা নীচে পড়ে গেল। মোবারক কম্বলটা শেখরের শরীরে জড়িয়ে দিল। তারপর দুজনই চুপ। দুজনই নির্বাক হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু মোবারক কিছু যেন বলতে চায়। তীব্র দুঃসহ অস্বস্তিতে সে ছটফট করছে। কিছু বলার কিছু প্রকাশের প্রচণ্ড আগ্রহ। হলুদ রাঙা সবুজ মুখ ওর নীল নীল হয়ে উঠছে। শেখরের কাছে ঝুঁকে চেয়েছে কিছু প্রকাশ করতে। কিন্তু পারে নি। ভাটা ভাটা দুটো চোখ নিয়ে এগিয়ে এসে আবার সরে গেছে।

শেষে একবার শেখরের প্রতি অত্যন্ত বেশী ঝুকতেই সে একান্ত [illegible]
এমন করছিস কেন! কি হয়েছে তোর!

মোবারক এবার বিবর্ণ চীৎকারে ফেটে পড়ল, গেজগ্লাস ফাটার তীব্র আওয়াজের মত সে আওয়াজ ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য। রূপকথার মত শোনাল—মোবারক তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে, শেখর, লিলি আমার বোন।

তুটো সমুদ্রমানুষকে কেন্দ্র করে একটি অবিশ্বাস্য এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। শেখর ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মত, হা-ঘরের মানুষের মত চেয়ে আছে। কোন প্রশ্ন, কোন কথা, কোন জবাব উঠল না ওর মুখ থেকে। কেবল কেমন এক রহস্যময় জীবনের গন্ধ পেল মোবারকের তুটো চোখে! চোখ তুটোর ভিতর হাজারো গুণাহের আফশোস নোনা জলের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে।

এমন করে চুপচাপ বসে থাকা কেমন ঠেকছে। খালি পা তুটো কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাবল, কিছু বলতে হয়, কিছু করতে হয়। বলতে হয় লিলির সম্বন্ধে। মনের ভিতর যখন সেই ভাবনাগুলো পাক খাচ্ছে তখন দেখল মোবারক নিজেই প্রকাশ করছে আবার—লিলিকে ছেড়ে আসতে হল সে জন্য। কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। জৈনবের মত, বিবির মত ভালবাসি। সে আমার অপরাধ, আমার গোস্তাগী। আমার মনের হারেমে হারাম খাচ্ছি। বোনের মত, রক্তের সম্পর্ক আছে বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। বিবেক তাই জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে। বাপজী বেইমান—বাপজী হারাম, শেখর—বাপজী কাফের।

সেই অপরিচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট প্রকাশের ভিতর মোবারক কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। ওর নরম উজ্জ্বল চোখ তুটোতে ঘন কুয়াশার অন্ধকার। ওর বলিষ্ঠ উজ্জ্বল মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ওর ঠোঁট তুটো। ও যেন ওরই ভিতর মরে আছে। শুধু তার শিটানো সাদা ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে কতকগুলি স্তিমিত এবং বিনীত শব্দ। মোবারক বলছে, আমার বাঁচা মরা তুইই সমান। সবাই—সব, সব আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করল। ঘড়ি, বাপজী, আম্মা, লিলি, জৈনব সবাই আমায় ঠকাল, কি নিয়ে বাঁচব শেখর? কাকে নিয়ে বাঁচব? কি নিয়ে মরব, কাকে নিয়ে বাঁচব? বাঁচা মরা তুইই সমান, বেঁচে থাকতে বিবেক শুধু বলবে, তুমি হারাম, গুণাহগার না-পাক। মরলে খোদা আমায় ক্ষমা করবেন না। ইন্তেকালের সময় সয়তানের পাল্লায় পড়ব। একটু থেমে মোবারক আবার বললে, জৈনবের কসম, আম্মার কসম ভেঙ্গে যে কসম নূতন করে গড়তে গেলাম সে কসম যে হাজার গুণাহে ভরা শেখর।

সে সমুদ্র-জীবনের শেষ কটা পাতা উল্টাচ্ছে।

শেখর বুড়ো য়্যালবাট্রস পাখীর মৃত্যুর সময় গোণার মত জবু-থুবু হয়ে বসে আছে। নক্ষত্র গুণছে আকাশের। নক্ষত্রের রাত দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু নক্ষত্র বিহীন আসমান। নীল আকাশ। এখনও দিন। সূর্য এখনও পাটে বসে নি। বড্ড নরম আলো আকাশে। দিনেরা এখানে এখন সকাল সকাল বিদায় নেয়। সাগর পাখীরা সন্ধ্যার অন্ধকার ডানায় বয়ে নেমে আসে। তবু দিন। তবু সূর্য নক্ষত্রের রাতকে জানালার পর্দা সরাতে দেয় নি। বলে নি, এবার তুমি এস, আমি যাই।

তবে শেখর আকাশের দিকে চেয়ে এত কি দেখছে!

সাগর পাখীরা জাহাজ ডেকে সন্ধ্যা নামানোব আগে বরফের দেশে উড়ে চলে গেল। আকাশের গায়ে কোন নাম, কোন নক্ষত্রের কথা বলে গেল না। কোন্ নক্ষত্র কোন্ সন্ধ্যায় সান-ডায়েল ক্লকে কোন্ জন্মের ইশারা দিয়েছিল তার রেখা চিহ্ন এঁকে গেল না পর্যন্ত।

আকাশের গায়ে তবু কিছু ঘটছে। সেই পালতোলা নৌকোর জাহাজ থেকে সপ্তডিঙা ময়ূরপঙ্খী! বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়। সঙ্গে চলেছে মাঝিমাল্লা। দাঁড় পড়ছে ছপ ছপ। আওয়াজ উঠছে পালে বৈঠার। পাঁচশ যোয়ানের ক্লান্ত যোয়ানকী। বাঙালী তারা, নাবিক তারা। চাটগাই সিলেটি সমুদ্রমানুষ তারা।

দুটো মানুষ। দুটো জাহাজী। দুই দরিয়ার নীরব বন্ধু। একজনের আকাশে আগামী দিনের অনেক সুখ স্বপ্নের রেখাচিহ্ন। একজনের আস্‌মানে কোন চিহ্ন নেই। শুধু আফশোস আর আফশোস।

আসমান আর আকাশ—পানি আর জল—সাগর আর দরিয়া—বেদনার চিহ্ন আর সুখের রেখা মিলিয়ে তবু দুই বন্ধু। এক ফোকসালের দুই জাহাজী।

ওদের মুখ আকাশ মুখো। আসমান মুখো ওদের চিন্তা।

জাহাজ তাদের দেশে ফিরছে। সিডনীতে দুদিনের হল্ট। গম বোঝাই হবে তারপর আর এক দরিয়া, আর এক উপসাগর, আর এক নদীর মোহনা। নাম তার গঙ্গা। গঙ্গার উপকূলে জাহাজ বাঁধা হবে।

সে কোন্‌দিন! কবে? এমন অনেক জিজ্ঞাসা এখনও অনেক জাহাজীদের মনে।

আকাশের রং তখনও বদলাচ্ছে। কত মেঘ সে তার বেদনার কথা বলে গেল। মোবারক আর শেখর দুই সমুদ্রমানুষ মেঘের রং বদলানো দেখতে দেখতে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনে নিল।

মোবারক হঠাৎ ইতিহাসের পাতা উল্টানো থামিয়ে দিল। খরগোশের মত চো
তুলে সে কেবল পথ খুঁজছে। বললে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে—

নক্ষত্রেরা এবার আকাশে উঠতে সুরু করেছে। এক, দুই, তিন—অনেক। শেখ
আর গুণতে পারছে না।

ফসফেট টানতে পারছে না আর জাহাজীরা। নেরু আয়লেণ্ড, ওসেন আয়লেণ্ড
কাকাতিয়া আয়লেণ্ড—এক, দুই, তিন। অনেক অনেক। বাপজী আর তা
জাহাজের জাহাজীরাও সেদিন আসমানমুখো মুখ করে ডেকের উপর বসেছিল বো
হয়। দেশে ফেরার জন্য কোম্পানীর ঘরে হয়ত সেদিন নালিশ জানিয়েছিল।

অনেক কথা বললে মোবারক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা। শামীনগড়ে
কথা, বাপজী, ফ্লাওয়ার গার্ল, আম্মাজান, জৈনব,—অনেক অনেক কথা।

তবু কথা ফুরোয় না। শেষ হয় না আম্মাজানের জলছবি। আকাশ দরিয়
নক্ষত্র মিশে এখনও অনেক খবরের সামিয়ানা টানছে। সেই সামিয়ানার নীচে ব
দুই সমুদ্র মানুষ পরস্পরকে আরো গভীর ভাবে টেনে নিল।

কিছু বলে হাঁফ ছাড়ছে মোবারক। হাঁফ ছেড়ে ক্রমশ হাল্কা হচ্ছে।

ঘড়িটা তেমনি পড়ে আছে পেটিতে, মোবারক বললে। কিন্তু মেলবোর্নে জাহাজ
পৌঁছলে ওর সম্বন্ধে আমার কেন জানি অহেতুক কৌতূহল জন্মাল। সাউথ-ওয়াফে র
বস্তি অঞ্চল থেকে ফেরার পথে বুঝতে পারলাম কৌতূহল অহেতুক নয়। ঘড়ির সঙ্গে
বাপজীর জীবন জড়িয়ে আছে। আম্মাজানকে হারালাম। নাবিক হওয়ার জন্য এ
ইবলিশটাই বুঝি দায়ী। ভাবলাম পোর্ট-মেলবোর্নে দিই ওকে বেচে। এতকাল ধরে
যে পড়ে থাকল, তাকে কিনবেই বা কে। প্রথম সফরে চাবিটা ওর ঘুরিয়েছি। কিন্তু
একেবারে বেসামাল। তোয়াক্কা কিছুতেই কাউকে করল না। কাঁটা দুটো আর
ঘুরল না, পেটিতে ফেলে রাখা আর পানিতে ফেলে দেওয়া এক কথা। তবু ফেলে
দিতে মন চাইল না—বাপজীর হাতের চিহ্ন।

জাহাজে খবর এল, ফসফেট নিয়ে জাহাজ যাচ্ছে নিউপ্লাই-মাউথে। ভায়া সিডনী
জাহাজ যাবে। মনে হল, ঘড়িটা ঠিক করে নিলে হয়। ইবলিশটার সঙ্গে সময়
মিলিয়ে বাপজীর জাহাজ ডুবি সমুদ্র দেখলে হয়।

সেদিন সেজন্য ঘড়িটা নিয়ে [illegible] স্ট্রীটে [illegible] ইউনিভার্সিটির পাশের
রাস্তায় ঘড়ি মেরামতের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি [illegible] কোথাও কিছু হল
না। ঘড়িটা বহু পুরানো আর ভিন্ন [illegible] মেরামত বলে সবাই মেরামত করতে
অস্বীকার করল।

তবে শেষ পর্যন্ত হল। প্রিন্সেস স্ট্রীটের দোকানী বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। কোন ক্ষতি নেই বলে আমিও দিলাম। ঘড়িটা মেরামত হল। চার ঘণ্টা অন্তর দম দিতে হয় এই ফারাকটা থাকল শুধু।

বাপজীর চিহ্নটা হাতে বাঁধলাম। তুই চোখের উপর দেখলি সেই থেকে কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। তখন থেকে আম্মাজানকে খুব বেশী মনে পড়ল। বাপজীর অস্পষ্ট খোদা হাফেজ কানে ঠোক্কর খেতে থাকল বার বার। জাহাজটাকে মনে হল দোজখের মত। ওয়াচে ওয়াচে চাবি দেওয়া, কানের উপর রেখে শব্দ শোনা, সময় ঠিক রাখা অভ্যাসে দাঁড়াল। তাব উপর অন্যান্য জাহাজীদের বিদ্রূপ কটাক্ষে ভেঙ্গে পডলাম। তবু প্রতিজ্ঞা আমার—বাপজীর চিহ্নটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে জাহাজ-ডুবি দ'রিয়া দেখবই। দেওয়ানীর বাতে ঘডিব সঙ্গে সময় মিলিয়ে রাত বারোটার সময় ঝুঁকে থাকলাম তিন নম্বর জেটেব পাশে বেলিংয়ের উপর। ঝড়ের সমুদ্রকে দেখলাম—বে অফ্ বিস্কে, লিমন বে আর বে অফ বেঙ্গলের মত ঝড়ের সমুদ্র। তুই কিন্তু শেখর এক সময় উপবে এসে আমায় নীচে ফোকশালে নিয়ে গেলি।

কথা বলতে পারছে না মোবারক। গলাটা শুকিয়ে উঠছে। তবু কোনরকমে যতটুকু পারছে বলছে।

তুই শোন, তুই শোন শেখর। সব শুনে যদি মোবারকের উপর দয়া হয় তবে অন্তত শেখর, ভগবানের কাছে একবার এ হারামের জন্য প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা কর।

এ রক্তমাংসের দেহ, সান ডায়েল ক্লক আর লিলিকে ঘিরে ঘড়িটার বুকে চুপ করে পড়ে থাকা রহমৎ মিঞার কঙ্কালটা যেন টিক টিক শব্দ তুলে হাসল। লিলিকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের উপর মনটা বিকৃত হয়ে ওঠে। হাজার গুণাহগার হলাম। জৈনবের কসম খেলাপ হল। রহমৎ মিঞার কঙ্কালটা টেনে নিয়ে গেল বুঝি আমাদের বাপজীর কবরখানায়। বিশ বছর আগের প্রেতাত্মা চার্চের ঘড়িতে বারোটা বেজে আওয়াজ তুলল যেন—বারোটা বাজালাম। বাপজী গলা টিপেছে দোস্তের, তুমি গলা টিপেছ বোনের ইজ্জতের। তোমার নিজের। তাই সেই রাতে বাপজীর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম—খোদা হাফেজ। চোখ থেকে সে রাতেই ঘুম বিদায় নিল। আজ পর্যন্ত ঘুমোতে পারলাম না। দরিয়া কেবল ডাকছে।

কবরখানার 'খোদা হাফেজ' চীৎকার তোলার পর কি করে কেমন করে ফিজ-রয়ের এক গরম কাঠের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম সে খেয়াল নেই। কিন্তু চোখ খুলতে দেখি লিলিও ঝুঁকে আছে আমার মুখের ওপর। অবাক চোখে কিছু যেন বলছে।

ওর মা প্রতীক্ষা করছেন। কিছু যেন থেকে থেকে বলছেন। ক'জন লোক—ওরা ডাক্তার আবার প্রতিবেশীও হতে পারে—তাদের খুব ধীর এবং সংক্ষিপ্ত পায়চারী। কার্পেটের উপর তাঁরা ধীরে ধীরে হাঁটছেন। মনে হল সব ঘরটা জুড়ে উষ্ণ শ্রোত। লিলির চোখ দুটো ভার ভার। আমার দৃষ্টি তখন একটি ছবির প্রতি। নিথর, নিঃশব্দ দেহটা। লিলির মা হাতের স্পন্দন গুণছেন। হাতের স্পন্দন অনুভব করছেন।

চুপ হয়ে শুনছে শেখর। শুনে শুনে বিরক্ত বোধ করছে না। কিংবা বেইমানের মত বলছে না আজ, থাক থাক হয়েছে—এখবর অনেকবার আর অনেককাল থেকে শুনে আসছি।

সমুদ্রে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় কল কল মিঠে আওয়াজ। এই মিঠে সমুদ্রকে দেখে মনে হয় না সে কোনদিন জাহাজের সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারে, বেইমানী করতে পারে।

ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে পোর্টহোলে আলো। তিনি পায়চারী করছেন কেবিনে। পোর্টহোলের আলোটা সে জন্য মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ব্রিজের উইংসে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলো জ্বেলেছেন সুখানি সাহেব। ব্রিজ থেকে তিনি নীচে নামবার সময় বললেন, এইবার আনন্দ করেন—যত পারেন করেন। জাহাজ সিডনী হইয়া দেশে ফিরব। সিডনী যাইয়া গম আর রসদ নিব।

সব জাহাজীর চোখে মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ। দেশে ফেরার জন্য ওরা মনকে প্রস্তুত করছে। বাংকে বাংকে আবার গল্প-গুজব জমে উঠেছে—দেশের গল্প, ঘরের গল্প। কার বিবি, কার মেমান সফর ফেরৎ কি কি নিতে বলেছে—কলকাতা বন্দরে লাখিতে থাকার খরচ, কতদিন থাকতে হবে তারও হিসেব টানছে তারা।

মোবারকের কোন হিসেব নেই। শেখরও কোন হিসেব টানতে পারছে না। মোবারকের বে-হিসেবী জীবনের জন্য ওর জীবনের হিসেবেরও কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ভুল আছে। শেখর ভুলের সংশোধন চায় মোবারকের বে-হিসেবী জীবনের গল্প শোনে। মোবারককে স্বাভাবিক করে তোলার ভিতর সূক্ষ্ম ভুলের সংশোধনকে সে খুঁজে পেয়েছে।

মোবারক তখন বলছে, সে পরিবেশ, সে পরিচয়, সে কাহিনী অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই রাত আর দিনকে মনে হচ্ছে আমার আর এক দুঃস্বপ্ন। ফিজরয় যেন অন্য এক দুনিয়া। বাপজী অয়েল পেন্টিং-এর ভেতর। পাশে লিলি। ওর টানা টানা চোখ দুটোয় আম্মাজানের গভীরতা। বাপজী ঠিক আগের মত। এক গাল ছাঁটা ছাঁটা কুচকুচে দাড়ি। বলিষ্ঠ মুখে সুষ্ঠ গোঁফের রেখা।

চেয়ে আছি। চোখ আমার বাপজীর মুখ থেকে নামছে না। বাপজীকে নূতন করে যেন দেখছি।

লিলির মা আমার চেতনাকে প্রলুব্ধ করার জন্য বললেন, ফটোর মানুষটি মূক বধির।

কবোঞ্চ কাঠের ঘর। একটি মাত্র কথার প্রকাশ যেন।

সকলের চিন্তিত মন উন্মুখ হয়ে উঠল সেই কাঠের ঘরে। যাঁরা পায়চারী করছিলেন তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। চেতনা ফিরেছে ভেবে লিলির মা আশ্বস্ত হলেন। প্রকাশের রেখাটুকু টেনে তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন।--ফটোর মানুষটি মূক বধির। যতদিন ঘর করেছিলেন তিনি একজন মূক বধিরকে নিয়ে ঘর করেছিলেন।

বাপজীর বাঙ্গালী মুখের কমনীয় রূপ লিলির মাকে মুগ্ধ করেছিল। এক নূতন শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিয়েছিল। দুবার স্বামী পরিত্যক্তা মাউরী মেয়ে জানলেন না মানুষটি কোন্ দেশের, কোন্ জাতের। তিনি জানতে চাইলেনও না, জানতে দিলেনও না কাউকে।

কি ভেবে চুপ করে থাকল মোবারক। ইয়াকুব মাস্টে রং করে তখন ফিরে গেছে ফোকশালে। সামলদার ফলগ্গাগুলো টেনে তুলেছে ফল্কার ভিতর থেকে। মেজ মালোম একবার ব্রিজের উইংসের ভিতর দিয়ে কি যেন দেখে গেছেন।

সত্যি লিলির মা এক অদ্ভুত মেয়ে। লিলির বাপজী যেমন এক অদ্ভুত মানুষ। পৃথিবীর উচ্চতম কাইটিরিয়ার জলপ্রপাতের সংলগ্ন ছোট্ট পাহাড়ের এক অদ্ভুত পরিবেশের ভিতর। এক পাল ভেড়ার ঘাসে ঘাসে চরে বেড়ানোর মাঝে লিলির আম্মা মোবারকের আম্মা হেনলে উইলি বড় হয়েছে। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ধারে বাপজীর মত, জলপ্রপাত থেকে হ্রদের তীরে, ছোট্ট নদী রেখায় অনেক বেদনার চিহ্ন উইলিও রেখে এসেছিলেন সেদিন।

ছোট্ট শহর থেকে নেলসনে।

উইলো গাছের ছায়া থেকে এলেন কৌরী পাইনের ছায়ায়। দক্ষিণ দ্বীপের বন্যঘাসের পৃথিবী থেকে তিনি এলেন সমুদ্রতীরে—নেলসন বন্দরে। স্থল থেকে জলে। জীবন থেকে যৌবনে। অনেক সুখ থেকে অনেক দুঃখে।

নেলসনে তিনি প্রথমবারের মত স্বামী পরিত্যক্তা হলেন। শহরের স্থানীয় হাসপাতালের লেডী ডাক্তার হেনলি উইলী একদিন তাই শহর পরিত্যাগ করে কুক প্রণালী অতিক্রম করেন। এবং ওয়েলিংটনে এসে দ্বিতীয়বার জীবনকে নূতন করে অনুসন্ধান করার সময় এক নূতন মানুষের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হলেন।

বিবাহ করলেন দ্বিতীয়বার। পরিত্যক্তাও হলেন দ্বিতীয়বারের মত।

তিনি বলেছিলেন, সে আমার অন্ধকার যুগ। মনে পড়ছে না কখন কি ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদগুলো এল। তবু বুঝতে আমার বাকি নেই দুটো মতের অমিল থেকেই আমি আর তারা যে যার মত দুদিকে সরে দাঁড়িয়েছি।

তারপর থেকে আবার অনুসন্ধান এবং জীবনের অনুসন্ধানে ক্রমশ তিনি তাঁর মোটর দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে চালিয়েছেন। মোটর চালিয়ে এসেছেন তিনি ওয়েলিংটন থেকে ওয়াঙ্গানাইতে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। অপরিসীম বেদনায় হেনলে উইলি তখন পীড়িত। শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে তিনি চাকুরীর পর চাকুরী ত্যাগ করছেন। তিনি অবলম্বন চান। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চান আবার।

এবার তিনি চলেছেন হায়েরার দিকে। সেও দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মোটর চলেছে সমুদ্রের বেলাভূমির পাড় ধরে। পিচ ঢালা সড়কে। এঁকেবেঁকে অনেক তীরের বাঁক ঘুরে। মোটর আর উইলি উভয়ই কেমন অন্যমনস্ক যেন। চলতে হবে তাই চলছেন। থামতে হবে তাই থামছেন। একবার শুধু ভেবেছিলেন, এভাবে দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে না চলে সমুদ্র অতিক্রম করলে কেমন হয়। বিদেশে গিয়ে নূতন ভাবে ঘর বাঁধলে কেমন হয়।

হঠাৎ লক্ষ্য করলেন উইলী প্রবল ঝড়ে এ দেশটা ক্ষত বিক্ষত। দূরের গম ক্ষেতগুলো পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেছে। সকাল করে দু-একজন গ্রামের মানুষ মাঠের আলে আলে ভেড়ার পাল নিয়ে দূরের পাহাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ঝর ঝর করে নুন ঝরছে গমের শীষ থেকে। আর একটা মাঠ পার হল। ঘাসগুলো বড় নোনা। আর একটা বাঁকে মোটর ঘুরতেই আচমকা স্পিড কমিয়ে দিয়ে কিছু যেন দেখলেন। অনুভব করলেন ঝড়ের শীষ দেওয়া ডাক এখনও কমে নি। দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে সেই ডাক।

মোটর দাঁড় করিয়ে দিলেন পথের উপর। দূর থেকে পরখ করলেন তিনি। কিছু যেন বিস্ময়ের চিহ্ন পেলেন। প্রবল ঝড় ক্ষত বিক্ষত বেলাভূমিতে ঢেউয়ের ঠোট ছুঁয়ে মৃত মানুষের বুঝি স্বাক্ষর পেলেন।

সন্তর্পণে তিনি পথ অতিক্রম করে বেলাভূমিতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চললেন। ঝড়ের সমুদ্র হয়তো এখানটায় ফেলে গেছে নির্দয়ের মত। নীরবে যে মানুষটা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকল।

সেই বেলাভূমি সংলগ্ন অন্য কোন মানুষের সাড়া পেলেন না তিনি। কাকে ডাকবেন। কাকে ডেকে বলবেন, তোমরা আমার সঙ্গে এস। কি বিস্ময় আছে এখানটায় দেখি।

না, তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। বলতে পারেন নি—এস তোমরা। কে আছ কাছে—একবার এসে এই ঝড়ে-পড়া মানুষকে রক্ষা কর।

তিনি শুধু হেঁটে গিয়েছিলেন নীচে। চুপচাপ নেমে গিয়েছিলেন বেলাভূমির বুকে।

সমুদ্রের কাছাকাছি এসে টুপিটা হাতে নিলেন। ঈশ্বরকে মনে করে ক্রশ টানলেন বুকে। বুকে লাইফ বেল্ট আটা মানুষটা চিত হয়ে আছে। মুখ শুকনো। কপাল ভেজা ভেজা। চোখ দুটো স্থির। কিন্তু উজ্জ্বল। তিনি দ্রুত মানুষটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। কোথাও জাহাজ ডুবি কিংবা নৌকাডুবি হয়েছে। হাত তুলে নিলেন। নাড়ীর স্পন্দন শোনার চেষ্টা করলেন কান পেতে। এবার ক্রমশ খুব দ্রুত মুখের কাছে এবং বুকের কাছে কান রেখে আরও কিছু অনুভব করতে গিয়ে অবাক হলেন উইলী। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বেলাভূমির কিনারে কিনারে মানুষ দেখার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোন মানুষ নেই, কেউ নেই। কোথাও নেই। উইলী বলে উঠল, ঈশ্বর কি হবে?

মোটর অনেক উপরে। কালো সরীসৃপের মত পথটা এখান থেকে অস্পষ্ট। বেলাভূমির বুক ভেঙ্গে উপরে ওঠা আরো কঠিন। তবু উইলী ভিজা সপসপ মানুষটাকে দুহাতে তোলার চেষ্টা করলেন। ঘেমে উঠলেন তিনি। এতটুকু নড়ল না দেহটা। এপাশ ওপাশ জল মাত্র। তিনি উপুড় করে দিলেন দেহটা। তিনি তবু সাহায্য চান। মানুষ চান। আর বলেন ঈশ্বর কি হবে!

ঈশ্বর কি হবে। দেহটার ভিতর এখনও যে প্রাণ আছে। অস্থির হয়ে উঠল উইলীর মনটা। ছুটতে ছুটতে গিয়ে তিনি উপরে উঠলেন। মোটর নীচে নামানোর অনেক চেষ্টা। চাকাগুলি ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল। বালিতে আটকে যাচ্ছে চাকা। মোটর তিনি এতটুকু নড়াতে পারলেন না।

কি উপায় তবে। কি করা যায় তা হলে। যতক্ষণ মানুষের কোন সাড়া না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি মৃতপ্রায় মানুষটার জন্য কি করতে পারেন! অনেকগুলো ভাবনা এসে উইলীকে উত্তেজিত করে তুলল।

কিছু শুকনো খড়ের প্রয়োজন। আগুন জ্বালালে শরীরটা অন্তত গরম থাকবে। আগুন জ্বালার জন্য তিনি আকাশ পাতাল ভাবলেন। গ্রাম এখানে কোথায়—কোনদিকে কে জানে। শুধু একটু আগুন। আগুন পেলে মানুষটা বাঁচবে। দিগন্ত জুড়ে শুধু সমুদ্র আর বেলাভূমি। আগুন নেই। মানুষ নেই। ঝড় এখানে জীবনের কোন চিহ্ন রেখে যায় নি যাকে ধরে উইলী খড়কুটো অনুসন্ধান করবেন।

মাথাটা নীচু করে কিছু আবার ভাবলেন তিনি। বললেন, ঈশ্বর পেয়েছি। কটকী বটুয়া নিলেন সোফা থেকে। সিগারেট লাইটারটা হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কেটে ফেললেন সোফাটা। নারকোলের ছোবড়া বের করে হাফ গ্যালন পেট্রল নিলেন টিনে। তারপর আবার নীচে—আরো নীচে। আগুন জালানো হল। ভিজে জামা কাপডগুলো খুলে একধারে রেখে দিলেন। এপাশ ওপাশ করে সেঁকে নিলেন দেহটা। সেই সময় বিমুগ্ধ হলেন তিনি। মানুষটি পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছে কে জানে। বাঙ্গালী চেহারার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, ঈশ্বর কি হবে।

বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল উইলীকে। কোন মানুষের চিহ্ন পান কিনা তার জন্য পরীক্ষা করলেন। ভোরের কুয়াশা তখন দূর হতে দূরে সরে গেছে। সকালের সূর্য উঁকি দিচ্ছে অন্য কি এক পাহাড প্রান্তে। এবার উইলী জেলে ডিঙ্গির শব্দ পেলেন। তারাও দূরে। অনেক দূরে। শুধু পালের ছায়া দূর থেকে আলতো ভাবে এসে বালিয়াডীতে থেমেছে। কানে এসে ঠোক্কর খাচ্ছে কাঠের ঠক ঠক শব্দ। পাশের পাহাড়টাও প্রতিধ্বনি করছে—ঠক ঠক।

উইলী সন্তর্পণে জলের ভিতর নেমে গেলেন। ডিঙ্গিগুলোর কাছে পৌছানোর চেষ্টা করলেন তিনি। জলের ভিতর দাঁডিয়ে তিনি দুহাত মুখের উপর ভাঁজ করে হু-ই-ই বলে এক বিপদ সূচক চীৎকার তুললেন।

কোন সাডা এল না। তারা জল ডিঙ্গিয়ে পাড়ে এল না।

তিনি আবার ডাকলেন। চীৎকারগুলো ভেসে ভেসে অন্য কোন এক দেশে গিয়ে পৌছল। ফের ডাকলেন। আকাশে উড়িয়ে দিলেন হাতের রুমালটা।

জেলে ডিঙ্গিগুলো তখনও শব্দ তুলছে। ছপ ছপ। ঠক ঠক। পাহাড প্রান্তের অন্য বাঁক থেকে একটা নৌকো এদিকটায় এগিয়ে আসছে।

উইলী মনে মনে আবার সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করলেন যেন। ওরা এদিকেই আছে। ওরা আসবে। নীল জলের রেখা পার হয়ে সবুজ রেখায় এসে নিশ্চয়ই পৌছবে। তারপর বলবেন এস, এদিকটায় এস। দেখ কি হয়েছে। কোন্ এক পৃথিবীর মানুষ এসে তোমার পৃথিবীতে নৌকা ভিড়িয়েছে।

জল থেকে তীরে উঠলেন উইলী। সাগর ডুবি মানুষটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিদেশী নাবিককে দেখে তিনি অন্য কোন এক জগতের কথা চিন্তা করতে করতে—হাতের অনামিকায় দেখলেন আঙটি। জ্বল জ্বল করছে—চিহ্নিত করা কতকগুলি গোল গোল হরফ আংটির উপর। আবার অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাববার সময় আঙটিটা পকেটে ভরে দিলেন।

জেলে ডিঙ্গিটা এসে ভীড়ল তীরে। ডিঙ্গিটা টেনে টেনে তীরে তুলে ফেলল এবং লাফিয়ে নামল নৌকোর আরোহীরা। যেখানটায় উইলি বসে আছে সেখানটায় তারা ছুটল। যোয়ান যোয়ান উত্তর দ্বীপের মানুষেরা অবাক হল আর একটি বিদেশী যোয়ানকে দেখে। যোয়ানের যোয়ানকী আছে ? অনেক সময় ধরে ঝড়ের বিরুদ্ধে, ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটেছে। আকাশের নক্ষত্র দেখে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করেছে। সংজ্ঞা হারিয়েছে এক সময়। চোখের নীচ তাই গভীর। কালো কালো অক্ষত অনেক রেখা সমস্ত দেহকে কেন্দ্র করে। চিৎ হয়ে আছে। উলঙ্গ। উইলি জামা কাপড় এক ধারে জমা করে রেখেছে। লাইফ-বেল্টের উপর মাথাটা আলতোভাবে রাখা। বালির বুকে বিদেশী যোয়ান অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

উইলী বললেন, আপনারা দয়া করে একটু আসুন।

—কি হল ? এ ত উত্তর দ্বীপের দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ নয়।

—এমন কেন হল ?

উইলী বললেন, ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হয়েছে নিশ্চয়ই।

—ঝড়। ঝড় বাদলের রাত। কি ভয়ানক দুর্যোগ।

—দয়া করে তুলে ধরুন। দেখবেন বুকে যেন চোট না লাগে। উইলি মাথার কাছে এসে বললেন, মাথাটা আমি ধরছি।

—পারবেন ত একা ?

—পারব। এবার আপনারা হাঁটুন।

—কোথায় নিয়ে যাবেন ?

—ঐ মোটরে।

—সেখান থেকে ?

—অনেক দূরে। হায়রার কোন হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায়।

জাহাজ-ডুবি মানুষটাকে মোটরে রাখার সময় জেলেডিঙ্গির মানুষেরা বললে, আমরা আসি।

একজন বললে, বোধ হয় এ যাত্রা মানুষটা বাঁচবে।

—বাঁচবে নয়। বাঁচতে হবে। হেনলি উইলির তাই মত।

মোটরটা চলছে। পিছন থেকে জেলে ডিঙ্গির মানুষেরা হাত তুলে বিদায় জানাল। উইলীও মুখটা ফিরিয়ে বাঁ হাতটা উপরের দিকে তুলে দিলেন। পিছনে তাকানোর সময় কৈ। সামনে, আরো সামনে তাকে ছুটতে হবে। পাহাড়ী উপত্যকার পর গ্রাম। মাঠ।" বা পাশে সমুদ্রে ছোট ছোট সবুজ দ্বীপ। এখানে এসে সহজ পথ

মোড় খেয়েছে। হঠাৎ মনে হল গাছগুলো, মাঠগুলো, ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে চার পাশে। কৌরী পাইনের ছায়া, উইলোর ঝোপ, ঘাসের জঙ্গল সব সমান হয়ে গেছে চোখ দুটোয়। উইলি কি ভেবে স্পীড আর একটু কমিয়ে দিলেন।

এখান থেকে সমুদ্র আর দেখা যায় না। পাহাড় কেটে প্রশস্ত পথ গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে! কখনও গ্রাম, কখনও মাঠ, কখনও কৌরী পাইনের বনভূমির ভিতর দিয়ে মোটর ছুটছে। মাঝে মাঝে মোটরটা উইলী সহসা থামিয়ে দিয়েছেন। জাহাজ-ডুবি মানুষের বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করেছেন। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছেন।

কিন্তু কি নাম! কি নামে, কি পরিচয়ে হাসপাতালে ভরতি করানো হবে। কোন্ দেশ থেকে এসেছে! আঙটির উপর গোল গোল হরফগুলো নিশ্চয়ই ওর নাম অথবা দেশের নাম। এখন ওর কি নাম হবে। হতে পারে। হাসপাতালে কি বলব? দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ? মন্দ হয় না। মাওরী। ঐ বেশ, ঐ ভাল। হেনাফোর্ড। হেনলি হেনাফোর্ড। বেশ হবে। ঐ ভাল হবে!

হেনলি উইলি আরো কি সব ভাবল। শির শির করে কাঁপল কান দুটো। ঠোঁট দুটো কাঁপল। কি সব ভাবছে। ঐ পথ। পথের মোড়েই ডাক্তারখানা। আরো পরে হাসপাতালের সদর দরজা।

মোবারকের ফুস ফুস থেকে একটি বিলম্বিত দীর্ঘ নিশ্বাস কাঠের পাটাতনকে আসন্ন ঝড় থেকে যেন বিমুক্ত করে দিল। ছায়া ছায়া অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে আবার। দুনম্বর পরীর সুখানী ব্রিজে ওঠে গেছে। দুউইংসের মাথায় পাক খেয়ে শেষ বেলায় এসে থেমেছে কম্পাসটার সামনে। লাভবাস লাইন ঠিক করছে। তিন নম্বর মালুম পায়চারী করছেন ব্রিজে।

প্রশ্ন করল শেখর, হায়েরাতে তিনি ভাল হয়ে ওঠলেন?

—ভাল হলেন। কিন্তু কথা বলতে পারলেন না আর।

গভীর আগ্রহে শেখর পুনরায় প্রশ্ন করলে, তিনি কি কখনও কথা বলতে পারেন নি, কিংবা কানে শুনতে পান নি।

—না। তিনি কথা বলতে পারতেন না, কানে শুনতে পেতেন না। উইলি একজন বোবা মানুষকে নিয়ে আঠারো বছর ঘর করেছেন। নেলসন থেকে যে অনেক দুঃখকে সঙ্গে করে এনেছিলেন—নিউপ্লাই-মাউথে সে দুঃখ আর এক বিন্দু রইল না।

এখানে তিনি এক সুখের নীড় রচনা করেছিলেন। উইলির নূতন জীবনের সঙ্গে বাপজী পরিচিত হল তার স্বামী হিসাবে। লিলিও উইলির মেয়ে। বাপজীর দ্বিতীয় সন্তান।

মোবারক বুঝি এবার শেষ বারের মত দম নিল। অন্ধকারে শেখরের হাত খুঁজল। হাতের উপব হাত চেপে শেষ বারের মত গল্প করতে চাইল। পাটাতনের উপর কম্বলেব নীচে হাত ঢাকা শেখবেব। আর একটু সংলগ্ন হয়ে বসল তাই। ফিস ফিস কবে বললে, সমুদ্রমানুষেরা সহজে মরে না শেখর। গত সফরে রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে সমুদ্র থেকে দুজন জাহাজীকে তুলে নিয়েছি। ওরা ছিল কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী মানুষ। ছত্রিশ দিন ওরা একনাগাড়ে জলের উপর ভেসে ছিল। বিভিন্ন দেশের পত্রিকাগুলো ফলাও করে কত খবর। মোবারক এবার শেখরের হাত দুটো কম্বলের নীচ থেকে টেনে আনল। হাত ধরে বললে, বাপজী জাহাজ ডুবি থেকে বাঁচবেন সে আর বিস্ময়ের কি। সে তেমন বলার কি! তবু বললাম তোকে। অনেক কথা বললাম। আমি না-পাক মানুষ -আমার ডাক আল্লার কানে পৌঁছায় না। তিনি আমার ডাক শুনবেন না। কিন্তু তুই গুণাহগার হস নি। তোর ডাক তিনি শুনবেন, তুই অন্ততঃ তোর ঈশ্বরেব কাছে একবাব প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর তুমি ওকে ক্ষমা কর। মবু অনেক কসম খেয়ে অনেক ভেঙ্গেছে, বোনের ইজ্জত নিয়েছে—এবার তুকি ওকে শাস্তি দাও।

সহসা শেখরের দুটো হাত খুব শক্ত করে ধরে চীৎকার কবে উঠল মোবারক, বলিস, শেখর তুই বলিস এ গুণাহ-গারের জন্য। তোর ঈশ্বরের কাছে বলিস—ওকে শাস্তি দাও, ওকে ঘুমোতে দাও। কসম থাকল তোর উপর শেখর। তুই বলিস, তুই ডাকিস তোর ঈশ্বরকে।

শেখব কিছু বলল না। বলতে পারল না।

দুজন সমুদ্রমানুষ ছায়া ছায়া অন্ধকারে অনুভব করতে পারল সমুদ্র কাঁপছে। ফানেল ঝুঁকছে একবার গঙ্গাবাজু আবার যমুনাবাজু। ঝড় ওঠার লক্ষণ। চিড়িয়া পাখীগুলো তখন আকাশ আর সমুদ্রকে ছেয়ে ফেলেছে। ওরা ডাক তুলেছে ঝড়ের ডাক। টাইফুনের ডাক। অতল সমুদ্র হতে শঙ্খচিলের আওয়াজ।

রাত গভীর। এগারোটা বেজে গেছে। তিন নম্বর পরীর আমলদার আড়ামোড়া ভাঙল। হাই তুলে তুড়ি দিল মুখে। পাশের বাংকগুলোকে সজাগ করার জন্য রেলিং-এ শব্দ করল।

শেখর অনেকগুলো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শব্দে জেগে গেছে। অন্ধকার ফোকসালে

একবার চোখ খুলে আবার চোখ বুজে পড়ে আছে। পাশের বাংকটা নিশ্চয়ই খালি। প্রতি রাতগুলোর মত সে এখন বোট-ডেকে। ঘড়ির উপর ছায়া ছায়া অন্ধকারটায় ঝুঁকছে। খোদা হাফেজ বলছে দুহাত উপরে তুলে।

উঠবে উঠবে করেও শেখর দেরী করে ফেলল উঠতে। সে জানে তাকে উঠতে হবেই। মোবারককে বোট-ডেকে থেকে ধরে আনতে হবে। প্রতি রাতের মত বাংকে জোর করে শুইয়ে দিতে হবে। ঠাণ্ডা শীতের জন্য কম্বল ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। তার উপর হাত দুটো ভাল করে নিরাময় হয়ে ওঠে নি। একটি ঘোর অবসাদ শেখরকে ঘিরে রেখেছে। উঠবে উঠবে করেও উঠতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে পাশের ফোকসালের টুংটাং শব্দ শুনছে। থালা-মগের আওয়াজ। কোন পরীদার বুলি নীচে নেমে দুনম্বর পরীর কিছু ঠিক করছে।

স্টিয়ারিং ইঞ্জিনটা খুব মোচড় খাচ্ছে। খাঁজকাটা বড় হুইলটা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। ঝড় ওঠার আগে প্রতি রাতে এমনি করে কাঁদে। শেখরের শব্দটা মুখস্থ হয়ে গেছে। এই শুনে ওর নূতন জাহাজী বুকটা ভয়ে ধুক ধুক সুরু করে। কম্বলের নীচে মুখ রেখে সে উঠি উঠি করে সব শুনল। সামনের পথটা ধরে কজন পরীদার গায়ে নীল উর্দি জড়িয়ে সিঁড়িতে উঠে যাচ্ছে। ওরা তিন নম্বর ওয়াচের পরীদার। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ কেমন হাল্কা। কেমন অসংলগ্ন। সমুদ্রের নীরবতা কত ভয়ানক, শব্দগুলো তাই যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

উপরের ডেকে কিছু নাবিকের ফেরার শব্দ আসছে। অস্পষ্ট কথা বিনিময় হল। তিন নম্বর পরীদারেরা এখন গিয়ে অফিসার গ্যালীর ছাদে স্টোকলের প্রথম গরমটা এখান থেকেই সংগ্রহ করবে। এ দলে থাকবে মিঞা। বুড়ো বাদশা মিঞা। সকলের শেষে সে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে অফিসার গ্যালীর ছাদে গিয়ে বসবে।

বাদশা মিঞা কুঁজো হয়ে গেছে জাহাজের কাজ করতে করতে। বছরের পর বছর সফর দিয়ে হাজারো নাবিকের গল্প জমা করে রেখেছে। ওর সঙ্গে পরী দিয়ে লাভ আছে। আগুন নিভিয়ে, ছাই হাপিজ করে কিছুটা কয়লা স্যুটের মুখে ঠেলে বাংকে সে বসবে গল্প করতে। বাদশা একের পর এক উজির নাজীরের গল্প করবে। শেষ পর্যন্ত সে গল্প করবে নিজের। পাঁচ নম্বর বিবিটা কি করে এক নম্বর বিবির ছাওয়ালের সঙ্গে ভেগে পড়েছিল আজকাল রসিয়ে রসিয়ে সে গল্পও করে।

নাঃ, শুয়ে থাকলে আর চলে না। উঠতে হবেই যখন তখন তাড়াতাড়ি ওঠাই ভাল। সোয়েটার গায়ে দিতে হবে। টুপি মাথায় পরতে হবে। অনেক কাজ। অনেক কাজ হাতে নিয়ে শেখর বাংক থেকে নামল। হাই তুলল। কিন্তু এমন করে

আর কতদিন। আর কত বার কত রাতে তাকে টেনে টেনে নামাবে। বিরক্তিতে শেখরের মুখটা ছেয়ে গেল। তবু আলো জেলে কম্বলটা টেনে নিতেই অবাক হল—এক অখণ্ড বিস্ময় পাশের বাংকটাতে। সমুদ্রমানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কম্বলটায় এক পাশে পড়ে থাকায় শীত ঢাকছে না ওর। হাতে হাত ঘড়িটা নেই। বালকেডেও ঝুলছে না। তন্ন তন্ন করে পেটি বদনা সব খুলল। সেখানেও নেই। কিন্তু মোবারকের বাংকের পাশে এসে দাঁড়াতেই আর এক হিমেল তরঙ্গ গা বেয়ে নামতে থাকল। সব কিছু অবিন্যস্ত। অসংলগ্ন। পা দুটো, হাত দুটো—সব। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তীব্র শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

হাতটা আস্তে বাড়াল। হয়ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু হাতটা কিছুতেই সটান হয়ে পড়ে থাকা মানুষটার উপর যেতে চাইছে না। পারছে না একবার পরখ করে দেখতে মোবারক মরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে কি না। চীৎকার করে ডাকতে চাইল—মো—বা—র—ক। কিন্তু কিছুতেই গলা থেকে ডাক উঠল না। ওই অসহায় বিবর্ণ ফোকশালের আলোতে শেখর কেঁদে উঠল—ঈশ্বর! কি হবে? কি হবে! তবু শেষ প্রচেষ্টা ওর। কোনরকমে এবার হাতটা না বাড়িয়ে মুখ বাড়াল ওর মাথার কাছে। মুখের কাছে মুখ রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীক্ষা করল, আছে কি নেই। ...এবার কাঁদবে কি চীৎকার করবে ভেবে পেল না। ভেবে পেল না ঈশ্বরকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে না মোবারককে জড়িয়ে ধরে বলবে—মোবারক ঘুমোচ্ছে। ওর চোখে সমুদ্র-ঘুম। কিছুই করতে পারল না। যতক্ষণ পারল মোবারকের সমস্ত শরীরে কম্বলটা ঢেকে দিয়ে ওর মাথার উপর মুখ রেখে পড়ে রইল।

রাত তিনটার সময় কোন জাহাজীর সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামার ঠক ঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গলো শেখরের। জেগে দেখল সে ঘুমিয়েছিল সমুদ্রমানুষের বুকের উপর মুখ রেখে। বুক থেকে মুখ তুলে সহজ হয়ে দাঁড়াল। চোখ রগড়ে নিজের কম্বল দুটো তুলে আনল বাংক থেকে—বিছিয়ে দিল সমুদ্র-ঘুম ঘুমিয়ে থাকা সমুদ্রমানুষের উপর। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মনটা। পরিতৃপ্ত হৃদয়। আর সে সময় দুটো হাত আপনিতেই জোড় হয়ে এসে প্রার্থনা জানাচ্ছে—খোদা, তুমি ওকে শান্তি দাও। ঈশ্বর, তুমি ওকে ক্ষমা কর। প্রভু, তোমার আশীর্বাদে সে তার পুরানো সম্পদ ফিরে পাক।

সমুদ্রে আজ কোন সঙ্কীর্ণতা রইল না। সব ধর্ম সব মানুষের ভালর জন্য। সে জন্য বুঝি খোদা, ঈশ্বর, প্রভুকে ডাকতে গিয়ে গলা ওর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। চোখ এল ঝাপসা হয়ে। মোবারকের অসহায় পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে খোদা ও ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সে কেঁদে ফেলল।

রাত সোয়া তিনটায় সময় স্টিয়ারীং ইঞ্জিনে "তেল দিতে এসে তেলওয়ালা ইমরান ডেকে গেল মোবারককে। ওকে ওয়াচে যেতে হবে। শেখর নিজের প্রায় শুকিয়ে-ওঠা আহত হাত দুটোকে একবার ভাঁজ করে আবার খুলল। পরীক্ষা করল ওর সামর্থটুকুকে। সমুদ্রমানুষ জাহাজে থাকায় দুনম্বর বয়লার, কোম্পানীর পুষে রাখা কসবী ওর সঙ্গে কিছুতেই বিদ্রূপ করতে আজ সাহস করবে না। তাই ইমরান ডাকলে ওকে বাধা দিয়ে বলল, মোবারককে ডেক না চাচা। ওর পরী আমি দেব। ওকে ঘুমোতে দাও। "মোবারক ঘুমোক। খোদা হাফেজ।

———